Bangla Entries

সূচীপত্র

(Bangla Entries)

Mukta Rani Karmakar/ মুক্তা রানি কর্মকার, Moulvibazar, Bangladesh 285
একটি মেয়ে

Anika Anjum/ আনিকা আনজুম, Dhaka, Bangladesh 287
দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে

Alija Jaman Shupti / আলিজা জামান সুপ্তি, Dhaka, Bangladesh 292
রোজনামচা

Farah Hasan / ফারাহ হাসান মৌটুসী, Dhaka, Bangladesh 296
আত্মজার দর্পন

Nasrin Tamanna / নাসরিন তামান্না, Brahmanbaria, Bangladesh 299
মায়ের জাদু বাঘিনী

Fatima Zerin Prottasha / ফতিমা জারিন প্রত্যাশা, Dhaka, Bangladesh 306
অনুভবে অবিনশ্বর

Khodeza Akhter Jahan Rume / খোদেজা আখতার জাহান রুমী,
Dhaka, Bangladesh 314
আমার বাড়ি – আমার শহর

Khodeza Akhter Jahan Rume / খোদেজা আখতার জাহান রুমী,
Dhaka, Bangladesh 318
আমার বাড়ি – আমার শহর

Aurora Ahmed Psyche / অরোরা আহমেদ সাইকী, Kushtia, Bangladesh 320
আমার শহর – আমার বাড়ি

Rima Das / রীমা দাস, Sylhet, Bangladesh 322
রূপান্তর

Farjana Yeasmin / ফারজানা ইয়াসমিন, Dhaka, Bangladesh 326
মাই হোম – মাই সিটি

Jisrat Alam Mumu / জিসরাত আলম মুমু, Chittagong, Bangladesh 328
আমার শহর আমার বাড়ি

Sajeda Sharmin / সাজেদা শারমিন, Noakhali, Bangladesh 331
আমার বাড়ি

Sajeda Sharmin / সাজেদা শারমিন, Noakhali, Bangladesh 332
আমার শহর

Sara Pauline / সারা পওলীন, Dhaka, Bangladesh 333
মেয়ে মানুষ

Zerin Jannat / জেরিন জান্নাত, Dhaka, Bangladesh 336
পরিত্রাণ

Atia Rahman Konica / আতিয়া রহমান কণিকা, Dhaka, Bangladesh 338
আমার শহরে বসন্ত আসুক

Khursheda Akhtar / খুর্শেদা আখতার, Dhaka, Bangladesh 342
শহরের পথ চলা

Ruma Modak / রুমা মোদক, Habiganj, Bangladesh 344
রাক্ষস কিংবা মানবের ইতিবৃত্ত

Jannatul Sharmin Nisa / জান্নাতুল শারমিন নিছা,
Moulvibazar, Bangladesh 348
নারীর চোখে তার শহর

Ummay Honey / উম্মে হানি, Dhaka, Bangladesh 351
মানুষের শহর

Papia Talukder / পাপিয়া তালুকদার, Sylhet, Bangladesh 355
ডিগনিটি বাই স্যাক্রিফাইস

Sushipta Das / সুশিপ্তা দাশ, Moulvibazar, Bangladesh 359
একটি বিস্ফোরণ ও কিছু স্বপ্নের মৃত্যু

Bandhana Sinha / বন্দনা সিনহা, Moulvibazar, Bangladesh 362
অভিশপ্ত জীবন

Gita Das / গীতা দাস, Dhaka, Bangladesh 365
আমার শব্দটি আমার নয়

Gita Das / গীতা দাস, Dhaka, Bangladesh 367
আমার শহরের ভাষা

Nargis Sultana Nadi / নার্গিস সুলতানা নদী, Dhaka, Bangladesh 370
আমার শহর আমার বাড়ি

Zahura Yasmin Elina / শ্রীমতী জহুরা ইয়াসমিন এলিনা,
Buffalo, New York, USA 374
স্মৃতির হাতছানি

Zahura Yasmin Elina / শ্রীমতী জহুরা ইয়াসমিন এলিনা,
Buffalo, New York, USA 378
আমার নকশিকাঁথা

Sultana Rajia Shila / সুলতানা রাজিয়া শীলা, Dhaka,
Narsingdi, Bangladesh 382
আমার শহর

Kazi Tasmia Tazry / কাজী তাসমিয়া তাজরী,
Muradnagar, Comilla, Bangladesh 386
শহর বনাম স্বপ্ন

Halima Khatun / হালিমা খাতুন, Dhaka, Bangladesh 390
আমার বাড়ি

Shahana Yasmin / সাহানা ইয়াসমিন, Dhaka, Bangladesh 391
এক 'কিছুই করে না' মেয়ের গল্প

Sirajam Munira Binte Yusuf / সিরাজাম মুনীরা বিনতে ইউসুফ,
Dhaka, Bangladesh 396
মেয়েমানুষ

Sumaiya Santa / সুমাইয়া সান্তা, Dhaka, Bangladesh 400
প্রতিটি শহর হতো যদি নারীর প্রিয় বাড়ি

Lina Ferdows Khan / লীনা ফেরদৌস খান, Dhaka, Bangladesh 403
শহরের উপাখ্যান

Lina Ferdows Khan / লীনা ফেরদৌস খান, Dhaka, Bangladesh 408
নিস্তব্ধতা

Raushan Ara Mahmuda / রওশন আরা মাহমুদা, Dhaka, Bangladesh **410**
যে শহরে বসত আমার

Fatema Israt Juthi / ফতেমা ইসরাত যুথী, Dhaka, Bangladesh **414**
নমিতা

Nasreen Meghla / নাসরিন মেঘলা, Chattogram, Bangladesh **419**
আমার চেনা শহর

Suborna Akter / সুবর্ণা আক্তার, Netrakona, Bangladesh **422**
বাবার বাড়ি ও স্বামীর বাড়ি আছে, কিন্তু নারীর নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই

Israt Jahan Tuna / ইসরাত জাহান তুনা, Dhaka, Bangladesh **426**
আমার শহরের না বলা কথা

Khadijatul Kaminy / খাদিজাতুল কামিনী, Dhaka, Bangladesh **430**
গন্তব্য

Sabrina Sazzad / সাবরিনা সাজ্জাদ, Dhaka, Bangladesh **434**
আমার এ শহর

Amily Mazumder / এমিলি মজুমদার, Chittagong, Bangladesh **435**
বাড়ি সাজলেই সাজবে শহর

Monira Ahmed / মনিরা আহমেদ, Dhaka, Bangladesh **439**
যেথায় চিত্ত প্রশান্ত, সেথায় আমার শহর, আমার ঘর

Monira Ahmed / মনিরা আহমেদ, Dhaka, Bangladesh **444**
আমার ঢাকা, আমার মীরপুর

Nipa Rani Das / নিপা রানী দাস, Narayanganj Sadar, Bangladesh **447**
স্বপ্নের শহর, ভালোবাসার শহর

Rezina Parvin / রেজিনা পারভীন, Dhaka, Bangladesh **451**
আমার শহর, আমার বাড়ি

Tiasha Chakma / শ্রীমতী তিয়াশা চাকমা, Nagasaki, Japan **455**
আমার মা হয়ে ওঠা

Aditi Das / অদিতি দাস, Sylhet, Bangladesh **459**
প্রিয় শহর আর সর্বনাশা অক্টোবর

Khadija Parvin / খাদিজা পারভীন, Jashore, Bangladesh 463
আমার বাস্তুভিটা

Nishita Das / নিশিতা দাশ, Moulvibaza, Bangladesh 467
দিঘীর নাম কমলারাণী

Ishmam Tasnim / ইশমাম তসনিম, Dhaka, Bangladesh 470
আলোর রোশনাই

Tasben Mahmud / তাসবেন মাহমুদ, Dhaka, Bangladesh 474
শহরের গল্প

Tasben Mahmud / তাসবেন মাহমুদ, Dhaka, Bangladesh 476
জাদুর শহর

Tahmina Rahman / তাহমিনা রহমান, Mymensingh, Bangladesh 479
কৃষ্ণ গহ্বর

Nahida Akter / নাহিদা আক্তার, Dhaka, Bangladesh 481
আমার শহর, আমার বাড়ি

Suraiya Islam / সুরাইয়া ইসলাম, Dhaka, Bangladesh 484
বাড়ির নাম সেঁজুতি

Shaheen Samad / শাহীন সামাদ, Dhaka, Bangladesh 489
আমার ভালোবাসার শহর

Aysha Siddika Mimi / আইশা সিদ্দিকা মিমি, Savar, Bangladesh 491
নারী

Fabiha Tonika / ফাবিহা তনিকা, Dhaka, Bangladesh 495
মহল

Parisha Maheshareen / পরিশা মহেশারিন, Dhaka, Bangladesh 500
মায়া

Parisha Maheshareen / পরিশা মহেশারিন, Dhaka, Bangladesh 504
আত্মকথার উপাখ্যান

Fahmida Afroz KanokSrabon / ফাহমিদা আফরোজ কনক শ্রাবণ, Dhaka, Bangladesh 506
মনিরাদের ঘর থাকেনা, ওরা ঘর জুড়ে দেয়

Sania -E- Aferin / সানিয়া-ই-আফেরিন, Noakhali, Bangladesh **510**
আমার শহর আমার বাড়ি

Sania -E- Aferin / সানিয়া-ই-আফেরিন, Noakhali, Bangladesh **511**
নিরাপদ নগরে স্বপ্ন-বাড়ি

Sujana Afrin Oishee / সুজানা আফরিন ঐশী, Dhaka, Bangladesh **513**
পরের জন্মে তুমি আমাদের হবে তো শহর?

Tanjila Taraiyan / তানযীলা তারাইয়্যান, Sylhet, Bangladesh **517**
তারার শহর

Rahela Khurshid Zahan / রাহিলা খুরশিদ জাহান, Dhaka, Bangladesh **520**
মাধবীলতার গান

Ishrar Habib / ইশরার হাবিব, Dhaka, Bangladesh **525**
আমার কাছে এ শহর মানে তুমিই ছিলে

Husne Ara Joly / হুসনে আরা জলি, Sirajganj, Bangladesh **527**
এ শুধু আমারই সুখ

Shamim Ara Begum / শামিম আরা বেগম, Dhaka, Bangladesh **531**
আমার যাপিত জীবনের গল্প

Mukta Rani Karmakar/ মুক্তা রানি কর্মকার, Moulvibazar, Bangladesh

The discrimination against girls and women around me, in my city as well as in my country, upsets me and incites me to express my protest through my writing. It may be a short poem but originated from the core of my heart.

একটি মেয়ে

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝবে জীবন কী;

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝে যাবে কেউ আপন নয়;

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝে যাবে এক বিন্দু আনন্দের জন্য পেতে হয় পর্বতসম কষ্ট।

বালিকা তুমি ছোটই থাকো, হবে না লড়তে তোমায় বাঁচার জন্য।

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝবে এককালের বন্ধু হয় পরে শত্রু;

আত্মীয় হয় পর;

প্রেমিক হয় খলনায়ক;

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝে যাবে অন্যের হাতে পড়ার আগে তোমাকে জীবিকা অর্জন করতে হবে;

দাঁড়াতে হবে তোমায় নিজের পায়ে, পা ভেঙে ফেলার আগেই;

অন্যের কথায় কান দিলে চলবে না, বাঁচতে হবে বাঁচার মতো করে।

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড় হলে বুঝে যাবে তারা তোমায় মুক্তচিন্তা করতে দেবে না, হবে তোমার স্বপ্নের মৃত্যু;

দুনিয়াটাকে যত ভালো ভাববে, তত ঠকবে, দেখবে মুখোশই মানুষ;

তোমার মতের কোনো মূল্য থাকবে না, কাটাতে হবে অন্যের জীবন।

তাই বালিকা তুমি ছোটই থাকো, করতে হবে না তোমায় কোনো চিন্তা।

বালিকা তুমি বড়ো হয়ো না, বড়ো হলে বুঝে যাবে, তুমি সম্পদ নও, তুমি হলে প্রতিটি ঘরের বোঝা যা কেউ চায় না নিতে;

বিয়ে না করে চাকরি করলে মানুষ দেবে খোঁটা, তবুও তোমায় করতে হবে উপার্জন, বোঝা থেকে সম্পদ হতে, মানুষ হতে।

আমি বলব, বালিকা তুমি বড়ো হও, তোমার দিকে ওঠা প্রতিটি আঙুল ভেঙে দিতে;

তুমি বড়ো হও, তোমার উপর প্রভুত্ব করার দুঃসাহস চূর্ণ করে দিতে;

তুমি বড়ো হও, তোমার প্রতি করা অন্যায় অবিচার নিশ্চিহ্ন করে দিতে;

তুমি বড়ো হও, দুঃখের উপর সুখের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে;

তুমি বড়ো হও, বাঁচতে এবং বাঁচাতে;

তুমি বড়ো হও, হাসতে এবং হাসাতে;

তুমি বড়ো হও, মানুষকে মানুষ বানাতে।

Anika Anjum/ আনিকা আনজুম, Dhaka, Bangladesh

Once in my childhood, I saw my mother ripping up the pages of her diary. There was no one at home except me. She probably was fighting back tears while clenching her teeth. Whenever I try to recall the evening, it makes me wonder what could have been written on those pages, what dreams were falling from her eyes disguised in tears.

In the streets of Dhaka, thousands of lives are seen passing in a rush. Their dreakeep sparkling through the eyes. Despite being a part of this big city, certain lives go unnoticed. Their desires remain suppressed within a defined territory.

In this writing, I endeavoured to sketch the dream of a woman who chose to fly instead of being caged for the rest of her life. Maybe it's not freedom which every mother, sister or wife craves for. But when I try to match their position against the sacrifices they make, it urges me to believe that they should survive on their own terms, at least once in a life.

দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে

১

নীরু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এক কাপ কফির দাম কখনো ৫০০ টাকা হতে পারে! পুরো মেন্যুতে চোখ বুলিয়েও এর চেয়ে সস্তা কিছু পাওয়া গেল না।

'ম্যাডাম, অর্ডারটা কি এখনই দিবেন?'

ওয়েটারটির দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না নীরুর। ছেলেটি প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। নীরু ভেবে পাচ্ছে না তার কী করা উচিত। মেন্যুটা ছিঁড়ে ছেলেটার মুখে ছুঁড়ে মারতে পারলে ভালো লাগতো।

ব্যাগের ফিতাটা কাঁধে ঝুলিয়ে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো নীরু। 'কিছু মনে করবেন না,

আজ আমার কফি খেতে ইচ্ছে করছে না।' বলেই গটগট করে রেস্টুরেন্ট থেকে বেড়িয়ে পড়লো সে।

কী লজ্জার ব্যাপারই না হলো! মনটাও খচখচ করছে। নীরুর অনেকদিনের শখ খুব বড় একটা রেস্টুরেন্টের কোণার দিকের কোনো এক টেবিলে একা বসে আয়েশ করে কফির কাপে চুমুক দেবে আর পুরোনো দিনের কথা ভাববে। কে জানত এসব জায়গায় কফির এত দাম হয়! এই টাকায় এক সপ্তাহের কাঁচাবাজার কিনে ফেলতে পারে সে। আশার কথা হচ্ছে একটা টাকাও এখনো খরচ হয়নি, ব্যাগে পুরো দশ হাজার টাকা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে এগোলো নীরু। আকাশে মেঘ করেছে। হঠাৎ হঠাৎ ঠান্ডা বাতাস বইছে। এমন আবহাওয়ায় রিক্সায় ঢাকা শহর ঘুরতে বেশ লাগে। নীরু আশেপাশে তাকাচ্ছে। একটা রিক্সাওয়ালাও তার পছন্দ হচ্ছে না। অগত্যা হাঁটতে শুরু করলো সে।

খুব ক্লান্ত লাগছে হাঁটতে। বার্ধক্য তার জানান দেয়া শুরু করেছে, ভাবলো নীরু। চল্লিশ বছরের এই জীবনটাকে হঠাৎই খুব দীর্ঘ মনে হতে লাগলো। নীরু চেষ্টা করছে অন্য চিন্তায় মন ফেরাতে। এসব কথা ভাবা তাকে আর সাজে না। আজ থেকে সে মুক্ত। মাথার ওপরের আকাশ আর পায়ের নিচের মাটিই এখন সীমারেখা। চোখের সামনে যে বিস্তৃত লোকালয় তার যে কোনো প্রান্তে সে হারিয়ে যেতে পারে।

নীরু মাথা উঁচু করে হাঁটছে। আকাশ ভেঙে যে বৃষ্টি নেমেছে সেদিকে তার খেয়াল নেই।

২

মইন সাহেব বসে আছেন ড্রয়িংরুমে। এই মুহূর্তে সামনে বসে থাকা লোকটিকে তাঁর কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে কুৎসিত মানুষ মনে হচ্ছে। ছেলেমেয়ের ফোন পেয়ে অবেলায় অফিস থেকে চলে এসেছেন। ৩ টা বাজতে চললো, এখনো দুপুরের খাবার খাওয়া হয়নি।

মইন সাহেব বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, আফজাল ভাই, একটা কথা বলি।' আফজাল সাহেব এতক্ষণ নিজের মোবাইল ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন একটা নম্বর উদ্ধারের আশায়। মইন সাহেবের কথায় খানিকটা নড়েচড়ে বসলেন।

'আপনি ভাই প্লিজ নম্বরটা বাসায় গিয়ে খুঁজেন। আমাদের ঘরে আজ রান্নাবান্না নেই বুঝতেই পারছেন। আপনি উঠলে আমি একটু দেখতাম খাবারের কী ব্যবস্থা করা যায়।'

'ওহ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ' আফজাল সাহেব বিব্রত বোধ করলেন। 'নম্বরটা পেলে আমি আপনাকে দিয়ে যাবো।'

বলেই বেরিয়ে গেলেন তিনি। এর প্রায় সাথে সাথেই মইন সাহেবের দুই ছেলেমেয়ে ঘরে ঢুকলো। সায়ান বেশ বিরক্তির সাথে বললো, 'আফজাল আঙ্কেলকে এসব জানানোর কি খুব বেশি দরকার ছিল! মা হয়তো একটু পরেই ফিরে আসবে।'

মইন সাহেবের রাগ এবার চরমে পৌঁছলো। 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না। আফজাল ভাইয়ের এক দূরসম্পর্কের বোনের হাসব্যান্ড পুলিশের আইজি। তার মাধ্যমে তোমার মাকে বের করার চেষ্টা করছি যেন লোক-জানাজানি না হয়।'

'ফিরে আসার হলে মা এতক্ষণে এসে পড়তো।', সোহানা মুখ খুললো। তার চোখে পানি।

'ফিরে না এসে যাবে কোথায়? এই শহরে চলার মত বুদ্ধি কি তার আছে! ষ্টুপিড মহিলা!', রূঢ়কন্ঠে বললেন মইন সাহেব।

সোহানা এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। সায়ান ওকে সামলানোর চেষ্টা করছে।

৩

নীরু রেললাইনের উপর বসে আকাশ দেখছে আর হাতের হাওয়াই-মিঠাইয়ে ছোট ছোট কামড় দিচ্ছে। কী অদ্ভুত! একটু আগে কী বৃষ্টিটাই না হলো, আর এখন ঝকঝকে রোদ। মানুষের জীবনও এমন আলোছায়ার খেলা খেলে। অসময়ের মেঘ এসে কাঁদিয়ে যায়; পরক্ষণেই সূক্ষ্ম আলোকচ্ছটা নিয়ে আসে বেঁচে থাকার অর্থ।

নীরুই কি কখনো ভেবেছিল সে কোনোদিন এভাবে জীবনকে দেখতে পাবে! চার দেয়ালের মধ্যিখানেই হয়তো একদিন তার নিঃশ্বাস ফুরিয়ে যেত। এই শহরের এত কোলাহল সে দেখতে পেত না, মানুষের জীবনের এই বৈচিত্র্য না দেখাই রয়ে যেত।

নীরু তাকালো তার সামনে বসা বৃদ্ধটির দিকে। বয়স ষাটের বেশি হবে। তার রিক্সাতেই নীরু এতক্ষণ শহরের আকাশে বৃষ্টি দেখে বেড়িয়েছে।

বৃদ্ধ খুশিমনে হাওয়াই-মিঠাই খাচ্ছে। মুখে কোনো কষ্ট বা গ্লানির ছাপ নেই। নীরু জিজ্ঞেস করলো, 'রিক্সা চালাতে কষ্ট হয় না, চাচা?'

বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে বললো, 'কষ্ট পাওনের সময় কই, মা? দিন-রাইত কাম করি, মাইনষের রঙ-তামাশা দেহি। দিনের বেলাত এক রঙ, রাইতে আবার আরেক। হেরপর ঘরো গিয়া মাডিত মাথা লাগাইলেই মনে করেন ঘুম।'

নীরু হাসলো। এমন একটা অসাধারণ জীবনই সে চেয়েছিল। কোনো শাসন-বাঁধা, যন্ত্রণা-অপমান থাকবে না। দুপায়ে ভর দিয়ে রেললাইন ধরে হাঁটা যাবে, যেমনটি সে এখন করবে। নীরু দেখতে চায় এ পথের শেষ কোথায়, জীবন তাকে কোন অজানায় নিয়ে থামাতে চায়।

৪

সোহানা চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে আছে। এর আগে সে এটি দুবার পড়েছে এবং পড়তে পড়তে অঝোরে কেঁদেছে। বাবা বা ভাইকে এখনো কিছু বলেনি। ও ঠিক করেছে আর এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলবেও না। আরেকবার পড়ে চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পড়তে শুরু করলো।

সোহা মা,

যে কথাগুলো এখানে লিখতে যাচ্ছি তার অর্থ হয়তো তুমি কোনোদিন বুঝবে না। আমি আজীবন তোমার চোখে একজন খারাপ মা'র উদাহরণ হিসেবেই রয়ে যাব। তাও লিখছি যেন কেউ অন্তত জানে আমার অভিমানের কথা, আমার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির গল্প।

আমার চরিত্রের এক বড় অংশ জুড়েই ছিল অভিনয়। নিত্যদিন মন্দ কথা শুনে হাসিমুখে সংসার করে যাওয়ার অভিনয়, শত অবহেলা সহ্য করেও সংসারটা টেকানোর চেষ্টা করার অভিনয়। মেট্রিক পাশের পর কলেজে ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলাম। সে মায়া ত্যাগ করতে হলো। বিয়ে করে এলাম তোমাদের বাড়িতে। ঝিঙে-পটল, আনাজপাতিকে সঙ্গী করে চলতে থাকলো আমার দিন। তোমার বাবার কাছে আমার কখনোই কোনো মূল্য ছিল না। তার চোখে আমি বরাবরই একজন ষ্টুপিড মহিলা। খুব কষ্ট হত জানো! কিন্তু কাউকে বলতে পারতাম না দুঃখের কথাগুলো।

এরপর ছোট্ট ছোট্ট দুটি ফুলের মত শিশু এলো আমার কোলে। ওদের সাথে একটু একটু করে সব মনের কথা বলতে লাগলাম। অবুঝগুলো আমার কথা শুনে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকত আর আমি হাসতাম। ওদের পৃথিবীটাও ছিল আমাকে ঘিরে।

আস্তে আস্তে ওরা বড় হতে লাগলো। তাদের ছোট পৃথিবীটাও এবার আকারে-আয়তনে বড় হয়ে গেল। নতুন নতুন বন্ধু হলো। এই পুরনো বন্ধুটাকে আনস্মার্ট, অশিক্ষিত মনে হতে লাগলো। এই আধুনিকতার জাঁকজমকের মাঝে নিজেকে বড্ড বেমানান লাগে। আমি এই অবহেলা টের পেলাম। ফিরে গেলাম আমার পুরনো বন্ধুদের কাছে।

কিন্তু এবার আর ঝিঙে-পটলের সাথে আমার ভাবটা জমলো না। বুঝতে পারলাম তোমাদের জীবনে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে এসেছে। পুরনো আসবাবের মত আমাকেও ছুঁড়ে ফেলে দেয়ার আগে আমিই তোমাদের জীবন থেকে বিদায় নিলাম।

শহরের এই কোলাহলের মাঝে আমি একটু একটু করে হারিয়ে যাব। ঠিক করেছি বাকি জীবন রাস্তার বাচ্চাগুলোর সাথে কোনো ব্যস্ত সড়কে ট্রাফিকে আটকে থাকা গাড়িগুলোর সামনে গিয়ে ফুল বিক্রি করবো। কোনোদিন তোমাদের সামনে এলে ভুল করে মা ডেকে ফেল না যেন!

ইতি

নির্জনা আহমেদ।

Alija Jaman Shupti / আলিজা জামান সুপ্তি, Dhaka, Bangladesh

I love my city and my home. It's a great feeling to depict my city through my writing. Writing is my soul, and My Home and My City is the background of my writing.

রোজনামচা

৩ বৈশাখ, ১৪২৭

গত পরশু থেকেই ফোনটা বেসুরো সুরে বার বার বেজেছে। মনটা ভয়ে শিউরে উঠেছে। চলমান লকডাউনের ভেতরেই ঘর থেকে বাইরে বের হতে হবে। কয়েক দফা আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে একটি জরুরি প্রয়োজনে অফিসে যেতেই হবে। অতীব প্রয়োজন। পদার্থ বিদ্যার বিখ্যাত স্থিতি জড়তার সূত্রটি টের পেলাম মরমে মরমে, অঙ্গে অঙ্গে। মন অবশ দুশ্চিন্তায়, মনে হচ্ছিল করোনা ওৎ পেতে বসে আছে শুধু আমাকেই ধরবে বলে। এক নাগাড়ে এক টানা বাইশ দিন ঘরে থেকে মনে হলো চার দেয়ালে শ্যাওলার মতো আটকে গেছি। আমি অনন্ত কাল এখানেই আটকে থাকতাম যদি না কেউ আমাকে ঠ্যালা দিয়ে ঘরের বাইরে পাঠাত। যেতে তো হবেই, এ এমন এক ডাক যা উপেক্ষা করার সাধ্য বা সামর্থ্য কোনোটাই আমার নাই। সকাল সকাল উঠলাম, পুরোনো রুটিনে ফিরলাম; রান্না, ঘর মোছা, ছেলেকে খাওয়ানো, টেবিলে দুপুরের খাবার রাখা, তারপর যাত্রার এন্তেজাম করা। আজ আবার বোতলে ক্ষার পানি গুলে নিয়েছি, প্রয়োজন মতো জায়গায় জায়গায় ছিটিয়ে দিতে হবে। মাস্ক ফাস্ক সব ঠিকঠাক পড়ে নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। কিছুটা পথ হাঁটার পর রিক্সা পেয়ে গেলাম। ব্যাগের থেকে ক্ষার পানি ছিটিয়ে তবেই রিক্সায় উঠে বসলাম। রিক্সা এগিয়ে চলছে, আমি দেখছি চারপাশ, কতদিন পর রিক্সায় চড়লাম। বৈশাখ মাস হলেও রোদের মিঠে মিঠে তাপ, লাগুক না একটু গায়। হুডখোলা রিক্সা, তাপের প্রখরতা না থাকলেও রোদের জৌলুস আছে, কী চকচক ঝকঝক করছে চারপাশ। রাস্তাঘাট বেশ

পরিপাটি, কোথাও আবর্জনার স্তূপ নেই, বোঝা গেল আজ সকালেও রাস্তা ঝাট-পাট হয়েছে। পরিচ্ছন্ন কর্মীরা হয়তো কাজ করার সুযোগ এখনো পাচ্ছেন। বাসাবো, খিলগাঁও, সবুজবাগ, নন্দীপাড়া, মাদারটেক, কুসুমবাগ এসব জায়গায় ঢাকার অন্যান্য অংশের চেয়ে গাছপালা কিছুটা বেশি বলেই আমার অনুমান। আমি ১৯৯৭ সাল থেকে ঢাকায় বাস করি, বর্তমানে সবুজবাগ, বাসাবোতে থাকি। বেশি দিন নয় এখানে গত অক্টোবর মাসে এসেছি। এই বছরই আমি বাসাবো বাস স্টান্ড থেকে সামান্য এগিয়ে মূল রাস্তা সংলগ্ন একটি ফুলে ফুলে নমিত শিমুল গাছ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে থমকে গিয়েছিলাম। একটি পাতাও ছিল না গাছটিতে, কালচে ডাল ভরা লাল ফুল; মুচকি হেসে বললাম, ও এখন তো বসন্তকাল। আমি এর আগে ঢাকা শহরে শিমুল গাছ দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মনে হলো, কোন অনন্তলোক হতে সে এসে দাঁড়িয়েছে এই মলিন রাস্তার ধারে।

এমনকি আমার বাসার অদূরেই একটি বউন্না ফুলের গাছও আছে। আজ এই পোড়া চোখে দেখি এখানে হরেক রকম সবুজের ছড়াছড়ি। একে তো বাস ট্রাক বন্ধ, ধোঁয়া ধুলির মলিনতা নেই, তার উপর গত কয়েকদিনের ঝোড়ো হাওয়ার সাথে হালকা বৃষ্টিপাতে ধুয়ে গেছে বিবর্ণতার শেষ স্মৃতি চিহ্নটুকুও। রাজারবাগ কালিবাড়ি থেকে বৌদ্ধমন্দির পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে এখনো চোখে পড়ার মতো গাছপালা ঘিঞ্জি পুরনো ময়লা ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাওয়া দালান কোঠার গায়ে গায়ে লেগে আছে, কতগুলো তো মাথা উঁচু করে দালান পেরিয়ে মুখ তুলে আকাশে মেলেছে ডানা। সকাল সাড়ে নটা, পূর্বাহ্নের ভরা যৌবন। এখানে পাকুর গাছের ছড়াছড়ি, পাকুরের নবীন পাতায় বিলোল সবুজ বিচ্ছুরিত হচ্ছে আপন মহিমায় । বসন্ত যেমন ফুল ফোটার সময়, গ্রীষ্ম হলো বৃক্ষের নতুন পাতায় পাতায় সূর্যের লুকোচুরি খেলার সময়। পাতা পিছলে পিছলে আলো গড়িয়ে পড়ছে লোকালয়ে। রিক্সা চলছে হাওয়ায় হাওয়ায়, দুপাশে ভ্যানে দোকানে সব্জী। সেখানেও সবুজের দাপাদাপি। ঢাউস সব তরমুজ, কালো সবুজ উস্তা, আর টসটসে সবুজ কচি আম, সাথে অন্যান্য শাক পাতা। লোকজনও আছে, বারোটার পরে সব বন্ধ হয়ে যাবে। বাসাবোতে লকডাউন চলছে অনেকদিন থেকে। দেখতে দেখতে রিক্সা বৌদ্ধমন্দির পার হয়ে মূল সড়কে উঠে গেল; সেখানে তিন চার জন পুলিশ কিছুই

বলল না। চওড়া রাস্তা, বাতাস যেন এখানে এসে হাঁফ ছেড়েছে, একটা কভার ভ্যান চলে গেল পাশ দিয়ে, হাতে গোনা কয়েকটা রিক্সা তিড়িং বিড়িং করে চলছে, মতিঝিল অভিমুখে চলছি। হাতের ডানদিকে উঁচু পাঁচিল, ওপাশটা বিস্তৃত কমলাপুর রেল স্টেশন। ঘন বনের মতো নিবিড় বৃক্ষের আচ্ছাদনে ঘেরা। আরেকটু যেতেই দেখি মুগদা আইডিয়াল স্কুলের প্রবেশ পথের কাছে একটি সোনালু গাছ; আরে একি, সোনালু ফুল দুলছে বাতাসে, চনমনে হলুদ ফুলগুলো লাজুক হাসি হাসছে। আমি বাইশ দিনের আটকে থাকা অবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ অনুভব করলাম, শিহরিত হলাম রোদ আর সোনালু ফুলের মাখামাখি দেখে। আহা, জীবন কত সুন্দর! গাছপালা লতাপাতা, ফুল পাখি, নদী, আকাশ, চন্দ্র, তারা এসব এত দেখেও তৃষ্ণা মেটে না। সোনালু ফুলের সোনালি আভা শেষ হতে না হতেই দেখি জারুলের ঘন পত্র পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে বেগুনি ফুল ফুটবে কি ফুটবে না করেও কিছু কিছু ফুটেছে, আমার আজন্ম চেনা জারুল, যতবার দেখেছি এই জীবনে ততবারই একটু হলেও থেমেছি। আজ তো রিক্সা সওয়ারী, তাই এক পলকের ক্ষণিক দেখার অতৃপ্তি নিয়েই সামনে তাকালাম। টিটিপাড়া মোড় ঘুরল রিক্সা। যেন হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছি, এই মহনগরীর মানুষের মনে ঘোর অমানিশা। অথচ বাইরে আলোর কী উদ্ভাস! দেয়ালে দেয়ালে আলো গা এলিয়ে শুয়ে বসে আরাম করছে। এসে পড়লাম দেওয়ানবাগী হুজুরের উটের খামারের কাছে, সুউচ্চ পাঁচিলের ওপাশে নাকি উট আছে; দেখিনি, কিন্তু উটের উটকো গন্ধ বলে দেয় তাঁরা ভিতরে আছেন। অন্যান্য দিন গন্ধটাকে উটকো মনে হলেও আজ কেমন পরিচিত গন্ধটাও ভালো লাগল। একটু এগোতেই ঝম বৃষ্টির মতো এক পসলা বৃষ্টিতে যেন ভিজে গেলাম আমি, আমার চোখের কোণে জল। হিজল গাছ! এ যে হিজল! কিশোরীর চুলের বেনির মতো ঝুলে ঝুলে আছে হিজল ফুলের কলি, এখনও ফুল ফোটার সময় হয়নি, ফুটবে শীঘ্রই। এ পথে কত করেছি আসা-যাওয়া অথচ তোমায় দেখিনি প্রিয়া।

হিজল ফুলের অবিকশিত কলির দিকে চেয়ে মনে পড়ে গেল একদিনের কথা, অনেক দিন পর ঢাকার একটি নামী দামি কনভেনশন সেন্টারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে আমার বান্ধবী মলির সাথে আমার দেখা হলে আমি বোকার মতো কেঁদে ফেলেছিলাম। ঐ অনুষ্ঠানে ওর সাথে দেখা করার জন্যই গিয়েছিলাম, তারপরও আচমকা আমি বিহ্বল

হয়ে গিয়েছিলাম, ঠিক আজ যেমন হলাম। আর হিজল তো আমার সেই ছোট্ট বেলার সই, কত গেঁথেছি মালা, কতবার পড়েছি গলায়; হিজলের রঙে রুপে বিমোহিত হয়নি এমন বাঙালী কি আছে! অনেকদিন পর দেখলাম কিশোরী হিজল কুসুম কন্যারে, এতদিন পর দেখে আনন্দ উপচে উঠেছিল চোখের সীমানা বেয়ে।

আনন্দাশ্রু শিশির ফোঁটার মতো হীরক-দ্যুতি ছড়ায়, সুখ সুখ লাগে। ভাবালুতা কাটাতে কাটাতে দেখি রিক্সা মতিঝিল শাপলা চত্বরে, রোদ এতক্ষণে আঁচ ধরতে শুরু করেছে। অন্যরকম মতিঝিল, যেন পূর্বজন্মে ফিরে গেছে, হয়তো পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে মতিঝিল এমন নিরিবিলি ছিল। তখন মতিঝিল মতিঝিল হয়ে উঠেছিল, নাকি শুধু ঝিল ছিল, মতি ছিল না কোনো। মতিঝিল কবে থেকে ব্যাংকগুলোর রাজধানী হতে শুরু করল সে ইতিহাস বিস্তারিত জানা নাই। শেষ পর্যন্ত বুঝলাম কত কম জেনেই জীবন গড়িয়ে গেল অপরাহ্নে।

Farah Hasan / **ফারাহ হাসান মৌটুসী**, Dhaka, Bangladesh

My lovely parents inspired me all the time to do good things in my life. In addition, my beautiful and well decorated home is the source of my positive energy. My home environment gives me peace, love and affection. I think I am largely inspired by great writers and poets. Writing for me is a creative and poetic process. I love being smitten by words when I am not in rush so as to really drive myself in a creative manner. I find inspiration from everyday life. I am fascinated by relationships of all types – happy ones, complicated ones, unusual ones. Inspiration is abundant - one just needs to open his or her eyes, and breathe it in.

আত্মজার দর্পন

মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণিমার ভরা জোয়ারে ভাসছে ধানমন্ডি বত্রিশের লেকের জল। যেন আমি ম্যানহাটনে স্মৃতিচারণে ব্যস্ত। লিলুয়া বাতাসে আন্দোলিত হয়ে এক কাপ চা নিয়ে বসে আছি আমি ফারাহ হাসান মৌটুসী।

চায়ের চুমুকে মনে পড়ে গেল বাবা'র ভালোবাসা-যুক্ত কপালে চুমু খাওয়া। প্রেরণা বলতে আমি আমার বাবা'র কথাকে বুঝি। সেই স্বপ্ন, আদর্শ কেড়ে নিয়েছে ২০২০ সালের করোনা। করোনার ভয়াল থাবা আমার সকল শক্তি, আশা, বিশ্বাস আর আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করেছে। অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত হয়েছি সম্পূর্ণ একা আমি।

ধানমন্ডি বত্রিশের লেকের ধারে ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্টে আমি, আমার মা ও ছোট্ট বোন নিয়ে আমার সংসার। প্রকৃতির ড্রয়িং রুম সেজে বসে আছে ধানমন্ডি বত্রিশের লেক। সেই লেকের ধারে ছোট্ট একটি অ্যাপার্টমেন্ট; যেখানে দক্ষিণী বারান্দা থেকে কাঠগোলাপের গন্ধ ভেসে আসে।

সেই দক্ষিণের বারান্দা দিয়ে মুক্ত আকাশের নীলিমা দেখা যায়। শরৎ মেঘের ভেলায় আমার পুরোনো স্মৃতিগুলো উঁকি দিচ্ছে বার বার। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে

থাকা বাবার আর্শীবাদ যেন প্রদীপের প্রজ্জ্বলিত আলো হয়ে জ্বলছে।

আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট চার ইউনিটে বিভক্ত। অধিকাংশ ফ্ল্যাটে আমার খালারা থাকে। তারা মাঝে মাঝে আমার গান শুনতে চায়। পূর্ণিমায় ছাদে উঠে তাদেরকে আমি গান শোনাই - "চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে"। জ্যোৎস্নায় ভিজে যায় সব ক'টা মানুষ।

বেগুনি রংয়ের অর্কিড আমার বারান্দাকে সুসজ্জিত করে রেখেছে। পূবের বারান্দা দিয়ে জ্যোতির্ময়তা আমার লিভিং রুমে যখন এসে পড়ে, তখন আমার আত্মবিশ্বাসটুকু বেড়ে যায়। স্বপ্ন দেখতে থাকি। আর ভাবতে থাকি আর মনে মনে গাইতে থাকি- "কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে, সেইতো আজকে নয় সে আজকে নয়"।

আমার বাথরুমটাকে স্নানের বাড়ি বলা উচিত! কেননা সেখানে দুইটি আলাদা ঘর রয়েছে। মাঝখানের ঘরে প্রকান্ড এক গোলাকার বাথটব, সেখানে গা ডুবিয়ে বসে একটা সুইচ টিপলেই চারদিক থেকে গরমজলের স্রোত এসে সারা গা ম্যাসাজ করে দেয়। ডানদিকে কাঁচ দিয়ে ঘেরা শাওয়ার রুম। সেখানে নানা রকমের ধারাস্নানের ব্যবস্থা। মাঝখানে আমার সাজসজ্জা করার জায়গা। সেখানে দেওয়ালজোড়া আলোকিত আয়নার সামনে শ্বেতপাথরের লম্বা টেবিল, তার দুই প্রান্তে অতি সুদৃশ্য দু'টি পাথরের পাথরের গামলা, সেগুলি আসলে হাত ধোয়ার বেসিন। টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো পারফিউম। গরমজলের ধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে খুব ভালো লাগে। মনের চারদিকে জমে থাকা একঘেয়েমি আর দুশ্চিন্তার ময়লা ধুয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য, টানটান স্নায়ু শিথিল হয়ে যায়।

আধো অন্ধকারে নিখুঁতভাবে সাজানো লিভিংরুমটা অবিকল সেই রূপকথার ঘুমন্ত দেশের মতন দেখাচ্ছে। কাঁচের জানলা দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে জ্যোৎস্নার আলো। বাড়ির সামনে অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে পাইন গাছ, ঠিক যেন জেলখানার সেন্ট্রিদের মত। জীবনানন্দের সেই কবিতার মতো মাঝরাতের অন্ধকারে একরাশ পাতার পিছনে পুরানো চাঁদটা দাঁড়িয়ে ঠাট্টার হাসি হাসছে।

আমি একটি কর্পোরেট হাউসে চাকরি করি। বাবা বলতেন, ''লেখালেখি করো। তোমার অনুভূতিকে ব্যক্ত করো"। সাফল্য আর উচ্চাশা বোঝাই নৌকাগুলো জ্যোৎস্নার নদীতে ভেসে যাচ্ছে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের মত। কী যেন নেই আমার এই অ্যাপার্টমেন্টে। বাবার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। হারিয়ে গেছে ভীষণ দামি একটা জিনিস।

ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন অফিস থেকে বের হই তখন বাসায় এসে ড্রয়িংরুমে বিশ্রাম নিই। বিকেলের রোদ্দুরে উজ্জ্বল মসৃণ বাদামি কাঠের মেঝে, তার উপরে সূক্ষ্ম জ্যামিতিক নকশা আঁকা পার্শিয়ান কার্পেট। সেই কার্পেটে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে গান গাই - ''ও যে মানে না মানা"! কখনো কখনো ড্রয়িংরুমে ইয়োগা করি মনকে স্থির করার জন্য। ঈশ্বর প্রার্থনার জন্য আমার এই রুমটা আদর্শ। ভালোবাসা বোধহয় লড়াই শেখায়, মানসিক শক্তি তৈরি করে। আবার কখনো কখনো একা থাকা শেখায়।

হেনরিক ইবসেনের 'An Enemy of the People' নাটকের শেষে একটা বিখ্যাত লাইন আছে – "He fights best when he fights alone"। আমিও একা লড়ছি, নিজেকে একা রাখার জন্য। লড়াই করে অনেকটা পথ অতিক্রম করব বলে। সামনে যে এখনও অনেকটা পথ।

Nasrin Tamanna / **নাসরিন তামান্না**, Brahmanbaria, Bangladesh

While I travel different places, being a girl, I face different situations. At times I see my father is scolding my mother. All these happenings provoke my thought! I do think about my identity, my place in this society, my abilities, my dreams. Sometimes I want to go somewhere faraway from this unpleasant society where I have to face so many obstacles! Sometimes I get tired! So many scattered Ideas, words are floating in my mind! This "my city, my home" campaign inspired me to gather my thoughts and express my words to the world, to share with those women who are facing the similar issues in a different environment, in another country! It inspired me to make my voice heard internationally!

মায়ের জাদু বাঘিনী

'বারান্দায় দাঁড়ানো বারণ, ছাদে উঠলে ভাইয়ের ধমক।

উঠান পেরুলেই বাবার শাসন।

পাড়ার লোকের নাহ, নাহ, কলরব!

ধামড়ি মেয়ের এত কিসের টইটই?

বড় হয়েছ, জানো তো বিয়ে দেয়া যে ফরজ?'

এই হলো আমার ঘর, আমার শহর।

মাকে বলি, আকাশ আমার ভীষণ পছন্দ! আর যদি থাকে হাজার খানেক তারা, তবে তো সোনায় সোহাগা!

মা বলেছেন, "যাদু আমার, খবরদার! রাতে তোমার বাইরে যাওয়া মানা!"

তবে মা, দিনের বেলাতে তারা দেখা যায় কোন দেশেতে? সেই দেশেতেই যাই।

মা আমার রেগে দিলেন হুংকার!

"যাদু আমার, খবরদার! একা তোমার বাইরে যাওয়া মানা!"

এত বারণ, এত মানা?

মা বুঝালেন, "যাদু আমার! প্রশ্ন তোমার করতে মানা!

যা বলেছেন আমার নানি, তাই করেছেন তোমারও নানি!

সবাই আমরা অবলা জাতি।

চুপটি করে ঘরে বসে, সবার জন্য রান্না করে, পেটের বাচ্চা লালন করে, স্বামীর খুব মন ভরিয়ে, রোজ বিকেলে ব্যালকনিতে এক টুকরো আকাশ দেখে, সন্ধ্যের আগে নীড়ে ফিরে, করতে হবে দায়িত্ব সারা।

এই আমাদের জীবন।

যা বলেছেন তোমার বাবা, যা বলেছেন তোমার দাদা, তাই তোমার সংবিধান, তাই তোমার সীমা।"

বলি, মা, বড্ড সেকেলে তুমি! জানো না বুঝি আজ নারীর অসীম ক্ষমতা! নারী আজ রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে, বন্দরে, আকাশে, মহাকাশে!

তুমি বুঝি জানো না মা আজ মেয়েরা কতদূর এগিয়ে?

বোকা মা আমার! হেসে হেসে লুটোপুটি!

বলে কি, "যাদু আমার, খবরদার! ফাঁদে পা দিবিনে। ভোলাভালা খুকি আমার, ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে নিয়ে গিয়ে ঐ হায়েনার দল ছিঁড়ে খাবে! গাড়ীতে, অফিসে, রাস্তায়, কোথাও তোর রক্ষা নেই! মর্গেও তোর নিথর দেহে হায়েনারা জ্বালা মেটাবে!

ছিঃ ছিঃ!

জাত গেলে বেঁচে কী লাভ?

কী করবি তখন ঐ ক্ষমতা দিয়ে? ইজ্জত কি আর ফিরে পাবি?

ঘরে থাক যাদু আমার!"

রেগে মেগে আমি আগুন!

তবে কেন লক্ষ্মী ডাকো? দেবী বলে পুজো করো! তাই বুঝি পুজো শেষে পানিতে ফেলো?

যে শহরে আমার স্বাধীনতা নেই, আমার নিরাপত্তা নেই, যেখানে আমার কথা বলা মানা, সে শহর আমার নয়।

আমি কি তবে জলে ভাসা পদ্মাবতী মা?

মা, তোমার যাদুর নাম আছে, পরিচয় আছে, তোমার যাদু অধিকার আদায় করতে জানে।

আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলাম!

আমি প্রতিবাদ করবো।

আমি চিৎকার করবো।

এই শহর আমার!

আমি প্রীতিলতা, আমি জাহানারা!

আমি তারামন বিবি!

আমি এই ঘরের দুর্গা।

দাদি আমার বুড়ি মানুষ। ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, "নাতিনগো? বেডির গুস্যা বেশ্যা, বেডার গুস্যা বাদশা!"

দাদি আমার বড়ই সরল।

সেই যে ৭ বছর বয়সে পিছদুয়ার দিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর কোনোদিন বের হননি। চুলোর উত্তাপ, হাঁড়ি পাতিলের পরিসংখ্যান, শাক-সবজি, লবণ আর চিনির পরিমাণ, ওসবেই কৈশোর, যৌবন সব পার করলেন।

শেষ বয়সে ঘরের কোণে বসে খোদার নাম জপেন।

দাদি, তোমার বুঝি দাসত্ব পছন্দ?

তোমার বুঝি শখ আহ্লাদ ছিল না?

তোমার বুঝি জগৎ দেখার ইচ্ছা হয়নি?

তোমরা থাকো ঐ চুলো নিয়ে।

চার-দেয়ালের নিয়ম নিয়ে।

আমি নারী!

আমি কালী, আমি সরস্বতী, আমি অন্নপূর্ণা!

আমি আদি মাতা।

আমার গর্ভে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম।

এই ছোট ঘর, ছোট শহর নিয়ে তুমি ভাবছো মা?

গোটা পৃথিবী আমার!

আমি ছাড়া এই ঘর, এই শহর, এই বিশ্ব বিরানভূমি হয়ে যাবে।

আমি ধারণ না করলে পুরুষের ঐ বীর্যের কী দাম বলো দেখি মা?

জ্বালিয়ে দেখাও বংশ প্রদীপ!

আমি নাকি ঘরের লক্ষ্মী, পরের লক্ষ্মী।

আমি রানি মা! আমি স্রষ্টার সৃষ্টি আমার গর্ভে ধারণ করি।

উষ্ণতায়, আদরে, সোহাগে আমি করি তৈরি ভবিষ্যত প্রজন্ম।

যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে।

আমার গুণে, আমার মেধায়, আমার বৃত্তিতে এই বিশ্ব অবাক হয়ে তাকিয়ে রবে।

তরকারিতে লবণ কম হলে বাবা তোমায় আচ্ছা করে দেন বকা। ভাইয়ের যত রাগ, যত দোষ, সব তোমার আর আমার দায়ভার।

ঘরের যত খারাপ সব তোমার ভাগ্যদোষ, যত ভালো সব বাবার কঠোর পরিশ্রম।

বড় সিদ্ধান্ত সব বাবার,

আর বাজারের লিস্টি, ধোপাবাড়ির কাপড়ের হিসাব, দুধওয়ালার দুধের টাকা ঐ সব তোমার।

তোমার বুঝি কর্তা হতে ইচ্ছে করেনা?

তোমার বুঝি আয়েশ করে, পায়ের উপর পা উঠিয়ে, বলতে ইচ্ছা করেনা, "এক কাপ কড়া চা হলে ভালো হয়”?

"আজ অফিস ছুটি, আচ্ছা করে একটা ঘুম দিলে কেমন হয়"?

এই শহরজুড়ে যত গালি, যত তিক্ততা, সব মা তোমার নাম নিয়ে!

এই বুঝি তোমার ঘর, তোমার শহর?

লক্ষ্মী মা আমার, একটা বার এই চুলোর আগুন নিভিয়ে দিয়ে প্রতিবাদ করে বেরিয়ে দেখতে! একবার শুধু শক্ত হয়ে বলতে, আমি মুক্তি চাই!

কেন বললে না তোমার মনের কথাটুকু?

বাবা ঐ লুকিয়ে রাখা ডায়েরির কথা জানেন?

মা বলেন, "যাদু আমার, চুপ কর!

পুরুষ কর্তা, পুরুষ রক্ষক।

দুটো কথা শুনলেই কী হয়? পুরুষের রাগ একটু বেশিই হয়।

তুই ঘরের লক্ষ্মী, ঘরে থাকবি, চুপ থাকবি।

তুই ত্যাগ করবি, বিসর্জন তোর ধর্ম।"

জানো মা, এই দাসত্বের দায় তোমার, আমার, আমাদের!

কেন মাথা পেতে নিয়েছো সব?

বিধাতা তোমায় রানি করে পাঠিয়েছেন।

তোমার পায়ের নিচে জান্নাত লুটিয়ে দিয়েছেন।

তোমায় করে দিয়েছেন উর্বর।

তুমি ছাড়া আদম অসহায়।

এই পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী তুমি।

রাজ্যের কর্ত্রী বুঝি কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বসে থাকবে?

এই ঘরের, এই শহরের আইন প্রণেতা তুমি।

এই জাতি তোমার কাছে ঋণী।

রাস্তার গলিতে, মাঠে ঘাটে, অফিসে, চত্বরে, কেন আমরা চুপটি করে থাকবো?

বাধা আসবেই। শত্রু থাকবেই।

কষিয়ে একটা চড় মারতে হবে।

'না' করতে হবে।

মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।

নারীর শক্তির উৎস স্বয়ং বিধাতা।

এই ঘর নারীর।

এই শহর নারীর!

কেন তুমি পুরুষকে ভয় পাবে? আমি কেন পুরুষের উপর নির্ভরশীল হবো?

তার শরীরেও রক্ত মাংস, আমার শরীরেও তা।

বিধাতা আমার জন্য তাকে, তার জন্য আমাকে বানিয়েছেন।

আমরা রানি, মা!

রানির কোনো প্রতিযোগী থাকে না।

মা? হাতে একটা অস্ত্র, পরনে খাকি পোশাক, বেশ লাগবে কিন্তু আমায়। তোমার মেয়ে দেশের হয়ে দশের সেবা করবে। তোমার ভালো লাগবেনা বুঝি?

আর না হয় ঐ আকাশ নিয়ে গবেষণা করে তোমার জন্য এক ফালি তারার রহস্য নিয়ে আসবো।

মা তুমি কি হার্ভার্ডের নাম শুনেছো? অথবা অক্সফোর্ডের?

মা আমি ওখানের ছাত্রী হলে তোমার বুঝি গর্ব হবেনা?

বোকা মা আমার! বলে কি, "যাদু আমার, থাম এইবার! মেয়ে মানুষের এত স্বপ্ন দেখতে মানা। এত পড়ে কী হবে? ভালো একটা বর দেখে তোমার একটা স্থায়ী ঘর হবে। বিসিএস ক্যাডার! এইতো বেশ!

মেয়েরা ওসব কঠিন কাজ পারবে না।

কর্মক্ষেত্র কি নিরাপদ নাকি?

গবেষণা করে লাভ কী যাদু?

বিরিয়ানিটা শেখা ঢের ভালো, রুটিটা যেন গোল হয়।

যাদু আমার তুই মায়ের জাতি। এত যুক্তিতর্কে সংসারে সুখ আসেনা।"

তোমার মেয়ে বাঘিনী, মা!

তোমার মেয়ে বিশ্বজয় করবে।

আর ঐ পুরুষ? আমি তার সম্পূরক।

এই বৈষম্য, এই বিভেদ, এই অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করো।

এই ঘর, এই শহর আমাদের।

তোমার মেয়ে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবে।

নারী আর পুরুষের পারস্পরিক শ্রদ্ধায়, সৌহার্দ্যে, আন্তরিকতায় আর ভালোবাসায় আমরা এক হবো।

নারী হবে এই ঘরের রানি, পুরুষ হবে রাজা।

এই শহরজুড়ে বৈষম্য রেখে, নারী পুরুষের বিভেদ ভুলে, মানুষ বলবে চিৎকার করে,

"এই ঘর, এই শহর আমাদের!"

Fatima Zerin Prottasha / ফতিমা জারিন প্রত্যাশা, Dhaka, Bangladesh

The belief held by the mass people became a culture and tradition of the society we live in. The notions are taken for granted; so natural that we forget to look and think beyond the apparent boundary. This poem in Bangla is just a search for the truth that connects the inner being of every human soul.

অনুভবে অবিনশ্বর

সুদূর বিস্তৃত আকাশ উপরে,
হয়তো সীমাতীত, হয়তো আবদ্ধ।
দৃষ্টির আড়ালে, নিকষ অন্ধকারে,
স্বীয় শক্তিতে যখন কেউ রুদ্ধ
সংকটের স্থানকালে;
নতুনত্বের নবজন্ম সেখানে!

সেখানেই আবার,
কিঞ্চিত অসমতার যুদ্ধ -
অনির্বাণ স্ফুরণে বিরাট আঘাত হানে কোনো এক
তারই প্রজ্বলিত শিখা, দূর বহুদূর হতে,
ভেসে আসে এখানে, কালস্রোতের প্লাবনে।
অমর অতীতের অক্ষয় আলো স্মৃতি -
পুরনো দিনের কথা বলে।

প্রমাণ চোখের সামনে ধরে মেলে।

আমাদের চোখে;

আমাদের কারও কারও চোখে।

আমরা কেউ কেউ যারা,

প্রকৃতির বিশালত্ব জানি, দেখি, প্রতিনিয়ত,

শুনি কেউ বলে, "অন্ধকার ও আলোর উৎপত্তি ঘটিয়েছি"। [1]

চেষ্টা করি উপলব্ধি করবার,

তাও তাঁকে খুঁজে পাইনা।

আমরা কেউ কেউ যারা,

প্রশ্নাতীত বিশ্বাসে অন্ধ হব না বলে,

অনিরুদ্ধ সত্যের জ্যোতি যদিও বা চোখে পড়ে।

অথচ মস্তিষ্কের অসীম, অসঙ্গায়িত, অনির্ণেয় যুক্তির বেড়াজালে

একমুঠো প্রদীপশিখার জন্য

অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াই!

যখন দেখতে পাই না, বলি, এই অন্ধত্বই তো শ্রেয় সত্য,

"Ruled by mother nature and autonomous by herself!"

আমরা, অবিশ্বাস করি যারা।

অথচ আমাদের মনান্তরালে, আমাদেরই অজান্তে

ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস, শূন্যতার হাহাকার।

অসীমতার মাঝে সন্তোষজনক যুক্তি খুঁজে ফিরে, ব্যর্থ হই যখন,

তখনও আমাদের মাঝে

অস্বীকারোক্তির অহংকার।

আমরাই সেই প্রাণ হয়েও প্রাণহীন!

কেননা, আমাদের হৃদয়, “পাথরের মতো কঠিন,

বরং তার চেয়েও কঠিন!

কারণ অনেক পাথরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নির্ঝর,

আবার অনেক পাথর ফেটে ফেলে,

ভেতর থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে"। [2]

মহাকাশজ্ঞানের অপার বিশালত্বকে ধারণ করতে চেয়েও

হৃদয় আমাদের পাথরের চেয়েও কঠিন।

যদিও আমরাই শ্রেষ্ঠতম, সেটা জানি।

স্বীকার না করলেও, এটাও জানি যে -

কোথায় আমাদের অন্তিম দুর্বলতা,

চিরকালের, চিরজীবনের, চিরপ্রজন্মব্যাপী...!

যদি জন্ম ইতিহাস বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

“Greatest riddle of all times”

তাহলে তার চেয়েও বড় ধাঁধা :

"কী জীবন? কী মৃত্যু?"

“Riddle of the riddles, solved every day.”

এর সমাধান পায় যারা একবার,

বলে যেতে নাহি পারে!

আমরা, অবিশ্বাস করি যারা,

আমাদেরই শুনিয়ে বলা হয় যখন,

"তোমার মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর বিদায়ী প্রাণবায়ু
ফিরিয়ে আনতে পারো না কেন?" [3]
কেন তার চলে যাওয়াকে আমরা রুখতে পারি না?
উত্তরে কেউ বলেন, "তখন আমিই থাকি তার সবচেয়ে নিকটতম।'' [3]
আমরা, যারা অস্বীকার করি।

আমাদের শ্রবণানুভূতিতে,
এ সত্যধ্বনির কম্পন বড় দুঃসহ!
কারণ আমরা ঘোষণা করে দিয়েছি :
এ শব্দতরঙ্গের অস্তিত্ব "অসঙ্গায়িত", "অনির্ণেয়",
"unquestioned belief"।

কিন্তু হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে যায়।
যেমনটা মজিদের মনে হয়েছিল,
কেয়ামত নাজিল হবে, "এখনই"!

যেমনটা "Island of despair" এ Robinson Crusoe
ভাগ্যকে বারংবার তিরস্কার করলেও
অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি,
যখন অনুভবের কান দিয়ে সে শুনেছিল,
কেউ বলছে তাকে,
"Call on me in the Day of trouble,
& I will deliver,
& thou shalt glorify me." [4]

চিরনির্বাসিত নির্জন কুটিরে চরম হতাশাগ্রস্থ, শুনেছে
একাকিত্বকে সঙ্গী করে নেয়ার দুর্মর বাণী:
"I will never ever leave thee, nor for sake thee."[5]
নির্জনতা, অনুতাপ, হতাশা, দুঃখ থেকে সে
খুঁজে পেয়েছিল বেঁচে থাকার সুখ, অর্থময়তা!
তার অনুভূতিটা ধরতে পেরেছিলাম,
বিশ্বাস করেছিলাম!
কারণ, এমন অনুভূতি একদিন আমারও হয়েছিল;
শুনেছিলাম, "নিশ্চয়ই কষ্টের মাঝে স্বস্তি আছে।"[6]
আমি কিন্তু সেই ঘোর বিরুদ্ধগামী,
তবুও জানি না কেন,
বিরুদ্ধ বাস্তবতায়, নির্মম পরাভবে,
spiritually dead যখন,
অস্থির হয়ে উঠি হঠাৎ এই শব্দঝঙ্কারে,
আশার অমিয় বাণীঃ "মনমরা হয়ো না, হতাশ হয়ো না, দুঃখ করো না,
বিজয়ী তোমরাই হবে।" [7]
Robinson এর মতো আমারও মনে হয়েছিল,
"That these words were to me!
Why else should they be
directed in such a manner,
right at the moment,
when I was mourning over my condition!?" [8]
আচ্ছা, এটাও কি co-incidence?

খোলা চোখে কিংবা নির্বাক অনুভবে,
যা কিছু হয়, হচ্ছে, হবে,
সবই কি মায়ার ছলনা, কুহক, প্রহসন?

জানিনা, ভাবতে চাইও না!
বলি, “All those superstitious!”
বলে নিজেদের সান্ত্বনা দিতে থাকি।
আমরা, যারা অবিশ্বাস করি।

কিন্তু কেন এখন হঠাৎ হৃদয়মাঝে এত পূর্ণতা,
এত স্বস্তি, এত প্রশান্তি?
মনে হলো, যেন খুঁজে পেয়েছি কিছু, বহুকাল পর।
কিন্তু এটা কী? বলতে পারছি না !
কারণ, এ অনুভূতি এতখানি অনুভব করে ফেলেছি যে,
এর কোনো উপাংশই বাকি নেই আর
যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে!

সেই অনুভূতি সদাপ্রবহমান ঝরনার কল্লোলের মত,
সাদা মেঘে বহু উঁচুতে ভেসে বেড়ানো
সোনালী ঠোঁট ঈগলের মত।
এই অব্যক্ত অনুভূতি,
supernova কন্যা, উদ্ভাসিত protostar এর মত।
নবজীবনের আশ্বাসে নবীন।
পূর্ণপ্রাণশক্তিমান হৃদয়ের মত স্বাধীন।

কাছে থেকেও দূরে, কোথায় যেন তাঁর ডাক, অব্যর্থ হাতছানি,
isotropic background radiation এর মত।
তাঁকে দেখতে পারি না কিন্তু,
অনুভূতির মাঝে তাঁকে ধরতে পারি,
মনের মণিকোঠায় বেজে উঠে তাঁর সন্ধানী সংকেত,
Penzias ও Wilson নির্মিত detector এর মত!

হোক অসীম বিশালতা, কিংবা অদৃশ্য ক্ষুদ্রতা,
হোক পরম বা আপেক্ষিক
বাস্তব বা বিমূর্ত পারিপার্শ্বিকতা,
নাই বা দিল ধরা।
নেই আফসোস!
কিন্তু, যেটা সত্য,
তোমার,আমার, সবার প্রাণ, অস্তিত্ব,
অতীত, এখন বা আগামীর স্থানকালে,
নাহি হয় কভু বাঁধনহারা
সেই পরম সত্তার, অবিনশ্বর অস্তিত্ব থেকে।

না চাইতেও খুঁজে পাবে তুমি,
তব হৃদয়ের যাচিত ভাষারই আশ্চর্য আহ্বান।
অবচেতনতার সুপ্ত তরঙ্গগুলো,
তাঁর সাড়ায় উদ্বেলিত হয়ে উঠবে তখন।
একবার না, বারবার!
সেটাকেও কি আগের মতো ভাববে তুমি?

কোনো কুহক, মায়া বা ইন্দ্রজাল??
কতবার ভাববে? নিজেরই সত্তার অংশীদারকে
অস্বীকার করবে? কতবার??

আপত্তি নেই কোনো,
নাইবা আস্বাদন করলে তুমি, হৃদয়ের অমিয় সুধা,
জানবার অধিকার তো তারই আছে, যে জানতে চায়।
নাইবা বিশ্বাস করলে হৃদয়ের পরম সত্য।

জীবন সায়াহ্নে আসবে যখন,
আমার কথাগুলো তখন,
তোমার মনে হলে,
নশ্বর জীবন হতে চিরমুক্তির ক্রান্তিকালে,
কিছু কি খুঁজে পাবে তুমি?
আমাকে কি কিছু বলার থাকবে তোমার?
জানতে চাইব ঠিকই,
কিন্তু তখন অনেক, অনেক দেরি হয়ে যাবে।
শত চেষ্টাতেও, পাব না সন্ধান।

References:
[1] Al Quran: Chapter "Al-An'am" - 6:1
[2] Al Quran: Chapter "Al-Baqara" - 2:74
[3] Al Quran: Chapter "Al-Hadid" - 56: 83~86
[4] Holy Bible (Psalm 50:15)
[5] Holy Bible (Deuteronomy 31:6)
[6] Al Quran: Chapter "Ash-Sharh" - 94:6
[7] Al Quran: Chapter "Al-Imran" - 3:139
[8] "Robinson Crusoe" by Daniel Defoe

Khodeza Akhter Jahan Rume / খোদেজা আখতার জাহান রুমী, Dhaka, Bangladesh

It reminds me myself, my people, my city.

আমার বাড়ি - আমার শহর

স্মৃতির পাতায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা যে কথাগুলো সবসময় আমার মনে ঘুরপাক খায়, তা আমার বাড়ি, আমার শহর। অমিতাভ দাদার গানের কলি, "এক রুপসীর প্রেমে আমার মনবান্ধা - ভালোবাসার স্বপ্নঘাটে নাও বান্ধা , ভালোবেসে লাইলী আমি মজনু আমার গাইবান্ধা"। ১৯৭১ এর যুদ্ধের পরে সেই চার বছর বয়সে চলে এসেছিলাম ছোট্ট শহর গাইবান্ধায়। অসংখ্য গরীব মানুষ, গরুর গাড়ি, আর শীর্ণ রোগা স্যান্ডেল ছাড়া, খালি পায়ে হাঁটা যে জনগোষ্ঠী, তারাই আমার আপনজন, তারাই আমার শহরের মানুষ।

গাইবান্ধায় একটা বিলের মাঝে আমার বাড়ি ছিল। নীরব নিস্তব্ধ এলাকা, আশে-পাশে তখনও কিছু ছিল না, চারদিক খোলা আর হু হু করা মন ভালো করা বাতাস। সকালে শত-শত সাদা শাপলার হাসি আর দিনে বেগুনি সুন্দি ফুলের মায়া। আমাদের বাসার ভিতরে পুকুর, আর তার চারদিক গাছ দিয়ে ঘেরা ছিল।

সেই সময়ে যুদ্ধের পর যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার সবকিছু ছিল চোখে পড়ার মতো। পলাশপাড়া স্কুল মাঠে লঙ্গরখানা ছিল। সপ্তাহে দুদিন শীর্ণ, দুর্বল আর ক্লান্ত নারী-পুরুষ, ছেলে-পুলে সহ বাটি গামলা থালা নিয়ে ছুটত। বিলেতি পাউডার দুধ জাল করে তাই দেয়া হত, পাতলা সাদা দুধের রঙটাও ঠিক আসতো না সেই পানিতে। তা নিয়েই হুলুস্থুল, তার জন্যে মারামারি, ঝগড়া আরও কত কী।

আমার স্কুলের নাম ছিল পলাশপাড়া সরকারি ফ্রি প্রাইমারি স্কুল। স্কুলের প্রথম সেই দিন খুব মনে পড়ে, আব্বা আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আম্মা আমাকে একটা কামিজ আর চুড়িদার পায়জামা আর পায়ে লাল জুতা পরিয়ে দিয়েছিল। আর বই নেয়ার জন্য

সুটকেস। এই বেশভূষায় যখন গেলাম সবাই আমাকে ঘিরে ধরল, আজব গ্রহের কিছু একটা মনে করে হাত দিয়ে ধরে আমার চুল, জুতা, সুটকেস সব পরীক্ষা করে দেখেছিল আমার বন্ধুরা। সেই একদিন স্কুলে জুতা পরে ছিলাম আর তারপর পাঁচ বছর থেকে খালি পায়ে, বই হাতে নিয়ে স্কুল-জীবন পার করেছি। স্কুলে প্রথমে শুধু চাল ছিল, তারপর বাঁশের বেড়া; এরপর টিনের চাল, টিনের বেড়া আর একটা টিউবওয়েলও হলো। দৌড়াদৌড়ি করে ঘেমে-নেয়ে কলের মুখে মুখ লাগিয়ে পানি পান; সেই লোহা মিশ্রিত স্বাদ এখনো রয়ে গেছে। সবচেয়ে সুন্দর ছিল স্কুলের মাঠ আর বিশাল বট গাছ।

স্কুলের একটু দুরে বিলকিস খালাম্মাদের বাড়ি তার সাথেই ফরিদা বু'দের বাড়ি। রাস্তার তিন মাথায় আমাদের টিনের বাড়ি। পূর্ব পাশ দিয়ে কলেজ রোড, সেনকাকার দোকান, তার পাশেই নানাভায়ের বাসা। রাস্তা দিয়ে হাঁটার কথা মনেই পড়ে না, জমির মধ্যে দিয়ে এক ছুট দিলেই নানাভায়ের বাসা। ছোটনানি - আমরা ভাবি বলতাম, তার কাছ থেকে আম্মার জরুরি কাজ সেরে আরেক ছুট দিলেই আমাদের বাসা। পলাশপাড়া স্কুলের পিছনে ছিল বাস-স্ট্যান্ড। বিভূতিভূষণের অপু দুর্গার মতো দুরের রাস্তা হেঁটে রেলগাড়ি দেখতে যেতে হতো না; বাসার সামনে দাঁড়িয়েই দেখা যেতো। আমাদের ঘড়ি ছিল না, কিন্তু ছায়ার সাথে সময়ের হিসাব খুব পাকা ছিল। সময়ের সব হিসাব বুঝে নিতাম আলো-ছায়া আর আঁধারের সাথে সাথে।

আব্বা খুলনায় কাজ করতেন, আমার কাকারা তখন ঢাকায়। তাই চিঠি আর মানিঅর্ডার আসতো ডাকে। আমরা সেই ডাকপিয়নের ডাকের অপেক্ষায় থেকেছি। একটু নাকের তলা দিয়ে ডাকতেন মিঠু উ উ উ, মিঠু উ উ উ তোমার বাবার , কাকা মনজুর চিঠি আর টাকা এসেছে। তোমার মাকে ডাকো। তিনি এসে চেয়ারে বসতেন আর আমরা চারদিক দাঁড়িয়ে দেখতাম। সাদা খামের চারদিক দিয়ে লাল নীল সেই স্বপ্নের রঙগুলো। সেই সময়ে চিঠিতে আব্বা আর কাকাদের দেয়া আদর আর ভালোবাসা শোনার জন্য আম্মার পাশে থাকতাম। মাঝে মাঝে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসতো আনন্দাশ্রু। আমার দাদি, যিনি সম্পর্কে আমার বাবার চাচি - তিনিই আমাদের সব ছিলেন। তাঁকে ছাড়া আমার সেই জীবনে আলাদা তেমন কিছু মনে পড়েনা। সেই সময়

থেকে জেনে এসেছি, আমার আম্মা অসুস্থ। তাঁর কাছে বেশি যাওয়া যাবে না আর তাঁকে যেন আমরা বিরক্ত না করি। আর সেজন্যই নাকি খুলনা থেকে আমাদের গাইবান্ধায় চলে আসা। খুলনায় দোতালা বাড়ির হাফ-ছাদে একটা বেবি সাইকেল চালাতাম; চারপাশে ছিল নারকেল গাছ আর সেই দোয়েল পাখিটা, সে অস্পষ্ট ছবি ছাড়া আর কিছু মনে পড়েনা। কিশোর বেলার সেই দিনগুলোতে সেই বাড়ি আর সেই দোয়েল পাখিটা ছিল আমার স্বপ্নে আর সাধনায়; যা কেমন এক না পাওয়ার অনুভূতি হিসেবে রয়ে গেছে।

গাইবান্ধা আমার নানার বাড়ি; চারপাশে সবাই তাই নানা, নানি, মামা, খালা। দাদার বাড়ি কেতকীর হাট; গাঙের পাড়ে। চরের পাশে তাই নানা বাড়ির লোকজন প্রায়ই বলতো, তোরা তো ভাটিয়া। আহা কী সুন্দর আমার দাদার বাড়ির মানুষগুলো, আদর আর ভালোবাসায় দিলখোলা; তাদের এত অভাব কিন্তু কী যে মায়া আর প্রাণখোলা হাসি। তাদের দরাজ গলায় কথা, হাসি আর একতারা বাজিয়ে গান, গাঙের পানির মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ার মতোই হৃদয়ের গভীরে আনচান করা এক অনুভূতি জাগাতো।

বাসায় সুযোগ পেলেই আমরা কলেজের পুকুরে গোসল করে গায়ের কাপড় গায়েই শুকাতাম, সাদা কাদামাটি তাই শুকিয়ে গায়ে ভেসে উঠত। সারাদিন খেলা আর খেলা। সব কাজও খেলার পর্যায়ে ছিল আমার কাছে। শীতের বিকেলে গমের ক্ষেতে যেতাম বতুয়া শাক তুলতে; তার ফাঁকে ফাঁকে বাদাম গাছ তুলে কাঁচা বাদাম খেতাম। সন্ধ্যায় ধু ধু বালু মাঠে বিশাল চাঁদ। আমরা ছেলে-মেয়ে সবাই মিলে বউছি খেলতাম। খেলার শেষে খোলা উঠানে চাঁদের আলোয় চুলার পাশে বসে মাটির পাতিলে রান্না করা ভাত, তরকারি খেতে বসতাম। শীতের সকালে করকরা ভাত, মুলাশাক, পুঁটিমাছ, লাউয়ের তরকারি - এমন অমৃত মধুর খাবার আর পাইনি এ জীবনে।

মাছ ধরা ছিল আমার নেশা। দাদার বাড়ির পাশে নদীতে গিয়ে মাছ ধরে পাতিলে ভরে এনে দাদিমাকে অবাক করে দিতাম। গ্রামের সবার সাথে গাঙে খড়ি ধরতে যেতাম। তখন মনে হতো না যে ভেসে আসা জিনিসগুলো অন্য কাউকে ভাসিয়ে নিঃস্ব করে এখানে এসেছে। সপ্তাহে নদীর পাড়ে দুদিন হাট বসতো, সেই হাটবার গুলো ছিল খুব

রঙিন। ছোট ছোট দোকানে অনেক ল্যাম্প জ্বলতো, নৌকায় করে অনেক মানুষ আসতো সদাই কিনতে। রঙিন কাগজের ফুল, পাতার বাঁশি আরও কত কী বিক্রি হতো। সে সময় নারীরা হাটে আসতো না ঠিকই, কিন্তু হাটের কাছাকাছি যে কোনো বাড়িতে বসে সব দেখত; তাদের বাড়ির মানুষ হাট করে এসে বউ-ঝিকে সাথে নিয়ে বাড়ি ফিরতো। দাদার বাড়ির ঈদ-গা মাঠের কদম গাছে কত কদম ফুটে থাকত। মাঝে মাঝে সেইসব গাছের তলে সুফি-সাধকরা আসতেন; গ্রামের লোকজন তাঁদের ভক্তি করতো। সন্ধ্যায় গানের আসর বসতো, পালা গান হতো। গ্রামের লোকেরা পালাক্রমে রান্না করে তাদের খাওয়াতো, সম্মান করতো। বছরে একবার সার্কাস আর যাত্রা হতো। আমার শৈশবের সেই রংমাখা দিন আর ভালোবাসার মাটির মানুষদের নিয়ে ছিল ছন্নছাড়া ছোট্ট সেই শহর, আমার ভালোবাসার লাইলী, আমার গাইবান্ধা।

Khodeza Akhter Jahan Rume / খোদেজা আখতার জাহান রুমী, Dhaka, Bangladesh

My pain about my adult life, also women's voice encouraged me to write.

আমার বাড়ি – আমার শহর

ছোট বেলার স্বপ্ন দেখা মন নিয়ে
বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতে পা রাখতেই
উরু উরু মনের ডানায় ভেসেছিল
রঙিন পাখা, সব সুন্দর সব ভালোলাগার।
পরিচিত গণ্ডির বাইরে এ আরেক জগত,
পায়ে পায়ে বাধার শিকল হয়েছিল অনেক শিথিল।
অপরিচিত ছোট-বড়র সাথে এক কামরায় বাস
রাতের পর রাত জেগে গল্প খেলা সাপ লুডু আর তাস।
মিছিলে মিছিলে রক্ত কাঁপানো শ্লোগান।
টিভি নাটকে রঙিন অভিনয়
সাথে গোপন কামরায় কদর্য মাখা প্রস্তাব।
সব নোংরা চোখ ফাঁকি দিয়ে ঘরে ফেরা।
তারপর সে জগতের প্রতি এক রাশ ঘৃণা আর
আগ্রহ হারিয়ে ফেলা। বুকের গভীরে এক
দগ দগে ক্ষত পুষিয়ে রেখে আবার পথ চলা।
কত বার হোঁচট খেয়ে খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছি

আবার দাঁড়িয়েছি, রাজধানী এই শহরের মায়ায়

অলিতে গলিতে দেখেছি অনেক লীলাখেলা।

শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রক্তাক্ত হৃদয়।

রক্তের আলপনায় সাজিয়ে ছুটে চলেছি

বানিয়েছি নতুন পথ অদম্য শক্তি নিয়ে।

ঘরের মায়ায় বারবার জড়িয়েছি মাকড়সার জালে।

তারপরও পথ চলেছি চলছি, চলবো সামনে।

Aurora Ahmed Psyche / অরোরা আহমেদ সাইকী, Kushtia, Bangladesh

My memories inspired me at the time of my writing.

আমার শহর – আমার বাড়ি

আপন শহর বলতে আমার চোখের সমানে যে এক দৃশ্য চিত্রায়িত হয় তা হলো কুষ্টিয়া নামক ছোট্ট ছিমছাম একটি শহর। এই শহরেই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। এ শহরের প্রতিটা রাস্তা-ঘাট, আনাচ-কানাচ যেন মায়ের মতোই আপন। এই শহরে আমার হারিয়ে যাওযার কোনো ভয় নেই।এ শহরের প্রতিটা মানুষের ভাষা ভীষণ অপরূপ। প্রতিটি মানুষের কথাতে যেন কবিতার ছোঁয়া থাকে, ছোঁয়া থাকে গানেরও। আমার এ শহরটি যে সাংস্কৃতিক শহর! এ শহরে আছে ফকির লালনের স্মৃতি, স্মৃতি আছে রবি ঠাকুরের। ছোট্ট এ শহর ছেড়ে যাওয়ার সময় বড্ড কষ্ট হয় আমার ভিতরে। যেন একটা বোবা কষ্ট! কিন্তু যখন আবার ফিরি এ শহরে, আমার চোখে মুখে আলাদা একটা আনন্দকর চাঞ্চল্য ঝলমল করতে থাকে। শহরের মাটিতে পা রেখে চোখ বন্ধ করে চিৎকার করে যেন বলতে ইচ্ছে করে, "ভালোবাসি তোমায় এ শহর; ভালোবাসি।" এ শহর যেন আমার মায়ের কোল। ছোট বেলায় এ শহরের রাস্তা দিয়ে বাবার হাত ধরে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে যেতাম স্কুলে, গানের ক্লাসে আর নাচের ক্লাসে। একটা দারুণ ঘটনা আছে। ছোটবেলায় একবার যখন বাবা আমাকে নাচের ক্লাসে রেখে চলে যায়, কোনো একটা কারণে সেদিনকার ক্লাস তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায়। ছুটির পর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বছর। বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতে দেখি বাবার আসার নাম নেই। তখন সিদ্ধান্ত নিই যে একাই যাবো আজ আমি। যেমন

ভাবা তেমন কাজ। শুরু করলাম পথ চলতে। পুরোটা পথ পায়ে হেঁটে তবেই আমি বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফেরার পর মামণি আমাকে একা দেখে বাবার কথা জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে আমি বলি, বাবার দেরি হচ্ছিল, তাই একাই চলে এসেছি। যেন আমি এক বিশাল কার্য-সিদ্ধি করে ফেলেছি। আর অপরদিকে আমাকে আনতে গিয়ে আমাকে না দেখে বাবা তো চিন্তায় অস্থির হয়ে গিয়েছিল। পরে মামণি বাবাকে ফোন করে বলে আমি বাসায় একাই চলে এসেছি। বাবা তো ভীষণ অবাক হয়েছিল যে ছোট্ট আমি এলাম কীভাবে এতটা পথ। অবশ্য আমার সাহসেরও তারিফ করেছিলেন বাবা। থাকগে সেসব পুরোনো কথা। আচ্ছা, এবারে আমি আমার বাড়ির কথা বলি এ শহরের শেষ প্রান্তের দিকেই আমার বাড়ি। দোতলা এই বাড়িটি আমার মায়ের ভীষণ যত্নের, ভীষণ সাধনার। বাড়ির প্রতিটি বারান্দার টবে তার নিজের হাতের লাগানো ফুল গাছ। বাড়ির সামনে আছে বিশাল বড় এক খেলার মাঠ। এই বাড়ির ছাদ থেকে দেখা যায় অপরূপ সুন্দর গোধূলি বেলা। তবে এই বাড়ির মধ্যে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গাটি আমার ঘর; একান্তই আমার। যে ঘরে আমি সাজাই আমার এক আলাদা জগৎ; যে জগতে প্রবেশের অনুমতি আর কারো নেই। আমার সুখ-দুঃখ সব রকমের স্মৃতি রয়েছে এ ঘর জুড়ে। এ ঘরে রয়েছে আমার রাতের পর রাত জুড়ে কান্নার স্মৃতি। সুখের সাগরে ডুব দিতে গিয়ে পেয়েছিলাম অজস্র দুঃখ। এ ঘরে রযেছে আমার ব্যর্থতার গল্প। এ ঘর আমার রাত জাগার সাক্ষী; কত্তো রাত যে পার করেছি তারা খচিত রাতের আকাশ দেখে তার নেই কোনো হিসাব। আবার এ ঘরেই আমি আমার কিছু সাফল্যের খুশিতে আত্মহারা হয়েছি। শুধু তাই নয় এ ঘর জুড়ে রয়েছে আমার কল্পনার জাল বুনো। এ ঘর, এ বাড়ি, এ শহর আমার একান্তই আপন, একান্তই ভালোবাসার।

Rima Das / রীমা দাস, Sylhet, Bangladesh

সিলেটের প্রকৃতি আমাকে সব থেকে বেশি আকর্ষণ করে। এখানে ঋতুবৈচিত্র্যের খেলা আকাশ, প্রকৃতি, নদী ও গাছে ধরা পড়ে। এই ঋতুবৈচিত্র্য মানুষের আচরণেও দেখা যায়। মেঘালয়ের পাদদেশের উঁচু উঁচু টিলাগুলো আরও মোহনীয় করে তুলেছে আমার শহরকে; টিলার গায়ে গায়ে সাজানো চা বাগান যেন প্রকৃতির এক অপরূপ দান। শীতের রুক্ষতায় এখানে যেমন সব রুক্ষ রূপ ধারণ করে, তেমনি যৌবনবতী বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে উপচে পড়ে সৌন্দর্য। এই রুক্ষতা ও সৌন্দর্যকে মনে লালন করে আমাদের আচরণের বহিঃপ্রকাশ হয় আমার লেখায়। শহরের বুক চিরে বয়ে চলছে সুদূর পথের যাত্রী কিশোরী সুরমা। শীতের একহারা গড়নের শীর্ণ কিশোরীটি বর্ষায় হয়ে ওঠে পূর্ণ যৌবনবতী। শীতে সে আমাদের আসন পেতে দেয় তার জেগে ওঠা চড়ে, সেই বুকের কচি ঘাসে নেচে বেড়ায় খঞ্জন পাখি। আবার বর্ষায় সেই যৌবনবতী কিশোরী কোলে করে বয়ে নিয়ে যায় আমাদের দূর দূরান্তে। প্রকৃতি ও মানবের এই অপরূপ রূপ আমাকে বার বার উদ্বুদ্ধ করে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মত আমাদের মাঝেও আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, তাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনধারাও উল্লেখ করার মত। মনিপুরী নৃত্য খুবই দৃষ্টিনন্দন, যা আমাদের বিশ্বকবিকেও আকর্ষণ করেছিল। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, পলাশ, শিমুলের এই সিলেট বর্ষায় সবুজে সবুজে ছেয়ে যায়, কচি কচি সবুজ পাতায় রোদের খেলা অনেকটা ছোট্ট শিশুর তুলতুলে গালের মত দেখায়। এসবই আমার লেখার অনুপ্রেরণা।

রূপান্তর

আজ ঘুম ভাঙতেই আকাশের মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে রুদ্রর মন খারাপ হয়ে গেল। নীল আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। আকাশ থমথম করছে সেদিনের মত, যেদিন রুদ্র মিথিলাকে দেখেছিল। সেদিনও ছিল আকাশে মেঘের ঘনঘটা।জিন্দাবাজারের চৌরাস্তায় রুদ্র দাঁড়িয়ে রুদ্র বেশে, হাতে তার চাপাতি। দুপক্ষের মধ্যে তুমুল মারামারি। সেখানে রুদ্র তার হাতের চাপাতি তুলে ভয় দেখাচ্ছে প্রতিপক্ষকে। মুহূর্তের মধ্যে এলাকার সব দোকান বন্ধ, রাস্তা জনশূন্য, শুধু দু'দলের উচ্ছৃঙ্খল কিছু যুবক রাস্তায়। এরকম এক সংকটময় মুহূর্তে হঠাৎ রুদ্র তার হাতে অন্যের ছোঁয়া পেলো সেদিকে তাকাতেই দেখলো একজোড়া ভেজা চোখ, ফ্যাকাশে ঠোঁটের একটি মেয়ে তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। রুদ্র মেয়েটির দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে বললো –

বাড়ি দিয়ে আসবেন? বিস্ময়ে রুদ্র তার শরীরে অন্য ধরণের হরমোনের উপস্থিতি টের পেলো। মেয়েটি রুদ্রকে তার নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবার জানতে চাইল – বাড়ি দিয়ে আসবেন? রুদ্রর একা একলা পৃথিবীতে এর আগে কেউ এভাবে আকুতি জানায়নি। তাই তার মেরুদন্ড বেয়ে শীতল স্রোত বয়ে তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল, ভাবিয়ে দিয়ে গেল, নাড়িয়ে দিয়ে গেল। এক কথায় রুদ্রর পৃথিবীতে তখন সুনামির ঝড়। সে কোনো মতে আড়ষ্ট ঠোঁট নাড়িয়ে বললো – দেবো। মেয়েটার চোখে নির্ভরতার ঝিলিক দেখে রুদ্রর চোখে জল এলো। তার মত ছেলেকে অচেনা কেউ নির্ভর করতে পারে সেটা রুদ্রর কাছে অবিশ্বাস্য। রুদ্র ত্রাতা হয়ে মেয়েটার হাত শক্ত করে ধরে নিরাপদ দূরত্বে এসে দাঁড়ালো, জানতে চাইলো অচেনা মেয়ের নাম, সে কোথায় যাবে। মেয়েটি জানালো সে মিথিলা। যাবে আখালিয়া। শুরু হলো অচেনা দুজনের পথ চলা। মিথিলা হাঁটছে আর কথা বলছে। অবাক হয়ে রুদ্র দেখছে বিবর্ণ মুখের যে মেয়েটা কিছুক্ষণ আগে কেঁদে অস্থির ছিল, সেই মেয়েই পরম নির্ভরতায় আপনজনের মত বকবক করে যাচ্ছে রুদ্রর সাথে। রুদ্র তার হারানো সময় খুঁজে ফেরে। সে মনে করতে পারে না তার সাথে কবে কে গল্প করেছিল। তৃষ্ণার্তের মত তাই সে মুগ্ধ হয়ে মিথিলার দিকে তাকিয়ে তার চোখের, ঠোঁটের, হাতের নাচন দেখতে লাগল। মিথিলার কথার ঝরনাধারায় রুদ্র অবগাহন করতে লাগলো। তার মনে হতে লাগল মিথিলার কথাগুলো পাহাড়ি ঝরনার মত কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে রুদ্রর নির্জন পাহাড়ি বনাঞ্চলে স্বপ্নের ঘোর লাগা সময়ের রেশ দ্রুতই কেটে গেল মিথিলার কথার বাঁকে বাঁকে এক সময় মিথিলা জানায় – বাড়ির রাস্তায় সে এসে গেছে। রুদ্রর পৃথিবীর তাপমাত্রা তখন এক নিমেষে হিমাঙ্কের নিচে নেমে গেল, তার পথ থমকে গেল, রুদ্ধ হয়ে গেল। অবাধ্য পা দু'টো ঐ রাস্তার বাঁকে পাথরের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, ঝাপসা চোখ দেখলো ছোট্ট প্রজাপতির মত মিথিলা বড় রাস্তা ছেড়ে গলির ভেতর নেচে নেচে যাচ্ছে। হঠাৎ কুড়িয়ে পাওয়া সুখ রুদ্রর কপালে সইলো না বেশিক্ষণ।এমন সময় প্রকৃতি পাশে এসে দাঁড়ালো তার। আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি এলো। বৃষ্টির ধারায় রুদ্র লুকালো তার তপ্ত চোখের ধারা।

রুদ্র তার এলাকায় ত্রাসের অপর নাম। সবাই এক নামে চেনে তাকে, ভয় পায় তার নাম শুনে। তার কাছে খুব প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসে না। সেখানে আদর-ভালোবাসা তো দূর গ্রহের কিছু। রুদ্র মনে করতে পারে না শেষ কবে তার বাবা-মাকে এক সাথে গল্প করতে দেখেছে। শেষ কবে সে তার বাবার কোলে উঠেছে, শেষ কবে সে তার মায়ের গলা জড়িয়ে আবদার করেছে। কোনো স্মৃতি নেই সে সবের। বাড়ির কাজের মাসির কাছেও অনাহূত সে। সেই ছোট্ট রুদ্র পত্র-পল্লবহীন অবস্থায়, ভালোবাসাহীন অবস্থায় রুক্ষভাবে কখন যে বড় হয়ে গেল তা কেউ টের পায়নি। শীতের রুক্ষতা নিয়ে রুদ্র নগ্নভাবে বড় হলো। সে নিজে জ্বলতে লাগলো আর জ্বালাতে লাগলো চারপাশের অনুভূতিহীন মানুষগুলোকে। যে বয়সে রুদ্রর বয়সী ছেলেরা প্রেমিকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, সে বয়সে রুদ্রর হাতে কখনো চাপাতি, কখনো দা, কখনো বা ক্ষুর। যে বয়সে রুদ্রর মত ছেলেরা কামনা করে প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গন, সে বয়সে রুদ্র আলিঙ্গন করেছে অন্ধকার আর শীতলতা। সেই অন্ধকার শীতল জীবনে আলোর ঝলকানির মত মিথিলার আগমন। রুদ্রর জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক। সে বৃষ্টি চায়নি কখনও। তবুও মিথিলার ভেজা চোখ রুদ্রর মরুভূমিতে বৃষ্টি দিয়ে গেল। সে নিজের কাছে জানতে চাইছে বার বার কী আছে সেই দৃষ্টিতে? খুব সাধারণ একটি ঘটনা, দুটো ভেজা চোখ, একটু নির্ভরতা কী করে একটা মানুষকে আমূল বদলে দেয় তা রুদ্র ছাড়া আর কেউ হয়ত জানে না। সেই হেমন্তের মেঘলা বিকেল রুদ্রকে নাড়িয়ে গেল বসন্তের বাতাসের মত। এরপর থেকে রুদ্র নিজেকে আরো গুটিয়ে নিলো। সে সাধনা করতে লাগলো মিথিলার। এভাবে বছর ঘুরে আবার হেমন্ত এলো। আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখে রুদ্র তার ঘর অন্ধকার করে শুনতে লাগলো –

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত....

সারাদিন বন্ধ ঘরে একা সে। রুদ্রর একাকী জীবনের সর্বক্ষণের সঙ্গী একজোড়া ভেজা চোখ। ভালোবাসাহীন, প্রেমহীন, আদরহীন রুক্ষ যুবক অনুভব করছে এক প্রচণ্ড সম্মোহনী শক্তির যা তাকে টেনে নিচ্ছে দূরে, বহুদূরের অজানায়। সেই সম্মোহনী শক্তির প্রভাবে সে সিলেটের আনাচে কানাচে, অলিতে গলিতে খোঁজে সেই দুটো ভেজা চোখ। যে রুদ্র কোনো অনুষ্ঠান দেখতে যেত না, সেই রুদ্র শিশু একাডেমি, শিল্পকলা, শহিদ মিনারের সব অনুষ্ঠানে হাজির থাকত। এই মেঘলা হেমন্তের সকালে রুদ্র প্রচণ্ড মন খারাপে ডুবে যাচ্ছে। সে অনুভব করছে নদীর পাড় ভেঙে যাচ্ছে। আর সেই সাথে সে ডুবে যেতে চাইছে কারো চোখের নির্ভরতায়। সময়ের প্রবহমানতায় হেমন্ত শেষে পরিচিত শহরে রঙের মিছিল নিয়ে আবারও হাজির হয় বসন্ত। বসন্তের ঘোরলাগা এক মায়াবী বিকেলে রুদ্র হাঁটছে তার প্রিয় সুরমায় জেগে ওঠা চরের সবুজ গালিচায়। এই জায়গা রুদ্রর খুব প্রিয়। হাঁটতে হাঁটতে সে অনুভব করছে তার সাথে আছে মিথিলা। নৈঃশব্দে তারা কথা বলছে আর হাঁটছে। এক সময় রুদ্র শুনতে পেলো মিথিলা বলছে - চলো ঐ গাছের নিচে বসি। রুদ্র তাকিয়ে দেখলো তার মত পত্র-পল্লবহীন গাছ বেছে নিয়েছে মিথিলা। রুদ্রর পছন্দের গাছেরা পত্র-পল্লবহীন কংকালের মত হয়। এই গাছগুলোতে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। সেই মুহূর্তে রুদ্র অনুভব করে মিথিলা তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে। রুদ্রর সামনের প্রকৃতি সব ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। সাহসী, কখনও কখনও হিংস্র পুরুষের দুকূল বেয়ে প্লাবন। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ঘাসের বুকের আলিঙ্গনে মুখ লুকালো। হঠাৎ রুদ্রর মনে হলো ভোর হয়েছে, চারিদিকে নতুন আলো। সে ছোট শিশুর মত চোখ মেলে তাকায় আকাশে। আকাশের বুকে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত দেখে রুদ্রর হৃদস্পন্দন থেমে গেল এক মুহূর্তের জন্য। সে সেই গুচ্ছ রং এ দেখলো মিথিলার ভেজা চোখ আর মিথিলা বাতাস হয়ে লাল রং দিল রুদ্রর বুকে। রুদ্র ভালো করে চোখ মেলে দেখলো, যে গাছকে সে এতদিন শুধু কঙ্কাল বলে ভেবেছে সেই গাছ আজ ফুলে ফুলে সেজেছে। সেখানে বসন্তবাউরির উড়াউড়ি, অন্যান্য পাখির কলতান। রুদ্র অনুভব করল তার ভেতরে পরিযায়ী ভালোবাসা। সে শুনতে পেলো তার নিজের অন্তরের ডাক, সে দেখতে পায় তার চোখের সামনের সবকিছুতে মিথিলার প্রতিবিম্ব। ভালোবাসার কুসুম চন্দন চোখে নিয়ে রুদ্র রূপান্তরিত হয় অন্য মানুষে।

Farjana Yeasmin / ফারজানা ইয়াসমিন, Dhaka, Bangladesh

My inspiration for writing My City My Home is to talk about women's right and all the unsaid things women feel but can't say because of social compulsion. I thank My City My Home from the bottom of my heart for giving me the opportunity to do so.

মাই হোম – মাই সিটি

আমি ফারজানা ইয়াসমিন, একজন গৃহিনী। আমি ঢাকার বংশালে দুই মেয়ে এবং স্বামী নিয়ে বসবাস করি। ভাবছিলাম, আমার বাড়ি আর আমার শহর নিয়ে এখানে কিছু বলবো। আসলে সত্যিই কি আমার বলবার মতো কিছু আছে? আমার মনে হয় না।

আমাদের সমাজে মেয়েদের বোঝা মনে করা হয়, মা-বাবা মেয়েদের নিয়ে সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে। আমরা যত পড়াশুনাই করি না কেন আমাদেরকে অন্যরকম চোখেই দেখা হয়, যেটা ছেলেদের বেলায় হয় না। আজ নিজের বাড়িতে আমি কতটা নিরাপদ, এটা নিয়ে আমার নিজেরই সংশয় আছে, আর শহর তো পরের কথা। আমার নিজের বলতে হয়তো কিছুই নেই, এমন কী আমি নিজেই হয়তো নিজের না। মাঝে মাঝে যখন মনে হয়, এই জীবনে কিছুই পাওয়া হয়নি আর করা হয়নি, তখন আমি হারিয়ে যাওয়া নিজেকে খুঁজি বার বার। আমাকে এই বাড়ি বা শহর অনেক কিছুই দিয়েছে, আবার কেড়েও নিয়েছে অনেক। শহরের জীবন বড়ই বিচিত্র, হাসি-কান্না, পাওয়া না-পাওয়া নিয়েই এই জীবন। প্রতিটি মেয়ে ছোট থেকে হাজারো সংগ্রাম করে। কেউ সামনে এগিয়ে যায় আবার কেউ মাঝ পথে ঝরে পরে। এই সমাজ বা দেশ এখনো নারী-বান্ধব শহর গড়ে তুলতে পারেনি বলে আমি মনে করি। কারণ আমি যখন কোনো কাজে বের হই তখন হাজারো খারাপ চিন্তা আমার মাথায় ভর করে, আমি কি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারবো! আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে আমি কোথাও কি মানসিক শান্তি পাই! আমাদের দেশের কিছু কিছু পরিবারে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরাও অর্থ উপার্জন করে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে। তারপরও এখানে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে আমরা অনেক

পিছিয়ে আছি। আমি বা আমার মেয়ে বাইরে থেকে দরকারি ওষুধ বা অন্য কিছু আনতে যেতে পারবো না কারণ এই শহর আমাদের জন্য, রাত বা দিন, কখনোই নিরাপদ না। তারপরও আমকে এই শহরে সকলের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে চলতে হয়। কারণ আমি এই শহরেরই একজন। আমার বাড়ি বা ঘর, যাই বলি না কেন সেখানেও আমাদের একই অবস্থা। সব শেষে কিন্তু আমরা বাড়িকেই নিরাপদ ও শান্তির জায়গা মনে করি এবং এখানেই ফিরে আসি। আমরা নারীরা চাইলেই সব অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারি আমাদের মনের প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে কাজে লাগিয়ে। যুগে যুগে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে অনেকে কর্মঠ নারী, যাদের কথা না বললেই নয়। যেমন, বেগম রকেয়া হাজারো বাধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন, আর ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, তার পরেও আমাদের সমাজ নারী-বান্ধব নয়; এটা খুবই লজ্জাজনক। সবশেষে আমি মনে করি আমারা সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করলে সব অসম্ভবকে সম্ভব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। আমাদের সকলের একটাই চাওয়া, একটা নারী-বান্ধব সমাজ, একটা নিরাপদ শহর আর একটা নিরাপদ বাড়ি, যেখানে আমরা সকলেই ভাল থাকবো এবং অন্যকেও ভাল রাখবো। আমার জীবনের প্রথম লেখা, তাই ভুলগুলি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করা হোল।

Jisrat Alam Mumu / জিসরাত আলম মুমু, Chittagong, Bangladesh

My city is not just a mere city to me, but a part of my dream, which always inspires me and reminds me that in this world I have a home. When I have got the opportunity to write something about my city, I become very interested. I am a Bangladeshi. I have written it in Bengali language as in my opinion mother language is the best to express my internal emotions. My city is the name of this emotion to me. I love my city Chittagong very much.

আমার শহর আমার বাড়ি

আমার শহর!!! সেটা তো আমার কাছে শুধু একটি শহর নয়.....আমার শুরু.... আমার বেড়ে ওঠা.... আমার শিকড়। এই শহরেই বাবার হাত ধরে প্রথম স্কুলে যাওয়া, বেনী দুলিয়ে অবাক চোখে ব্যাটারি চালিত রিকশা দেখা, বড় বড় ভাব করে কিশোরী বেলায় প্রথম কলেজে যাওয়া....আরো কত স্মৃতি।শব্দ দিয়ে আটকানো যায় না, বুকের মাঝে চিনচিন ব্যথা করে জানান দেয় এমন ভালোবাসা আমার কাছে এই শহর। আচ্ছা বোকা তো আমি.... শহরটার নামই তো বলিনি.... আমার শহরের নাম হলো চট্টগ্রাম। আমাদের চট্টগ্রামের মানুষদের আপ্যায়ন সব জেলা থেকে ভিন্ন.... চট্টগ্রামের মানুষদের খাওয়া আর খাওয়ানোর কলিজা বিশাল!!! এখানকার বিয়ে-সহ মেজবান আর অন্যান্য অনুষ্ঠানের পরিসর আর আয়োজন অনেক বড় হয়।চট্টগ্রামের মানুষেরা কিছুটা সহজ সরল.... আমরা অল্পতেই আপন করে নিই কাউকে, কাউকে আপন করতে বেশি জটিলতার হিসাব নিকাশ করি না। আমি এই শহরটিকে এই সরলতার কারণে বেশি ভালোবেসেছি বলে আমার মনে হয়। শহর তো মানুষকে নিয়েই, তাই না?

আমার জীবনটা যদি একটা নকশী কাঁথার সাথে তুলনা করে থাকি, তাহলে সেই নকশী কাঁথার অপরূপ নকশাগুলো হলো চট্টগ্রাম। আমার জীবনে বেশিরভাগ সুখস্মৃতি এই চট্টগ্রামে, আমার বুকের কত বিশাল অংশ জুড়ে যে আমার শহর চট্টগ্রামের বসবাস

আমি তা বুঝতে পারি যখন কোনো কারণে এই শহর থেকে বাইরে যাই। এমনটি হয়েছিল যখন জীবনে প্রথমবারের মত বিদেশে গিয়েছিলাম। কী যেন নেই, কী যেন নেই, কী যে হাহাকার আমার ভেতর এই শহরের জন্য! যেন আমার শরীরের কোনো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ আমি ফেলে এসেছি! ফিরে আসার সময় যখন বিমানে চট্টগ্রামের নাম বলছিল আমার চোখ ভিজে উঠেছিল! যেন মায়ের কোলে ফিরে এসেছি বহুবছর পর, এমন অনুভূতি! মা দরিদ্র হোক, শতছিন্ন পোশাকে থাকুক, হাজারো ত্রুটি থাকুক, সন্তানের কাছে সে সবসময়ই রাজরানি, আমার শহরও আমার কাছে তেমন, সব সুবিধা অসুবিধা ভালো খারাপ ত্রুটি মেনে নিয়েই সে আমার আপন। কারো কাছে ছেলেমানুষি মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে আমার শহরই আসলে আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার নিজের জিনিস, আমার আপনালয়!!!!

কোনো রূপবতী নারীর শরীরে অলংকার পড়িয়ে দিলে যেমন তার রূপ বেড়ে যায় হাজার গুন, চট্টগ্রামেরও তেমনি রয়েছে অলংকাররূপী কিছু স্থান, যেগুলো বাড়িয়ে দিয়েছে এই শহরের আভিজাত্য। কিছু স্থান প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর আর কিছু মানুষের কোলাহলে সুন্দর। পতেংগা সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউ এর সামনে দাঁড়িয়ে জীবনের হিসাবনিকাশ নিয়ে চিন্তা করার সময় আশেপাশে দেখা যায় কত মানুষের কত হরেক রকমের আনন্দ! হয়ত কোনো বাচ্চা তার বাবার সাথে অপার বিস্ময়ে সমুদ্র দেখছে, কোনো নব-দম্পতি এসেছে বেড়াতে, যুবক-যুবতীদের উচ্ছ্বসিত আনাগোনা.... সব মিলিয়েই সমুদ্রকে বিশাল মনে হয়! যেন জীবনের বিশালতা সমুদ্রে মিশে যায়, জীবনের জোয়ার ভাটা সমুদ্রে মিল খায়! প্রাচ্যের রাণী বলে খ্যাত এই চট্টগ্রামে আরো আছে - ওয়ার সিমেট্রি যেখানে নির্জনতার সাথে আছে ইতিহাসের যোগাযোগ, ভাটিয়ারী লেকের টলমল সৌন্দর্য, ডিসি হিলে প্রকৃতির ছায়ায় শরীরচর্চায় ব্যস্ত মানুষদের আনাগোনা ,ফয়'স লেক, বাটালি হিল, বায়েজিদ বোস্তামীর মাজার, চন্দ্রনাথ পাহাড়, জাতিতাত্ত্বিক যাদুঘর, বাঁশখালী চা বাগান, মহামায়া লেক, পারকি সমুদ্র সৈকত, বাঁশখালী ইকোপার্ক, খৈইয়াছরা ঝরনা, বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত, গুলিয়াখালী সমুদ্র সৈকত, সন্দ্বীপ ইত্যাদিকে চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য বিশেষ স্থানগুলোর মাঝে ধরা যায়।

আমার অনেক চাওয়া আছে চট্টগ্রামকে নিয়ে। যেমন একুশে বইমেলা যত বড় পরিসরে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় হয়, তত বড় পরিসরে চট্টগ্রামে হয় না। এই ব্যাপারটা নিয়ে আক্ষেপ আছে। চট্টগ্রামের একক ঐতিহ্যগুলো নিয়ে একটা বিশেষ জাদুঘরের স্বপ্ন দেখি আমি, যেখানে একবার ঘুরে আসলেই পুরো চট্টগ্রামকে অনুভব করা যাবে।

আমার শহর বিশ্বের সেরা শহর হোক, প্রগতিতে, উন্নতিতে আভিজাত্যে, গতিতে – এটা আমার আজন্ম চাওয়া। সব মানুষের নিরাপত্তা এই শহরে নিশ্চিত হোক।

কারণ, আমার শহর আমার কাছে শুধু একটি শহর নয়, আমার বাড়ি....।

Sajeda Sharmin / সাজেদা শারমিন, Noakhali, Bangladesh

In today's world everything has a touch of urbanization. I my country life very much. I wrote this piece to reminisce my past life.

আমার বাড়ি

আমার বাড়ি ছোট্ট গাঁও
বাহন আমার পানসি নাও
বসত করি মাটির ঘরে,
ঘুরে বেড়াই বালির চরে
মাথার উপর নীল আকাশ
মন যে আমার হয় উদাস

Sajeda Sharmin / সাজেদা শারমিন, Noakhali, Bangladesh

I am astonished to see the development of my city. To make life comfortable we are gradually sacrificing our nature. I am dreaming of a city with full of happiness.

আমার শহর

এই শহরে আমার বাড়ি

বন্ধু রইলো নিমন্ত্রণ

খুঁজবো কোথায় তোমার বাড়ি

নাম ঠিকানা ছাড়া?

লাগবে কত ভাড়া?

বন্ধু একটু দাঁড়া

দিলাম না হয় ভাড়া

ক্যামনে দিব নাম ঠিকানা

কাগজ কলম ছাড়া?

Sara Pauline / সারা পওলীন, Dhaka, Bangladesh

In my writing I get inspiration from to those brave girls, who are struggling in their everyday life not to discriminate between male and female gender. Above all we all are human, we should treat each other as human being. We should not treat anyone by his/her gender. I love to writing. My city and My Home gives me an opportunity to expresse my thought and its really a great inspiration for me.

মেয়ে মানুষ

সমাজ বলে মানুষ হওয়ার আগেও আমার বড় পরিচয় আমি নাকি মেয়ে মানুষ।

আমি চিৎকার করে বলি ভুল বুঝছো তোমরা

আমার প্রথম ও সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো আমি এক জন মানুষ

তারপর আমি মেয়ে মানুষ

সমাজ আমাকে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে

বলে তুমি কী বুঝো হে?

তুমি তো মেয়ে মানুষ

মেয়ে মানুষ মেয়ে মানুষের মতই থাকো না

এত বেশি কথা বলো কেন

জানো না তুমি তোমার বুদ্ধি কম

শারীরিক ভাবেও তুমি পুরুষের থেকে দুর্বল

দুর্বল মেয়ে মানুষ কোথাকার কিছুই বোঝে না

মস্তিষ্কহীন এক প্রাণী বটে

বোঝো না তো কিছুই, বলছি তাহলে শোন

পুরুষ মানুষের বীরত্বের কথা

পুরুষ সে তো মহান!

যা খুশি তাই করার সে তো এক মাত্র ক্ষমতাবান

ধর্ষণ, পরকীয়া, নোংরামি এ সব কিছুই করে

দেয় সে তার বীরত্বের প্রমাণ।

যদি করে সে ধর্ষণ চারদিক থেকে বয়ে যায়

হাজারো 'বাহ্ বাহ্' বর্ষণ,

যদি করেও সে পরকীয়া

তবুও হবে না তার চরিত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

যদিও বা যায় সে হাজারো বেশ্যালয়ে

পুরুষ বেশ্যার আখ্যাটা কখনো কেউ দিবে না তাকে

সব কিছুর ঊর্ধ্বে সে পুরুষ তো বটে

মহাপুরুষের চেয়ে কম কিসে?

তুমি তো মেয়ে মানুষ তবে মানুষ ও বলা চলে

তোমার সাথে কি পুরুষের তুলনা সাজে।

বুঝি না বাবা কী আক্কেল তোমাদের

পুরুষের সমান অধিকার পেতে চাও কী করে,

আরে বুঝে নিও মেয়ে নিজের ভালো তো পাগলেও বুঝে

সব সময় বুকে ও মাথায় ওড়নাটা রাখতে শিখে নিও।

সম্পূর্ণ শরীর তোমার কালো কাপড় দিয়ে আবৃত করে দাও

জানোই তো পুরুষ মানুষের দৃষ্টি সীমাহীন,

বেচারারা নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখতে পারে না

তাই বলতে পারো একটু চরিত্রহীন।

বোঝোই তো পুরুষ মানুষ নিজের বশে বশ্যতা

সহজে স্বীকার করে না,

এতে দোষ কী আর তার তাতে?

দোষ তো দেখি সব তোমাদের মেয়ে মানুষের

মডার্ন ড্রেস পড়ে বুক উঁচু করে ঘুরবে

আর ওমনি পুরুষ ঝাঁপিয়ে পড়লে দোষ তার হবে?

দোষ তো তোমার মেয়ে বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারেই কম তোমাদের

ঢেকে ঢুকে চলো দেখি।

এর পরও যদি পুরুষ আক্রমণ করে

চুপটি করে ঘরে বসে থাকো দেখি।

মেয়ে মানুষের এত বাইরে যাওয়ার দরকারটা কী?

আরে মেয়ে মানুষ তুমি এবার তো একটু বুঝতে শিখো দেখি

মহাপুরুষ বলে কথা, বশ্যতা স্বীকার করে নিলে ভেঙ্গে যাবে তো তাদের

হাজার বছর ধরে চলা সেই পৌরুষের গরিমাটা।

তাই ও মেয়ে মানুষ শোন নিজেকে যতটা পারো সংযত করে চলো

এরপরও যদি পুরুষ মানুষ তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দোষ হবে না কোনো।

Zerin Jannat / জেরিন জান্নাত, Dhaka, Bangladesh

Dhaka is a city of dust, chaos and love. I was born and raised here and am living a life full of comfort and love. This city is my home. Yet, there are those to whom the city offers no sanctuary. They are the less fortunate - born into destitution. They are the vulnerables and unwanted. I was reminded of them when I came across the term My City and My Home. Does this city really become home for all? The poem that I have written (in Bangla) is about a girl born into destitution and to a society that doesn't respect women. She lives in a city that offers neither shelter nor acceptance. This is a poem about her life in Dhaka and of her salvation from a world where she is unwanted. She is a product of my imagination but imagination is, at times, the true reflection of reality.

পরিত্রাণ

অট্টালিকার ঢাকা শহরে, জন্ম তার কুঁড়েঘরে।
ভয় তার জন্মের সাথী
জন্মের সময় ভয়, প্রাণে বাঁচতে দিবে তো তাকে?
মেয়ে হয়ে জন্মেছে, সে তো পুত্রসন্তান নয়।

ধুলোর এই ঢাকা শহরে, অযত্নে মেয়েশিশুটি বেড়ে ওঠে
কেবল ভাবে, আজ সে দুবেলা দুমুঠো খেতে পারবে তো?
মনের জ্বালা চোখের পানিতে মেটায় সে
কিন্তু পেটের জ্বালা কেবল অন্নে মেটে।
মায়ের স্তন ছাড়বার পর তার পেটে যে কেবল ক্ষুধার জ্বালা,
প্রতিদিন সে ভয়ে থাকে, আজও কি মিলবে না অন্ন?

শিক্ষার আলো পাবার সাহস সে করে না,
স্বপ্ন দেখে না সে স্বপ্ন ভাঙার ভয়ে।
এই শহর তার নীড়,

তবুও এই শহর তাকে মানে না আপন।

নারীতে রূপান্তরিত হবার আগেই লাল বেনারসি পরে,
ভয়ে কাঁপে, পাশের মানুষটা যে অচেনা!

স্বামীর সংসারে অন্নের নেই অভাব, তবুও তার পাতে জোটে না খাবার
যতদিন না মিলবে যৌতুক, ততদিন রবে সে উচ্ছিষ্ট।

মুক্তি মেলে তার সহসা! আঁতুড়ঘরের রক্তাক্ত বিছানায়।
কৃতজ্ঞতায় চোখ বুজে মেয়েটি,
তার সন্তান জীবন বিলিয়ে দিয়েছে মায়ের মুক্তির জন্য।
মাকে নিয়ে যাবে সে অজানার দেশে,
চলে যাবে সে নতুন শহরে, যেথায় মিলবে পরিত্রাণ।
প্রহার থেকে পরিত্রাণ, ক্ষুধা থেকে পরিত্রাণ,
ভয় থেকে পরিত্রাণ।

Atia Rahman Konica / **আতিয়া রহমান কণিকা**, Dhaka, Bangladesh

যখন একজন মানুষের কোনো সম্মান বা মূল্যায়ন থাকে না তখন তার নিজের ঘর, নিজের শহরও পর হয়ে যায়। একজন নারীর জন্য ঘর কিংবা শহরকে নিজের করে পাওয়াটা আরও কঠিন। অনেক সময় নারীর কাজও নারীকে মুক্তি দিতে পারে না। কর্মহীনতা তো সেখানে অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ঘরে বাইরে যেখানেই হোক মূল্যায়ন ছাড়া প্রতিটা মানুষের জীবনই অর্থহীন। যদি সে নিজের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন না হয়, সর্বোপরি নিজেকে না জানে তাহলে মুক্তি সম্ভব নয়। নিজের অনুভূতি প্রকাশের ইচ্ছাই আমার লেখার অনুপ্রেরণা। আমি এই শহরে, আমার ঘরগুলোতে নিজেকে খুঁজেছি, নিজেকে বুঝতে শিখেছি। শহরের কাছে, ঘরের কাছে আমি কী? এসবই এদের থেকে পাওয়া অনুপ্রেরণা।

আমার শহরে বসন্ত আসুক

অন্য কোনো ভুবন কিংবা অন্য কোনো সময়রেখা থেকে একটা শহর আজ শোনাবে এক নারীর গল্প, আমার গল্প, যে ছোট্ট একটা শহরের বড় বাড়ি ফেলে এসেছিল এই বড় শহরের ছোট ছোট ছাউনিগুলোতে। একটা থেকে অন্যটায়। ব্যবসায়ীরা এই বাক্সতুল্য ছাউনির নাম দিয়েছে কখনো ফ্ল্যাট, কখনো অ্যাপার্টমেন্ট। সময়ের সাথে সাথে নারীটার বয়স বেড়েছে, তার জীবনে মানুষ বেড়েছে, তার জীবনে এসেছে পুরুষ, এসেছে শিশু। এইসব ছাউনিরও আয়তনের পরিবর্তন হয়েছে নারীটির পরিবর্তনের সাথে সাথে। সে-ও স্বপ্ন দেখেছিল নয়তলা বাড়ির নকশা করবে, ছোট ছোট ছাউনির আলপনা আঁকবে, অনেকগুলো স্বপ্নের মধ্যে এটা ছিল তার শেষ স্বপ্ন। ছবি আর কবিতার স্বপ্নগুলোর মতো বাড়ি নির্মাণের এই স্বপ্নটাও হারিয়ে যায়। সেই নারী আমার পথ চিরে কখনো আমারই মতো জ্বলতে জ্বলতে ছুটে চলেছে বুকে নিয়ে তার ব্যর্থতার চিতা। আবার কখনো উৎসবের আলোর সাথে মিশে সে–ও হতে চেয়েছে আলোর কণিকা। আমি পড়েছি সেই নারীর অনুভূতি, তার আনন্দ-বেদনার গাথা। আমি যেমন পুড়ছি প্রতিনিয়ত যন্ত্রে-মন্ত্রে-তন্ত্রের কলঙ্কের হার গলায় পরে, সেও তেমনি পুড়ছে আমারই মতো। চায়ের কোনো ছোট্ট দোকানে চায়ের ধোঁয়ার সাথে সাথে তার দীর্ঘশ্বাসও উবে যেতে দেখেছি আমি। পুড়তে পুড়তে আমার আকাশ কালো হয় বিষাক্ত ধোঁয়ায়, বিষাক্ত নিঃশ্বাসে। তবু এই নারী তার বাঁকা চোখখানি রাখে আকাশের দিকে তার ভেতরের

দহন নিয়ে। এই দহনের শেষ নেই। এই দহন মিশে যায় শহর থেকে ঘরে, আকাশ থেকে মনে।

ঘর? সে কী বলে? এই শহরে প্রাণের স্পন্দন জাগায় কে, এইসব ঘর নাকি মানুষ?

ঢাকা শহরের ফ্ল্যাটগুলোতে চলতে থাকে স্থায়ী-অস্থায়ী পরিবারের অদলবদল। চলে ঘর ভাঙা-গড়ার খেলা। নিঃসঙ্গ মানুষ ঘর বেঁধে পরিবার গড়ছে আবার ঘর ভেঙে মানুষ নিঃসঙ্গ হয়ে পথে নামছে। এদের কেউ পুরোপুরি শহরের, কেউ পুরোপুরি ঘরের আবার কেউ অর্ধেক ঘরের অর্ধেক শহরের।

একটা ঘরের গল্প, বাঁকাচোখের সেই নারীর গল্প শোনায় একটা ঘর। যে নারী পুরো শহরটাকে নিয়ে এই ঘরে বাস করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, আবহাওয়া, মহামারীর সাথে সাথে এই ঘরেও পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন আসে সম্পর্কে, প্রেমে-অপ্রেমে। পরিবর্তন আসে পুরো ভবনে, এর ছোট ছোট ছাউনিগুলোতে। আমার ঘরের দেয়াল জুড়ে রয়েছে সেই নারীর সময়, স্মৃতি, বিস্মৃতি, স্বপ্ন। এসবের প্রকাশ হয়েছে তেলে-জলে আঁকা ছবির মাধ্যমে। অথবা প্রকাশ পেয়েছে কোনো কবিতায়। এই ঘরে বসতি গড়েছিল যেসব নারী তারা প্রত্যেকেই আলাদা, আবার একই রকম। এই বাঁকা চোখা নারী ভাগ্যের হাতে বন্দী। বন্দী সম্পর্কের হাতে। বন্দী সময়ের হাতে। তার বেঁচে থাকা এইসব স্মৃতি, বিস্মৃতি নিয়ে। সময়-অসময়ে, স্বপ্নে। সে সেখানেই তার চিন্তা যেখানে। তাকে পরিচয় করিয়ে দেবার মতো কোনো পদবি তার নেই, তাই এই বাঁকাচোখা সম্বোধন।

কখনো মনে হয় সেও আমার মতোই ঘর

কিংবা ঘরের কোনো অংশ,

কোনো রক্তমাংসের মানুষ নয় যেন।

কখনো সে আমার দেয়ালের মতো,

কখনো কৃত্রিম আলোয় স্নাত বেলোয়ারি ঝাড়।

কখনো খোলা জানালা। কখনো রুদ্ধদ্বার।

তার আঙুল ধরে বেড়ে ওঠে শিশুরা, কিছু গুল্ম-বৃক্ষরাও। এসবের ভেতরেও কাজ থেমে থাকে না তার, থেমে থাকে না বেঁচে থাকার আয়োজন। এই আয়োজন, এই খেলনা শহর এবং এই খেলনা ঘর চলে টাকার ব্যাটারিতে, ঘরে থাকা বাচ্চাদের খেলনাগুলোর মতো।

টাকা ছাড়া দেয়ালের ঘড়িটাও থেমে যায়। ঘরের নারীটি বিশ্বাস করে টাকাকে কখনো বন্দী করা যায় না, টাকা মানুষকে বন্দী করে। টাকা মুক্তি দিতে পারে না বরং বিক্ষিপ্ত করে। টাকা শুধু বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। তারও টাকার প্রয়োজন আছে, টাকা ছাড়া রঙও মেলে না, কলমও মেলে না। প্রয়োজন আর প্রেম এক বস্তু নয়।

বিক্ষিপ্ত এই নারী নিজের মুখোমুখি হলেই কেবল সংহত হয়। নিজের প্রতিবিম্বের মুখোমুখি। এই আমি তার ঘর সেই বক্রনয়নাকে দেখি যখন সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, আয়নার সামনের জন এবং আয়নার ভেতরের জন কতই না আলাদা! তারা দুজন কি দুজনকে চেনে, নারী তার ছায়াকে অথবা ছায়া নারীকে?

চোখ বন্ধ করেই সে নিজেকে দেখতে পায়। আয়না যেন শুধুই ভরসা।

তার গল্প সে শোনে কখনো তার বর্তমান শহরের কাছে, কখনো তার বর্তমান ঘরের কাছে। কখনো আবার শোনায় আয়নার প্রতিবিম্বটি। সে অনেক শহর বদলালেও এই শহরেই কেটেছে জীবনের অর্ধেকটা সময়। বদলেছে অনেক ঘর। তার নিজের পুরনো বাড়িটি যে কোনো সময় ভেঙ্গে যেতে পারে, ভেঙ্গে নতুন হতে পারে। একটা জিনিস লিখিত হলেই কি নিজের হতে পারে, যদি সেখানে কোনো স্মৃতি না থাকে? আমার ঘর সেখানেই যেখানে আমি আছি এবং আমি স্মৃতি তৈরি করি। আমাকে বাঁচিয়ে রাখে আমার কাজ - ঘরে, শহরে, প্রেমে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখে আমার চিন্তা, আমার স্বপ্ন। রঙ কিংবা কলম নিছক বাহানা। চিন্তা আর স্বপ্নগুলিকে এখনো আঁকতে পারিনি, লিখতে পারিনি। নিজেকে আরও যোগ্য হতে হবে, বিন্যস্ত হতে হবে নিজের অনুভূতিগুলোকে মূর্ত করে তুলতে।

এখন শুধু ভালোবাসতে জানি, আগলে রাখতে জানি। আপন করে নিই এই শহরের নিরাপত্তাগুলো, এই শহরের শুদ্ধতাগুলো, এই শহরের মায়াগুলো। তেমনি ঘরেরও। তেমনি আমার আত্মারও।

ঘরের মায়াগুলো, শুদ্ধতাগুলো আর যা কিছু ভালো সব আমার, বাকি সব অস্বীকার করি। আত্মার ভেতরও যা কিছু শুদ্ধ সবই আমার, অন্ধকার তাকে স্পর্শ করে না। অস্বীকার করি।

এই শহরের রোদে পোড়ে ছাদ, পোড়ে নারী। পোড়ে মানুষ। পোড়ে নিয়ম। পুড়ে পুড়ে রত্ন হয়। এই শহরের বৃষ্টিতেও ভিজে যায় কোনো রমনীর ছাদ, ভেজে রমনী। ভেজে মানুষ। ভিজতে ভিজতে অনেকেই আবার মানুষ হয়। মানুষ ছবি আঁকে। ছবি আঁকে রিক্সার

পেছনে, ছবি আঁকে রিক্সায় বসে থাকা কোনো যুগলের পোশাকে। ছবি আঁকে রাস্তায়। শিল্পকলায়। ছবি আঁকে দ্রোহে অথবা প্রেমে।

মানুষ কবিতা লেখে। গান গায়। অনুভূতি বুঝতে পারাতে, বলতে পারাতেই বেঁচে থাকার সার্থকতা। এইসব অনুভূতি কবিতায়, গানে, ছবিতে, কথায়। এই অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া এবং পারস্পরিক মূল্যায়নই মনুষ্যত্ব। তা-না হলে পৃথিবী বাসযোগ্য হবে না। বাসযোগ্য হবে না কোনো শহর, কোনো ঘর।

ছাদে বসন্ত আসুক। কোকিলের সাথে সাথে নারীটিও গেয়ে উঠুক-

“নিশা লাগিলো রে,
বাঁকা দু'নয়নে নিশা লাগিলো রে..."

Khursheda Akhtar / খুর্শেদা আখতার, Dhaka, Bangladesh

My experience and surrounding observation inspire me to write. Each day passes in the city with a little joy, a little sorrow. Some get absolute comfort, some face obstacles. Some overcome difficulties, some cannot. Consummation of all these inspires me to write 'My City My Home'.

শহরের পথ চলা

শহরের চোরা গলিতে

একটু থেমে, চমকে পিছন ফিরে

চলতে থাকি, আপন গতিতে

নিজের মাঝে হারিয়ে,

নিজেকে খুঁজে ফিরি

আবিষ্কারের নেশাতে।

একটু হাসি, ভালোবাসি

ঝরনার কলকল ধ্বনিতে

সাত সাগর আর তেরো নদীর পাড়েতে

জ্যোৎস্নার স্নানেতে।

হোঁচট খেয়ে থমকে দাঁড়াই

বেদনার গ্লানিতে

কাকের কা কা ধ্বনিতে।

ঘুরে দাঁড়াই সবুজ আভায়

মুক্তির মিছিলে

বাবার প্রতিচ্ছবি আয়নাতে।

এক চিলতে চাঁদের আলোয়

চলি এই শহরে

স্বপ্ন জাল বুনতে বুনতে।

বটের ছায়ায়

মাটির ফোকরে বেড়ে ওঠা বট গাছে

অথবা বনসাইতে।

Ruma Modak / রুমা মোদক, Habiganj, Bangladesh

The struggle of the lady, who helps my household chores as a maid servant, against the odds in the society inspires me to write 'My City My Home'.

রাক্ষস কিংবা মানবের ইতিবৃত্ত

সুবলা তেতে আছে গরম করা কড়াইয়ের মতো, গৌরির মুখ নেই সেখানে দুফোঁটা আত্মপক্ষ সমর্থনের জল দেয়া। শুরু থেকেই সুবলা গৌরির দ্বিতীয় বিয়ের তীব্র বিরোধী। সুবলা নিজের দ্বিতীয় বিয়ের নাকে খত দেয়া নানা বিরুপ অভিজ্ঞতা সারাদিন বয়ান করে বিভীষিকা জাগাতে চেয়েছিল গৌরির অভিপ্রায়ে। গৌরি তখন সিদ্ধান্তে নিরুপায় স্থির, ভুল হলে ভুল। ঠিক হলে ঠিক। পঁচিশ কি আর শরীরের ডাক অস্বীকার করার মতো সন্ন্যাসী বয়স?

সুবলার কাছে জীবনের একটাই হিসাব, রাক্ষুসে ক্ষুধা। আমি তো দুইবার সাঙ্গা বইছিলাম দুইডা পেট চালাইবার লাইগ্যা, তর তো হেই চিন্তা নাই। ক্যান আপদ ঘাড়ে নেছ! আহা, নিজেকে আপদ ভাবার দিন বুঝি মুড়িয়েছে নটে গাছটির মতো। মেয়েমানুষ নয়, কোনো কোনো পুরুষমানুষই আপদ এখন। অযাচিত উৎপাত থেকে আপন মাংস রক্ষার ঢাল আর জৈবিকতার প্রয়োজন শুধু। নইলে এই যে মন্টু, দ্বিতীয়বার যার গলায় মালা দিয়ে জৈবিক চাহিদাকে সামাজিক বৈধতা দিয়েছে গৌরি, নিজে থেকে না গেলে তাকে তো ঠেলেও বের করা যায়না ঘর থেকে। দুই দুইটি পরিবার জীবনে জড়িয়ে থাকলেও জীবিকা তার কাছে দায়ও নয়, দায়িত্বও নয়, বরং ইচ্ছা অনিচ্ছার ছেলেখেলা। বসিয়ে বসিয়ে দুবেলা খোরাকি যোগানো ছাড়া উপায় থাকেনা গৌরির।

তিনদিন আগে ম্যাডামকে টাকাটা ফেরত দেয়ার কথা। এই কথামতো ফেরত দিতে না পারা ভবিষ্যতে সাহায্য পাবার সব সম্ভাবনার দরজায় খিল দিয়েছে। গত তিনদিন ধরে গৌরি সময় নিয়েছে,আজ না কাল। আজ আর কোনো অজুহাত নেই দেখানোর মতো। জীবনের খরস্রোতে কত খেয়াই পাড়ি দিয়েছে, কত অচেনা পানিপথ, দুই মেয়ে সহ যেদিন বিষ্ণু বাড়ির উঠান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, অতর্কিত আশ্রয় হারিয়ে সেদিনও

হুঁশ হারায় নি সে। ঠাণ্ডা মাথায় সম্মুখের পরিস্থিতি পাড়ি দেবার উপায় ভেবেছে, খুঁজে বের করেছে। আজও পারবে এমনই বিশ্বাস।

ম্যাডামের কাছ থেকে মাসের প্রথমে দশ হাজার টাকা চেয়ে এনেছিল গৌরি। এন জি ও'র শেষ কিস্তি দেবার জন্য। আবার নিজের বালাজোড়া সুধীর বণিকের ঘরে বন্ধক দিয়ে টাকাটা এনেছিল ম্যাডামকে ফেরত দেবে বলে। তিনবাড়ির ছুটা রান্নার বেতন পেয়ে সুধীর বণিককে দেবে। দিন, তারিখ, নির্ধারিত সময়ের তিন চারটা জটিল সমীকরণ মেলানোর চেষ্টায় গৌরি যখন ব্যতিব্যস্ত তখন তিনদিন আগে সকাল সকাল বের হওয়ার মুখে গৌরি দেখে চাটাইয়ের নিচে ব্যাগে টাকাটা নেই, নেই তার দ্বিতীয় স্বামী মন্টুও।

নানারকম সম্ভাব্যতা নিয়ে ভাবে সে। নিজেকে থই–হীন লাগে, তবু পথ খোঁজার লগি-বৈঠা শক্ত হাতে ধরে রাখে। এন জি ও'র কিস্তি শেষ হয়ে গেলে সেলাই মেশিনটা তার। ঘরে বসে জীবিকা। প্রতিদিন আঁধার ভোরে বের হবার তাড়া ফুরাবে। আর আজ ভোর না হতেই সেই পরিকল্পনার আনন্দ গিলে খেয়েছে অপ্রত্যাশিত উৎকন্ঠা!

গভীররাতে মন্টু ঘরে না ফেরাতে নিশ্চিন্ত ছিল, নিশ্চিত গীতারাণীর বাড়ি গেছে সে। ঠিকানা তো দুইটাই। মতি, হরি, লিটনের মতো এ বাড়ি ও বাড়ি উঁকিঝুঁকি দেয়ার বাতিক নাই লোকটার।

এই কথাটা কেন জানি সুবলার গায়ে আগুন ধরায়। তার স্পষ্ট যুক্তি দুটি। এমন বসাইয়া বসাইয়া জামাই আদর করলে অন্য ঘরে উঁকি দিবো কী করতে? পাগলেও নিজের বুঝ বুঝে। আর হে তো সেয়ানা পাগল। সাথে দ্বিতীয় যুক্তিটা দিতেও বিন্দুমাত্র দেরি করে না সুবলা। এত্ত ভালা হইলে তরে বিয়া করতে গেল ক্যান।

এটা অকাট্য। দুজনের দুইবার দেখা হতো দিনে। যাবার পথে একবার আর আসবার পথে একবার। ইচ্ছাকৃত নয় আবার অনিচ্ছাকৃত কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় গৌরি। ম্যাডামের ফ্ল্যাটের গেট সাতটায় খোলে আর নয়টা বাজার আগে রান্না সারতে হয়, তাই গৌরি শীত গ্রীষ্ম বসন্ত ভোর ছয়টাতেই ঘর থেকে বের হয়। আর মন্টুর বাস ছাড়ে সকাল সাড়ে ছয়টায়। হাইওয়ে পার হয়ে ঢাকা পৌঁছাতে ছয়/সাত ঘন্টা। আবার ফিরতি বাসে আসতে আসতে সন্ধ্যা। সময়টা যেন কী করে মিলে যায়। নদীর বাঁধের উপর দিয়ে

পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় চার চোখের বিনিময়ে উঁচুতে লাল বাতি জ্বলতে থাকা মোবাইল টাওয়ারের মতো শক্তিশালী রশ্মির মতো শরীরে শরীরে চুম্বকের উত্তর দক্ষিনের বিপরীত মেরুর আকর্ষণ ঘটে!

মন্টু টিনের ছাউনি ছেড়ে বাঁশের ঘরে চলে আসে। সেটা মেস ঘর আর এটা সংসার। সেখানে বুয়া তিনবেলা নিয়মের ভাত তরকারি রাঁধে, লবণ-মরিচ কম হোক বা বেশি, খেয়ে নিতে হয়। আর এখানে একটু শুটকির ভর্তায়ও অধিকার থাকে, আরেকটু দাও, বলার আধিপত্য থাকে। কাল ধনেপাতা দিয়ে রসুন ভর্তা খাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করা যায়। আরেকটা অধিকারও থাকে। যখন ইচ্ছে শরীরে উপগত হওয়ার অধিকার।

এর জন্য অবশ্য নিজেকেও অস্বীকার করে না গৌরি। পারস্পরিকই বটে। দুই কন্যাসন্তান নিয়ে মায়ের কাছে আসা অবধি দুই চারজনের উঁকি দেয়া অব্যাহত ছিল। লুকিয়ে চাপিয়ে দুয়েকজনের সাথে বিনিময়ও হয়েছে চাওয়া পাওয়া। কিন্তু বিয়ে করে নিলে আর লোকের পাঁচকথার তোয়াক্কা থাকেনা। যদি এটাকেই পেশা করে নেয়ার ধান্দা থাকত তো অন্য কথা। পারুল, নীহার যেমন নিয়েছে। দুই কন্যার দিকে তাকিয়ে গৌরি ও পথ মাড়াতে চায়না। কত বিচার সালিশ বৈঠক করেও আগের ব্যাটা ঘরে নিলোনা। মেয়েদের ভাগ্যকে এই ব্যাটাছেলেদের ইচ্ছা অনিচ্ছার খেলার মাঠ করতে চায় না সে।

কন্যা দুটোকে লেখাপড়া শিখিয়ে চাকরিতে দিতে চায়। যেন ওর মতো বের করে দিলেও চোখে সর্ষে ফুল না দেখে। সুবলার মতো পেটের চিন্তা আর তার মতো সামাজিকতার আতঙ্কে বাড়তি পেট লালনের চিন্তা তাদের পীড়িত না করুক। তাদের পায়ের নিচে মাটি নদীর কূলের আঠালো নরম অবিশ্বস্ত না হোক, বরং ঢাকা যাওয়ার হাইওয়ের মতো শক্ত কিন্তু মসৃণ হোক। কন্যা দুজন ইস্কুলে যায়।

নিজের প্রয়োজন মনে মনে গুরুত্ব দিলেও ব্যাটা কি আর তা দেয়? ঠিকই গৌরির ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে যখন তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে শরীরে। পুরোনো বউ নিয়তির কাছেও যায়, সব জেনেই নয়াহাটির ইস্কন মন্দিরে গিয়ে মালাবদল করেছে সে। রকিব মিয়ার কলোনীতে ভাড়া থাকা বিশ ঘরের মানুষ যে ছি ছি করেছে, শুধু রকিব মিয়াই মাসের ভাড়া তুলতে এসে বাহবা দিয়েছে। বেশ কইরছস। নাজায়েজ কাম না কইরা এক্কেবারে সাঙ্গা কইরা লইছস।

সুবলা সাথ নেয়, মেয়েকে একা ছাড়তে রাজি নয় সে। পনেরো থেকে আজ চল্লিশ, পঁচিশ বছরের সঙ্গী এ মেয়ে। পথে নেমে হাঁটা দেয় দুজন। রিক্সাভাড়া করে পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচের বিলাসিতা এখন মানায় না তাদের। কয়েক প্যাঁচ রাবারে আটকে রাখা ফোনটা বাজতে থাকে অবিরাম বিরক্তিকর রিংটোনে। পাওনাদার ম্যাডামের ফোন।

রাঙাগাঁওয়ের একটাই রাস্তা। এবড়ো খেবড়ো, বর্ষার নরম কাদায় গাড়ির চাকার ছাপ ফেলে যাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক গর্ত সারা রাস্তায়। বাড়িটাও সে চেনে। বিয়ের পর তাকে নিয়ে একবার এসেছিল মন্টু। নেংটা ছেলের দল এক পলক চোখ তুলে তাকায়। মেয়েটা দৌড়ে ঘরে ঢোকে। ও মা বেডি আইছে। ঘরের ভেতর জমাট জমাট একগুঁয়ে অন্ধকার, বাইরের অবাধ আলো ডেকে নেয়ার সুযোগ না পেয়ে ফুঁসছে। সেখানে আধভাঙা তক্তপোশে অস্পষ্ট মন্টু।

নিয়তিরাণী খোঁড়াতে খোঁড়াতে বের হয় ঘর থেকে, রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাকের নিচে পড়েছিল সে। পুরামাস কচু সেদ্ধ কইরা খাইছি, ব্যাটা মাত্র বাড়িত আইছে এমনেই দৌড়াইয়া আইছস। আমার পোলাপানের দুইডা ভাত খাওয়া সহ্য হয় না তর?

সুবলা গৌরিকে টেনে বের করে বাড়ি থেকে। সুবলা জানে পেটের ক্ষিধার চেয়ে ভয়ংকর রাক্ষস দুনিয়াতে আর কিচ্ছু নাই। যুদ্ধংদেহী মনোভাবে আসলেও গৌরিও চুপ করে বের হয়ে আসে। এই বাচ্চাগুলোও তো প্রায় তার কন্যাদের সমবয়সী।

Jannatul Sharmin Nisa / জান্নাতুল শারমিন নিছা,
Moulvibazar, Bangladesh

When I saw the title 'My City My Home' in a paper, first thing that comes to my mind is that I should write about my city.

নারীর চোখে তার শহর

লেখালেখি তেমন একটা পারি না কিন্তু আমার শহর আমার বাড়ি নিয়ে লিখতে হবে তাই একটু কৌতূহলী হয়ে এই বিষয়ে লিখতে বসলাম।

শহর কী? শহর মানেই উচুঁ দালান-কোঠা, পাকা রাস্তা, যানবাহন আর জীবিকার সন্ধানে ছুটে চলা ব্যস্ত মানুষ। অবিরাম ছুটে চলা, সময়ের ব্যস্ত চাকায় জীবনকে পিষে ফেলাই শহুরে জীবনের স্বরুপ। আপন ভুবন গড়ে তোলা নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত শহরের মানুষ। মানবিক সম্পর্কগুলো শহরের মানচিত্রে জটিল এক সমীকরণ। জীবনের ব্যস্ত গোলক-ধাঁধায় পাক খায় মানুষের আবেগ। আর তাই কাউকে দেখা যায় বিলাসী জীবনের ছন্দে আটকে আছে, আর কেউ বা অযত্নে অবহেলায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। শহর যাকে দেয় দু'হাত ভরে দেয় আর যাকে দেয় না সে পড়ে থাকে পথের পাশে। শহর যেন অসমতার এক নীরব তটরেখা। এখানে একই আকাশের নিচে কেউ গরীব, কেউ ধনী, কেউ রাজপ্রাসাদে বাস করে আর কেউ ফুটপাতে। রঙিন বিজলীবাতি আর পাকা বাড়ি শহুরে জীবনকে নান্দনিক করে দিলেও কেড়ে নিয়েছে মানুষের আবেগ। শহরের চার-দেয়ালে মানুষের জীবন তাই হয়ে গেছে রংহীন আলপনা। ব্যস্ত শহরের দূষিত বাতাসে আটকে পড়া মন তাই ছুটে যেতে চায় দিগন্তের কাছে। এই ব্যস্ত শহরে ছুটে চলছে মানুষ আপন গতিতে কিন্তু নারীদের জীবন আটকে আছে সেই ঘরের কোণে। নারী ছাড়া পুরুষ চলতে পারে না এ একখানা সর্বজনীন সত্য কথা, ঠিক তেমনি নারী ছাড়া কোনো শহরও চলবে না। কিন্তু দুঃখজনক সত্য হলো নারীরা আজ নিজ শহরে নিজ বাড়িতে নিরাপদ নয়। নারীরা নিজের হাতে সাজানো বাড়িতে শারীরিক নির্যাতন আর ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, কেউ কেউ এর বিচার পাচ্ছে কিন্তু অধিকাংশই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শাস্তি হিসেবে নিজের প্রাণ হারাচ্ছে। বেগম রোকেয়ার সেই সমাজ এখন আর নেই। নারীরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নির্যাতিত হচ্ছে জীবনের প্রতি পদে। গৃহিণীরা সারাদিন খেটে বাবা, স্বামী, সন্তানদের

জন্য বাড়িতে থাকার পরিবেশ গড়ে তুলছে কিন্তু দিনশেষে যাদের জন্য এত পরিশ্রম তারাই লাঞ্ছিত করছে নারীদের।

এবার আমার শহর নিয়ে কিছু লিখতে চাই। পৃথিবীর বুকে ছোট্ট একটি দেশ বাংলাদেশ আর এই দেশের সিলেট বিভাগের ছোট্ট একটি শহর মৌলভীবাজার। অনেকেই এই শহরের নাম শোনেনি বা জানেনা। মৌলভীবাজারের মাটিতে জন্ম আমার। এই শহরের আলো বাতাসে বেড়ে উঠা আঠারো বছরের মেয়ে আমি। এখনো বিশ্ব দেখিনি মৌলভীবাজার এর বাইরে পা পড়েনি এখনও তাই আমার কাছে আমার শহর মৌলভীবাজার সব চেয়ে সুন্দর। এই আধুনিক যুগে মানুষ যখন কোলাহলে ব্যস্ত ট্র্যাফিক জ্যাম এ আটকে আছে আমি তখন চষে বেড়াচ্ছি এই শান্ত নিরিবিলি শহর। বিশ্ব যখন বড়ো বড়ো মার্ডারার ক্রিমিনালদের পিছনে দৌড়াচ্ছে আমরা তখন কোনো এক বাড়িতে চোর ঢুকলে ডাকাত পড়লে সবাই মিলে ওর পিছনে ধাওয়া করছি তাই বলে এই না যে আমরা আধুনিকতায় পিছিয়ে আছি।

এই শহরের মানুষ বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে ঠিকই চলছে কিন্তু তা একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই ছোট্ট শহরই কিন্তু আমার বাড়ি, এই শহরের পথে ঘাটে বের হলে আপনজনের অভাব হয় না। নারীদের জীবন সব সময় একটি সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নয় কিন্তু আমি নারী কোনো এক অদৃশ্য কারণে নারীদের সব সময় ঘরেই থাকতে হবে এমন নিয়ম শুনে এসেছি ছোট থেকে। নারীরা সবকিছুকে আপন করে নিলেও আসলে তাদের নিজের বলে কিছু থাকে না।

আমি নারী, আমি এইসব আলোছায়া থেকে বেরিয়ে শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে চাই, একটু শান্তির জায়গা চাই যা শুধুই আমার, একান্তই আমার।

গ্রামীণ জনপদ পেরিয়ে শহরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালেই মনে হয় প্রকৃতি যেন পিছনে হাঁটছে। শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় বাতাস থমকে যায়। সবুজ মাঠ, অবারিত ফসলের ক্ষেত আর বহতা নদীর বড় অভাব ইট, কাঠের শহরে। নান্দনিক স্থাপত্য, আকাশচুম্বী সব অট্টালিকা শহরকে একদিকে যেমন দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে অপরদিকে করে তুলেছে বিষাদময়। বিশ্বায়নের এই যুগে বিলীন হচ্ছে গ্রাম আর বাড়ছে শহর। জীবনের তাগিদে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরে। মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়াচ্ছে শহরের পরিধি। যান্ত্রিকতায় আটকে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনও। শহর যেমন জেগে থাকে নিশিদিন তেমনি শহরের মানুষও জেগে থাকে নিয়ন আলোর শহরে। অফুরন্ত কাজ আর

ব্যস্ততা এই নিয়েই শহরের জীবন। যে জীবনে সম্পর্কগুলোও ইট-পাথরের মতো জড় হয়ে গেছে। তবুও জীবনকে গতিময় করতে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে শহরে আসতে হয়, হতে হয় শহুরে। অনেক সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধা শহুরে জীবনকে যেন বিষিয়ে তুলে। এইসব নেতিবাচক দিকের প্রভাবে শহুরে মানুষের মনের আবেগ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ক্রমেই অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে। নিরাপত্তাহীনতা শহুরে জীবনের আরেক বিরূপ দিক। আমি নিজেও আমার শহরের মানুষের হাতে নির্যাতিত একজন নারী। কিন্তু আমার অভিযুগ, প্রতিবাদ, ঘৃণা এই শহরের এই পৃথিবীর বিরুদ্ধে না, বরং শতাব্দী ধরে গড়ে উঠা হাজার হাজার চিন্তার ফলে তৈরি হওয়া পাশবিক মানসিকতার বিরুদ্ধে। আমি স্বপ্ন দেখি এক শান্তির শহরের। আমার শহর আমার স্বপ্নকে ধারণ করে। এমনকি এই শহরের আনাচে কানাচে এমন অনেক নারী রয়েছে যারা চার দেয়ালের বন্ধ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে এই শহরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চায়। একরাতে বিপ্লব হয় না। এটি সেই শহর নয় যার স্বপ্ন আমি দেখি, আমরা দেখি। কিন্তু বিপ্লব এক মুহূর্তে হয় আমি চাই সেই বিপ্লবের শুরু আমাকে দিয়ে হোক আমি আমাকে দিয়ে গড়ে তুলবো আমার এবং আমাদের স্বপ্নের শহর।

Ummay Honey / **উম্মে হানি,** Dhaka, Bangladesh

I live in Dhaka city since 2013. When I first met with the city of Dhaka and the people, I was overwhelmed. But gradually when I went through deeper inside the context of this city, I think there is a purpose for every individual here. Their energy, enthusiasm, and hard work show me the inner meaning of life. The sincerity and hard work of a rickshaw puller sometimes amaze me to do my work properly. So I want to tell the story of people whose stories are untold and unseen. The diversity of life of people helps me to make this city my own home and for this reason, I am writing about my city and my home. And preferably the stories of women inspire me to write about their lifestyle. In my surroundings, I have seen a lot of women who do an extremely difficult job with smiling faces. Their sacrifices, joy and sorrow inspire me all the time.

মানুষের শহর

আমার শহর, আমার বাড়ি। আমার শব্দটির আধিক্য থাকলেও বলতে চাই আমাদের গল্প। একটা শহর, একটা বাড়ি কোনো কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না নারীদের ছাড়া। আমি বাংলাদেশের ২৫ বছর বয়সী একজন নারী, আমার শহর ঢাকা। এই শহরের আজন্ম বাসিন্দা না হলেও এই শহর ঘিরে আশা আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই আমার। প্রতিদিনের বাস্তবতায় জীবন অতিবাহিত হচ্ছে আমার আশেপাশের মানুষের কোলাহল আর হাসি-কান্নার সঙ্গী হয়ে। এখানকার অধিকাংশ মানুষ অন্য শহরতলী অথবা গ্রাম থেকে এসেছে একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের আশায়। তাই আমার মত ভাড়া বাড়িই তাদের আপন ঠিকানা। বছর বছর নতুন ঠিকানায় আমাদের আবাস বদলায় কিন্তু বদলায়না ভালো থাকার প্রচেষ্টা। ভাড়া বাড়ির এক চিলতে বারান্দা সারাদিনের পরিশ্রম শেষে মায়ের স্বস্তির জায়গা। জানলার ফাঁক গলে একটুখানি আকাশের দেখা পাওয়া অন্যরকম প্রশান্তি দেয়। ছাদে গেলে পাখিদের উড়াউড়ি ভুলিয়ে দেয় ক্লান্তি আর অবসাদ। শিশুদের কোলাহলে মুখরিত চারপাশ যেন আনন্দের বার্তা বয়ে নিয়ে

আসে সবার কাছে। এই শহরের একেকজন নারীর জীবন একেকরকম, কিন্তু এক অদ্ভূত সুতোয় গাঁথা। কারো একবেলার খাবার জোটাতে অনেকখানি ইচ্ছা বিসর্জন দিতে হয় পরিস্থিতির কারণে, গ্রহণ করতে হয় নিদারুন পরিশ্রমের কাজ। অন্যদিকে এটাও বাস্তব যে, অনেক নারীই পারিবারিকভাবে এসব সুবিধা–প্রাপ্ত – তাঁরা চেষ্টা করছেন ওই অসহায় নারী ও তাঁদের শিশুদের সাহায্য করতে। এই ব্যাপারটাই এই দুই দল নারীদের এক সুত্রে বেঁধেছে। আমি হয়ত এই দুই দলের কোনো সক্রিয় সদস্য নই, তবে আমিও আছি শহরের নিজস্ব অস্তিত্ব হয়ে; কারণ আমার শহরের প্রাণ হলো মানুষ। শহরের আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি মানুষ বাস করে এখানে। নারীদের সংখ্যা পুরুষের কাছাকাছি। সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় উৎসব গুলো নারীদের কাছ থেকেই পূর্ণতা পায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। একসাথে ঈদ, পূজা, বড়দিন আর বুদ্ধ-পূর্ণিমার মত অনুষ্ঠানে নারীদের সরব উপস্থিতিই যেন সামাজিক মেলবন্ধনের ইঙ্গিত দেয়। এই নারীরা হয়তো খুব সাধারণ একটি বাড়ির প্রতিনিধি কিন্তু তাদের আন্তরিকতা আর ভালোবাসায় উৎসব রঙিন হয়ে উঠে। তাঁরা জানেন কীভাবে প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতাকে সহজাত ভাবেই অতিক্রম করতে হয়। ঈদের মায়ের হাতের পায়েস আর মিষ্টির ভালোবাসা মাখা আর পূজা পার্বণের প্রদীপের আলোয় আলোকিত পুরো পরিবারের মানুষ গুলোই আমরা। আমার শহরের নারীদের প্রতিদিনের সহজ জীবনযাপন আমাকে শিখিয়েছে যতটুকু আছে ততটুকু দিয়েই জীবনকে পুরোপুরি উপভোগ করা যায় এবং সবার সাথে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া যায়। আমাদের শহরেই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী আমাদের প্রধানমন্ত্রী থাকেন এবং তিনিও একজন নারী। প্রতিনিয়ত দেশকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে নারীদেরকে শক্তি আর প্রেরণা যোগাচ্ছেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জায়গা থেকে এই শহরকে ভালোবাসছেন তাঁদের কাজের মাধ্যমে। রাস্তায় যে নারী তাঁর সন্তানের জন্য ভিক্ষা করছেন, তিনিও সন্তানকে সুনাগরিক করার ইচ্ছা পোষণ করেন। যাঁরা শিক্ষিকা, তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেম বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। যাঁরা ডাক্তার তাঁরা রোগীদের পরম মমতায় সেবা দিচ্ছেন। আইন পেশা, কর্পোরেট অফিস, গার্মেন্টস সেক্টরসহ প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেকে তুলে ধরছেন। যাঁরা বাসায় থাকছেন সেই নারীরাও থাকার পরিবেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করছেন

নিয়মিত। আমার বাসার ছোট্ট ব্যালকনির কিছু ফুলগাছ যেমন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ভালোবাসায় বেড়ে উঠছে তেমনি মানুষের ভালোবাসায় এই শহর নতুন করে আলোকিত হচ্ছে প্রতিদিন। সন্ধ্যার রাস্তায় জ্বলতে থাকা নিয়ন বাতি গুলোর মত হাজারো স্বপ্ন শহরের নারীদের মনে থাকে। কিছু পূরণ হয়, কিছু হয়না কিন্তু স্বপ্ন দেখা থেমে নেই। আমার শহরের মানুষের সরলতা জীবনের অন্যসব জটিলতা ভুলতে সাহায্য করে। সময়ের সাথে অনেক কিছু বদলাচ্ছে কিন্তু যেটা বদলাচ্ছেনা সেটা হলো মানুষের প্রাণশক্তি। ঢাকা শহরের বাতাসে ধূলিকণা ওড়ে, এছাড়াও অনেক ক্ষতিকর পদার্থ ভেসে বেড়ায়; কিন্তু এই পরিবেশের মাঝেও কীভাবে সুন্দর ভাবে বাঁচা যায় সেই পদ্ধতি যেন নারীদের থেকে ভালো আর কেউ জানেন না। তাইতো শহরের মানুষগুলো ভালোমন্দ সময় পার করে আবারো নতুন ভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা পায়। পুরনো ঢাকার ঘুপচি গলিপথ, রিকশা, মানুষের কোলাহল আর নতুন ঢাকার অত্যাধুনিক বিল্ডিং আর ঝলমলে আলোকচ্ছটা সব নিয়েই আমাদের এই প্রিয় শহর। এখানেই আমি স্বপ্ন দেখি, বিফল হই কিন্তু হাল ছেড়ে দিই না। আমার বয়সী নারীদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিনিয়ত এই শহরে। এবং এই সকল নারীরাই জেদ, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস দিয়েই টিকিয়ে রেখেছে শহরের কলকাঠি। এই শহরের নারীদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা তাঁদের জীবনের মতই খুবই সাধারণ। বেশিরভাগ নারীই তাদের সন্তান–সন্ততিদের নিয়েই ভাবেন। আমি আমার মাকে দেখি তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা যেন আমাদের ঘিরেই এবং এতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট আর আনন্দিত। একটি সীমিত আর ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যেই তাঁদের পরিকল্পনা গুলো বাঁধা থাকে। সীমিত আয়ের নারীদের সংখ্যাই বেশি এখানে। সেরকম ভাবে তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত হয়নি। কিন্তু সব পেশায়ই নারীরা সগৌরবে প্রতিনিধিত্ব করছেন। যে পেশাতেই থাকুন না কেন এই শহরের অধিকাংশ নারীরা তাঁদের মাতৃ পরিচয় নিয়ে খুবই গর্বিত। তাঁদের কাছে পরিবার এবং বাড়ি দুটোই খুব গুরুত্ব বহন করে। এমনকি যাঁদের নিশ্চিত আশ্রয় নেই তাঁরাও এই শহরের অস্থায়ী বাড়িটিকে আপন করে নেন পরম যত্নে। এজন্যই নারীদের সাথে এই শহর এবং বাড়ির নিবিড় যোগাযোগ। প্রত্যেকদিনের কাজ এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁরা তা জানান দিচ্ছেন। শহরের একপ্রান্তে রেলস্টেশনে অপেক্ষায় থাকা ভিন্ন ভিন্ন যাত্রীদের গন্তব্য

যেমন ভিন্ন এই শহরের নারীদের জীবনও তেমনি বৈচিত্র্যে পূর্ণ। রেললাইনের পাশে বস্তিতে শীতের রাতে একসাথে বসে আগুনের উষ্ণতা নেওয়া মানুষের কাছে জীবন মানে একটুখানি আরাম আর স্বস্তি। আর এই শহরের নারীরা প্রতিনিয়ত পরিবারের মানুষ গুলোকে সেই স্বস্তি আর ভালোবাসা দিয়ে যান। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর আন্তরিকতায় শিশুরা বেড়ে উঠছে আর এভাবেই পরবর্তী প্রজন্ম এগিয়ে যাচ্ছে।

Papia Talukder / পাপিয়া তালুকদার, Sylhet, Bangladesh

My write up talks about the horrific situation a lady, who was unfortunately raped. It is composed of society's treatment towards such loathsome work, and the discrimination that the lady faces in her lives. All of these inspired me to write about my city.

ডিগনিটি বাই স্যাক্রিফাইস

একটি স্বচ্ছ বোতল। বিপরীত ভাবে এফোঁড়, ওফোঁড় করে দুটি ছিদ্র করা হয়েছে। এটা দিয়ে চোখ পেতে আকাশ দেখতে ভালোই লাগছে। নীলাকাশ, মাঝেমধ্যে একটি চিল উড়ে যাচ্ছে। হয়তো অনেক চিল উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু নীলুর চোখে একটি চিলই পড়ছে। দুটি ডানা দিয়ে সাম্যাবস্থা বজায় রেখে ধী-ধী করে উড়েই যাচ্ছে। এই পাখিটি কি ইচ্ছেমতো বিভিন্ন জায়গায় উড়তে পছন্দ করে? হয়তো করে। আবার না'ও করতে পারে। নীলুর আবার পায়ের তলায় খড়ম অবস্থা। এক জায়গায় বসে থাকতে ভালো লাগে না।

আহা! মানুষের যদি ডানা থাকত। এমনটা হলে নীলু প্রতিদিন পুরো পৃথিবীটাকে ঘুরে দেখত। তবে কাদের ঘুরে দেখতো, তা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। হয়তো মেয়েদেরই দেখতো। হুম! রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় যে মেয়ে গুলো মাথা নিচু করে কেবল রাস্তার ধুলো দেখে হাঁটে, তাদের? নাকি, কফি শপের সামনে মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে, তাদের? বুঝতে পারছে না। নাকি, বিশ্ববিদ্যালয়ের আশেপাশে ছোট খাটো টিলার পাদদেশে বসে তাস খেলায় মগ্ন মেয়েগুলোকে? অনেকে আবার গাঁজা, ইয়াবার ঘ্রাণে মত্ত হয়ে থাকে। হয়তো তাদেরকেই। নাকি, সাদা চামড়ার ওই মেয়েটা, যে থিসিস করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে? শাড়ি, জামা পরা হলুদ চুলগুলোকে বিন্যস্ত করে বাঙালি সাজার ভান করা মেয়েটি? যে সংস্কৃতি মানতে গিয়ে পুরো শিখে ফেলেছে! থাক, এদের গল্প বাদ। একটু ভাবি অন্যদের নিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া পবন নামের মেয়েটার কী অবস্থা কে জানে। তার কাজই হলো ঘুরে ঘুরে অবাঞ্ছিত বিষয়বস্তু দেখা। কোথায় কোথায় ঘোরে বলা মুশকিল। আসলে যায় কোথায়? মজার কথা হলো, যায় না কোথায়! সিনেমা হল, হাট-বাজার, ব্যস্ত রাস্তা, সেই

ক্লিনিক যেখানে হাজার হাজার অসুস্থ মানুষের আনাগোনা। কে কাকে দেখছে কোন ইয়ত্তা নেই। প্রতিটি মানুষ নিজেদের সুস্থতার অপেক্ষায় অধীর। কেন জানি মনে হয়, এখানেই এক গভীর সত্য কাজ করে। একাত্মবাদের এক বিশাল সমাহার এখানে। মেয়েটি ক্লিনিকের সব বুয়াদের চেনে। তারাও ওকে চেনে। এদের দেখলে 'বিল্ডাংগ্রোম্যান' এর ক্যারেক্টরগুলার কথা মনে পড়ে। জাস্ট ফর লিভ, মোরালিটির সাথে যুদ্ধ। কোন বুয়া কার হয়ে কাজ করে সব জানে সে। তাকিয়ে থাকে প্রস্রাব টেস্ট করার জন্য টিউব হাতে দাঁড়িয়ে থাকা নারীদের দিকে। আবার মাঝে মাঝে ঘুরে আসে ব্লিচিং ফেলা পাবলিক টয়লেটগুলোতে। একফোঁটা লাল ভালবাসার চিহ্ন দেখতে চায়। বা ভুল করে কেউ মাশুল শুধতে গিয়ে বড় কোনো অংশ বিনে ফেলে গেল কি না! তার কেবল একটা অসম্পৃক্ত অবয়ব চোখে ভাসছে। হয়তো ছড়িয়ে থাকা কিছু পেজো তুলো ছিল। সেটাতে একটা অস্তিত্ব মুড়ে বিনে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর এক মেয়ে শূন্যে ঝোলা রশিতে ধরে এক নিবৃত কান্না দিয়েছিল। পাশে তার বিক্রি হয়ে যাওয়া সোনার লভ্যাংশ দানকারী এক আত্মগোপনকারী নারী বসে বসে সব দেখছে। কিন্তু সকালের আকাশ-মামার রশ্মি দুজনেই দেখেছে। এ এক নতুন জীবনাধ্যায়।

মাইকে ডেকে সবাইকে ক্লিনিক ছাড়ার জন্য বলা হয়েছে। একে একে সব গুলো বাতি নিভে গেল। সিঁড়িগুলোও অন্ধকারে ডুবে গেল। ক্লিনিকের এধারে ওধারে ফুটপাতে একটা রহস্যময় ঘোর অন্ধকার নেমে এসেছে। বয়সের শ্রেণিভেদ ভুলে সবাই স্থান দখল করে নিচ্ছে। ক্লিনিকের ওধারেই মেয়েটির বাসা। হেঁটে রাস্তা পেরিয়ে নিজের বাসার দিকে চলে যাচ্ছে।

একটা সরু গলির মুখেই বাড়িটা। দেখতে পরিত্যক্ত। শ্যাওলা ধরা বিল্ডিং-এ টিনে জং ধরা চাল। ইংরেজ আমলের ইস্পাতে বানানো ভারি একটা দরজা। অনেকের ধারণা এখানে এক ইংরেজ অফিসার থাকতেন। অগণিত মেয়ের সম্ভ্রম লুন্ঠিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এখন এখানে কয়েকটি মেয়ে থাকে। কেউ বিশ্ববিদ্যালয় আর কেউ কলেজে পড়ে। এখানে যে যার মতো স্বতন্ত্র প্রার্থী। 'না' বলে কোনো বিরোধিতা আসে না, বরং পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়। যাই হোক, মেয়েটি রাস্তায় কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে। অন্ধকার থেকে এক স্বর ভেসে এলো - ও নিশি দি! ওপাশে কিন্তু অনেকে দাঁড়িয়ে আছে। এদিক দিয়ে যান, নাহলে আপনার সম্ভ্রম নিয়েও খেলবে মানুষরূপী পশুগুলো।

ওদের শরীরের দূষিত শুক্রাণুগুলো আপনার শরীরের অংশ হবে।

নিশি দিঃ টুম্পা!

টুম্পাঃ হ্যাঁ দিদি। আপনি এ পথে কেন? এটা অভিশপ্ত। তাড়াতাড়ি অন্য পথে যান।

নিশির মাথায় ধাক্কা এলো। টুম্পা! কিন্তু কীভাবে। সে তো কবেই! না, এটা মনে করতে চাই না। ঠিক তখনই নিশির চোখ খুলে গেল। কক্ষটি অন্ধকার। পাশেই টুম্পার বেডটি পরে আছে। একপাশে মাধু শুয়ে আছে। তার মানে এটা দুঃস্বপ্ন। খানিক পরেই ফজরের আযান শোনা গেল। নিশি, মাধু কে জাগিয়ে তুললো। আজ তাদের সাক্ষ্য দেবার দিন। টুম্পা কলেজ ছাত্রী ছিল। বয়সের তুলনায় সুন্দরী, স্ফীত বুক, সুডৌল বাহু। এক কথায়, বাহ! তরুণী মেয়ের রূপ আর মায়া সব কিছুকে ছাড়িয়ে যায়। এক মধ্যবয়স্ক ড্রাইভার তার পিছু নিয়েছে। সব সময় তাকে বিরক্ত করে।

ড্রাইভারঃ ওগো মেয়ে! দেবো নাকি চুমু।

বুকে, পিঠে আর নিচে। গায়ে কি ফুলের গন্ধ? গোলাপ নাকি রজনীগন্ধা! তারপর জিভ বাঁকিয়ে ইঙ্গিত। মাঝেমধ্যে বুকে থাবা দিয়ে পালায়। তারপর এক সন্ধ্যায় ঘটে করুণ এক ঘটনা। কয়েকজন লোক তাদের লালসাকে তৃপ্তি দিয়েছে। টুম্পার সম্ভ্রম কেড়ে নেওয়ার নৃশংস ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমে ছেড়ে দেয়। রাজনৈতিক ব্যক্তি আর আম-জনতা দুইই নীরব। আন্দোলন করতে বেরিয়ে পড়ে শিক্ষার্থীরা। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও তে দেখা যাচ্ছে পশুগুলো কীভাবে মেয়েটিকে অত্যাচার করছে। অত্যাচারীদের মেয়েটি বাবাও ডেকেছে, পিপাসায় পানিও চেয়েছে। কিন্তু মৃত্যু ছাড়া কেউ ওর ডাক শুনে নি। তারপর শিক্ষার্থীরা প্ল্যাকার্ড নিয়ে কালো রং-এ মুখ ঢেকে মশাল হাতে প্রতিবাদ করেছে। '৭১ এর পাক-সেনা নয়, কিছু জারজই এদেশে মেয়েদের ভোগ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। বাদ যাচ্ছে না কেউই। অসংখ্য শিশুদের যোনি কেটে বড়ো করে অত্যাচার করেছে। বৃদ্ধাও বাদ যায় না। আর যুবতীরা তো বলির পাঁঠা। অসংখ্য যোনি অপবিত্র হয়েছে, এর বিনিময়ে পশুগুলোর মৃত্যুর আইন জারি করতে পেরেছে এই অবহেলিত বীরাঙ্গনারা। যে সম্মান কেড়ে নেবে, তার ঘাড় থেকে মাথা নেওয়া হবে। সেলাম সে নারীদের, যারা ২০২০ তে এসে সতীত্ব হারিয়ে

সোনার বাংলায় ৯(১) ধারায় জোর করে বলাৎকারীদের মৃত্যুর আইন বানিয়েছেন। এই আইন সতীত্ব রক্ষার আইন।

সবার কথা চিন্তা করে নীলুর মাথা ভারি হয়ে গেল। আকাশের চিলটার মাথাও ভারি হয়ে গেল। ডানা দিয়ে কেবল ঝাপটে যাচ্ছে। হয়তো সেও নীলুর মতো, কিছু মেয়ে নিয়ে ভাবছে। কিন্তু পাখিটি কি নীলুকে নিয়ে ভাবে! তার গায়ে যে দাঁত আর নখের দাগ তা কি পাখিটি দেখে! হয়তো না। এত উপর থেকে এ সামান্য ক্ষত চোখে পড়ার মত নয়। হ্যাঁ, হয়তো নয়। তবে এটা সত্যি, যখন থেকে নীলু বোতল দিয়ে আকাশ দেখা শুরু করেছে, তখন থেকেই চিলটা উড়তে শুরু করেছে। এই চিলটা বন্ধু না শত্রু, বুঝতে পারেনা। নীলাকাশে ঝাপসা সোনালি রঙ এসেছে। এসবই দেখে নীলু। এদিকে নীলুর মা ফল আর ভারি খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নীলুর এখন শক্তির প্রয়োজন। নীলুও অনেক ধকল সয়েছে। অনেক গুলো দাঁত তার শরীরটাকে ফালি ফালি করে দিয়েছিল। তার দাগ এখনো শুকায়নি। সপ্তাহখানেক পরে সেও ব্লিচিং ফেলা টয়লেটে একদলা রক্ত ফেলে এসেছিল। নীলুর চোখের নিচে কালো দাগ আরও বেড়ে গেছে। তাহলে টুম্পারও এমন হয়েছিল। হঠাৎ করে সবার মুখ ভুলে গেছে নীলু। মনে পড়ে না এরা কারা। অদৃশ্য ছায়ার মতো মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সাথে চিলটার পাখা ঝাপটানোর শব্দ। সব কিছু মিলিয়ে নীলুর তন্দ্রা এসে গেল। গাঢ়, গভীর তন্দ্রা। এই তন্দ্রায় সব কিছু নিরাকার। কেবল কিছু কান্না আর চিলটার করুণ সুর ভেসে যাচ্ছে।

Sushipta Das / সুশিপ্তা দাশ, Moulvibazar, Bangladesh

Our Liberation war in 1971 inspired me a lot.

একটি বিস্ফোরণ ও কিছু স্বপ্নের মৃত্যু

কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল একদল সাহসী যোদ্ধার স্বাধীন দেশে নতুনভাবে বাঁচার সোনালী স্বপ্নটুকু।

দাউ দাউ করে পুড়ছে সব। মাথা গোঁজার আশ্রয়, রক্ত জল করা ক্ষেতের ফসল, গ্রামের শেষ মাথায় সুনিবিড় ছায়াতলে গড়ে ওঠা একমাত্র গ্রামীণ হাট, সবকিছুই পুড়ছে। পরাধীনতার শিকলে বাঁধা জীবন বয়ে বেড়ানো আর সম্ভব নয়। মুক্তি চাই! তাইতো সকলের সাথে দেশ রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হলো পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক মতি।

আজ সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা। সাথে নলিনের মুখেও বেদনার স্পষ্ট ছাপ। মনে পড়ছে সহধর্মিণীর সেই মায়া ভরা চাহনি। শেষবার যখন কৃষ্ণাকে দেখেছিল নলিন, সেই মায়াভরা চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। মুখটা আকাশের মতই মেঘাচ্ছন্ন। সেই দৃষ্টি নলিনের সারা শরীর জুড়ে যেন এক ঝড় তুলে দিল। তার মনে হলো কৃষ্ণাকে দু'বাহুতে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে রাখে, পালিয়ে যায় দূরে কোথাও। যেখানে গেলে নাগাল পাবেনা এই বর্বরতা, কেউ ছিনিয়ে নেবে না বাঁচার সম্বলটুকু, ভালোবাসার আলিঙ্গনে জড়ানো মানুষ দুটোকে আলাদা করবেনা কোনো নরপিশাচের দল। আকাশ হেসে উঠবে প্রেমের নীলাভ রঙে, বাতাসে ভাসবে প্রেমের মিষ্টি সুবাস। এমন জীবন কখনও আসবে কি? নাহ্ বিদায় নিতেই হলো নলিনকে। প্রেয়সীর উষ্ণ আলিঙ্গন, ভালোবাসামাখা টলটলে চোখ দুটো উপেক্ষা করে এগিয়ে গেল নলিন। চোখের সামনে ঝাপসা হতে লাগলো কৃষ্ণা। আবার হবে তো দেখা??

আজ মতির চোখে ঘুম নেই। নিদ্রাহীন চোখ দুটো রক্তবর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে চোখের সামনে প্রিয় সহযোদ্ধা নলিনকে চিরতরে শেষ হতে দেখে বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেছে তার। শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে ঝাঁঝড়া হয়ে যায় নলিনের বুক, গগনবিহারী

আর্তচিৎকারে মুহূর্তেই যেন চারপাশটা কেঁপে ওঠে। এ যেন গুলির চেয়েও আরো ভয়ংকর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিভে গেল নলিনের জীবনপ্রদীপ। একটু আগেই বীরদর্পে বুক চিতিয়ে শত্রুর প্রাণনাশে ব্যস্ত নলিন হুট করেই কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। চোখ দুটো তাকিয়ে আছে মতির দিকে। ইশ কী বিভৎস লাগছে, কী অদ্ভুত মৃত্যু। পাহাড়ি ঝরনার মত কুলকুল শব্দে রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে নলিনের শরীর জুড়ে। মতির মনে হলো তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তের ছোপ। সেও হয়ত মারা যাবে এখন। মাথা ঘুরছে মতির। একেই কি মৃত্যু বলে? নাহ্ মতি দিব্যি বেঁচে আছে। মৃত্যু স্পর্শ করেনি তাকে। শুধু শেষনিঃশ্বাস অব্দি নলিনের তেজোদ্দীপ্ত চোখ দুটো ভাসছে। ভয়হীন চোখদুটো যেন বলছে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই লড়াই। আচ্ছা তার কি মনে পড়ছিল কৃষ্ণা বৌদির কথা? নাকি মুক্তির এই সংগ্রাম তাকে করে তুলেছিল হিংস্র পুরুষ, যার হৃদয়ে ভালোবাসা নেই শুধুই মুক্তির নেশা। নাহ্ আর ভাববেনা মতি। এমনই কত শত নলিন প্রান হারাচ্ছে রোজ। বুক চিতিয়ে দাড়াচ্ছে শত্রুর বুলেটের সামনে। রক্তে রক্তে ভিজে উঠছে চিরসবুজ মাটি। নাহ্, চিরসবুজ বলা ভুল। এ মাটিতে এখন শুধু রক্তের দাগ। মাটিতে মিশে আছে টকটকে লাল রক্ত। মেটে রঙের সাথে পচে যাওয়া সবুজ আর টকটকে রক্ত মিলে এক নতুন রঙের সৃষ্টি হয়েছে। সাথে গুমোট গন্ধ। নিশ্বাস ভারি হয়ে আসে।

মতি পকেট থেকে শেফালির চিঠিটা বের করে গন্ধ নেয়। রক্তপচা মাটির মত গুমোট গন্ধ নয়, মিষ্টি মেয়েলি গন্ধ। ভালোবাসার কামনা মিশ্রিত মিষ্টি সুবাস। বুক ভরে ওঠে মতির। গোটা গোটা অক্ষরে ভালোবাসার এক রচনা। "অপেক্ষায় থাকব তোমার। আসবে তো তুমি?"

শেফালির লেখার ভাষা আরো দুর্বল করে দেয় মতিকে। তার কি ফেরা হবে কখনও শেফালির কাছে? এই যুদ্ধ শেষ হবে কখনও?

ধ্বংসের শেষ হয় একদিন। মুক্তির নেশায় পাগল দামাল ছেলেদের বহুমুখী লড়াই, ভারত থেকে মুক্তিবাহিনীর ক্রমশ ক্যাম্প অভিমুখে আসার খবরে ভীত হয়ে পড়ে পাকবাহিনী। অবস্থা বেগতিক দেখে ৮ ডিসেম্বর ভোরেই মনু ব্রিজসহ বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করে পালিয়ে যায়। মুক্ত হয় মৌলভীবাজার শহর। ওড়ে মুক্তির পতাকা। ১৬ই

ডিসেম্বর চিরতরে গোলামি জীবনের অবসান ঘটিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। পূর্ন হয় মতি নলিনদের যত্নে বোনা স্বাধীনতার স্বপ্ন। মতি বেঁচে আছে দিব্যি। কিন্তু শেফালী কেমন আছে? আজও মতির অপেক্ষায় আছে তো? যুদ্ধের এই কটা মাসে তো একবারও খোঁজ নেওয়া হয়নি। ভালো আছে তো? নাহ্, আর তর সইছে না। লজ্জাবনত গোলাপের পাপড়ির মত শুভ্র মুখখানা যেন টানছে মতিকে।

২০ ডিসেম্বর। স্বাধীন দেশ। বাড়ি ফিরবে ওরা। অপেক্ষারত পরিবারের কাছে। আর কেউ জ্বালাবে না বাসস্থান, কেড়ে নেবে না অন্ন, পোড়াবে না স্বপ্ন। ধ্বংসস্তুপ থেকে হেসে ওঠে প্রাণের প্রিয় জন্মভূমি মা। বাড়ি ফেরার আগে সকলে জড়ো হলো স্কুল ঘরে।

বিদায়বেলা। পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া গোলা বারুদ গ্রেনেড সহ জীবননাশী সরঞ্জাম লোকালয় থেকে কুড়িয়ে স্কুল কক্ষে জমা করা হচ্ছে। যানবাহনে চড়ে আসছে নানান অস্ত্র। লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নেয়া এই অস্ত্রগুলো দেখে বড্ড হাসি পায় মতির। একটা অস্ত্র যদি দেখাতে পারত শেফালীকে। শেফালী। ভালোবাসা-মাখা এক নাম।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকট শব্দে ধুম। কেঁপে উঠলো স্কুল প্রাঙ্গন। শহর জুড়ে তীব্র ভয়। এখন আবার কিসের অশনি সংকেত। বিস্ফোরণ। স্বাধীন দেশের লড়াকু একদল সৈনিক তাদের স্বাধীন করা দেশেই প্রাণ হারালো। হারিয়ে গেল শেফালী মতির অসমাপ্ত প্রেম গাথা। পাকবাহিনীর ফেলে যাওয়া গোলাবারুদ থেকেই ভয়ংকর মাইন বিস্ফোরণ। স্বাধীন দেশে বিস্ফোরিত হলো একমুঠো সোনালী স্বপ্ন।

(১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও মৌলভীবাজার জেলায় ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক মাইন বিস্ফোরণের ঘটনা অবলম্বনে রচিত এক কল্পিত কাহিনী)

Bandhana Sinha / **বন্দনা সিনহা,** Moulvibazar, Bangladesh

Village Women life

অভিশপ্ত জীবন

ঘরের কাজ শেষ করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল। কলেজের অ্যাসাইনমেন্টও শেষ হয়নি। মায়ের মৃত্যুর পর যেন জীবনটা বদলে গেল। সারাদিন ঘরের কাজ, কাজ শেষে পড়তে হয়। কোনো কোনো দিন নতুন মায়ের পায়ে মালিশ করতে করতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। আর কপালে জোটে লাথ।

বাবা থেকেও নেই, আমাকে অপয়া বলে গালি দেয় বাবা। কিন্তু বাবা, আমার দোষ কোথায় বলতে পারবে তুমি? মায়ের মৃত্যুর জন্য তুমি আমায় দোষারোপ করে আসছো এত বছর ধরে, কিন্তু আমি তো মাকে মারিনি। তবে আমি দোষী কী করে হলাম? সেদিন কী হয়েছিল কখনো জানতে চাওনি তুমি। আমি কি সত্যি তোমার মেয়ে?

আমি প্রত্যাশা। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। মা নেই, বাবা আছে। তবে বাবা থেকেও নেই আমার। আমার বয়স যখন ৭ বছর তখন আমার মা মারা যায়। বাবা আর বাকি পরিবারের সবাই আমাকে মায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করেন। সত্যি বলতে আমি জানি না, কেন। সেদিন বৃষ্টির দিন ছিল। স্কুল থেকে ফিরে বাসায় ঢুকবো, দেখি মা ছাদের রেলিঙের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো কিছু খুঁজছে বা বৃষ্টিতে ভিজছে। আমার মা বৃষ্টিতে ভিজতে খুব ভালোবাসে। তাই আমিও ব্যাগ রেখে ছাদে গেলাম মায়ের কাছে। বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে, তাই দৌড় লাগালাম। ছাদে গিয়ে মাকে দৌড়ে জড়িয়ে ধরতে যাবো ততক্ষণে মা নিচে পড়ে গেলেন।

আর আমিও দৌড়ে গিয়ে নিচের দিকে তাকালাম। মায়ের শরীর পড়ে আছে মাটিতে, চারদিকে রক্তের বন্যা। বৃষ্টির পানিতে রক্ত ধুয়ে যাচ্ছে। বাবা গেটে সিএনজি থেকে চিৎকার করলেন। মাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো কিন্তু ততক্ষণে মা আর এ পৃথিবীতে নেই।এত সময় কারো ধ্যান আমার দিকে যায়নি। আমি চুপচাপ দাদুর কোলে বসে আছি। কী হচ্ছে এসব? মা কি তাহলে মরে গেল? হঠাৎ বাবা এসে আমাকে থাপ্পড় দিয়ে বললেন মায়ের মৃত্যুর জন্য

তুমি দায়ী। সবাই বাবাকে আটকানোর চেষ্টা করছে আর বাবা সবাইকে ছাড়িয়ে আমাকে মেরেই যাচ্ছে। বাবা মার বিয়ে ভালোবেসে হয়েছিল। তারা একে অপরকে অনেক ভালোবাসে। কিন্তু আমি! আমিও তো মাকে ভালোবাসি।

মায়ের মৃতদেহ বাড়িতে আনা হলো দাহ-সংস্কার এর জন্য। আমি মাকে শেষ বারের মতো দেখতে চেয়েছি বলে বাবা সবার সামনে আমাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিলেন। সেদিন বাবাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়েছিল "ও বাবা, মাকে তুমি ভালোবাসো তবে কি আমি বাসি না? আমি আমার মাকে কেন মারবো?" কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি আমার। আজও সাহস নেই কিছু বলার। বছর দুয়েক পর সবার জোড়াজুড়িতে বাবা নতুন মা আনলেন। নতুন মা আমাকে অনেক মারে, সব কাজ করায়। বাবাকে বলতে চেয়েও পারি না। কারণ, যখন বলেছিলাম নতুন মা কেঁদে বাবাকে বলেছিল, আমি নাকি ওঁর সাথে গালিগালাজ করে কথা বলেছি। সেদিন বাবা আমাকে কোমরের বেল্ট খুলে অনেক মারেন। সারারাত ব্যথায় ঘুমাতে পারিনি, জ্বর এসেছিল। কিন্তু বাবা একবারও জিজ্ঞেস করেনি আমায়। অথচ যদি মা তুমি থাকতে তাহলে সারারাত না ঘুমিয়ে মাথায় রুমাল দিয়ে দিতে পানিতে ভিজিয়ে।

মা, আজ আমার জন্মদিন। আজ আমি ১৮ বছরের হলাম। কিন্তু দেখো মা আমার পাশে কেউ নেই। কেউ না মা, তুমিও না আর বাবাও না। মাগো, সেদিন তুমি কেন এমন করে চলে গেলে মা? তুমি রাতে গল্প শুনিয়ে বলতে মৃত্যুর পর নাকি সবাই আকাশের তারা হয়ে যায়। মা, তুমিও কি এই আকাশের তারা হয়ে আছো? আমাকে দেখতে পাচ্ছো তুমি মা? মা একবার ফিরে এসে দেখো তোমার পুতুল আর পুতুল নেই মা। নাম তো ঠিক প্রত্যাশা রেখেছো মা, কিন্তু জীবনে আশা রাখার মতো কিছুই যে নেই।

মা, সেদিন তো তুমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলে, তাই না? আমি তো তোমাকো ধাক্কা দিইনি মা। তবু বাবা বলে আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়েছি। কেন মা? ফিরে এসো মা, নাহলে আমাকেই তোমার কাছে ডেকে নাও। সেদিন রেলিঙে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি দৌড়ে আসছিলাম মা, কিন্তু তুমি আমি আসার আগে পড়ে গেলে। মা, তুমি রেলিঙের উপর দাঁড়িয়ে ছিলে সেটা কেউ দেখেনি আমি ছাড়া। কাউকে বলতেও পারিনি মা আমি। কেউ আমার কথা শোনে না। তুমি চলে যাবার পর সবাই আমাকে ঘৃণা করে মা। জানো মা, ঘরে কোনো কিছু ভাঙলে এখন আমাকে দোষী বলে। বলে নাকি সব আমার জন্য হয়েছে।

আচ্ছা মা, তুমি কেন রেলিঙে দাঁড়িয়েছিলে? উত্তরটা সবার অজানা রয়ে যাবে কি? জানো মা, তুমি আর আমি গ্রামের যে খোলা মাঠে গান গাইতাম সেখানে অনেক দিন যাওয়া হয় না। আমি গেলে সবাই আমাকে অনেক খারাপ কথা বলে। আমার ভালো লাগে না মা। রাতের আকাশের চাঁদের মতো আমার জীবন একাকিত্বে ভরা মা। অভিশপ্ত হয়ে গেছে জীবনটা। তুমি ছাড়া আমি অভিশপ্ত, মা। আমার জীবন অভিশপ্ত।

বৃষ্টির দিনে শত বাধা পেরিয়ে তোমাকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটেছিলাম আমরা সবাই। বাবা তো উন্মাদ ছিল। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে জানতে পারি বৃষ্টির জন্য অধিকাংশ ডাক্তার হাসপাতালে উপস্থিত নেই। তৎকালীন চিকিৎসা না পেয়ে তুমি শেষ নিঃশ্বাস ফেলো।

মা তুমি দেখে নিও তোমার প্রত্যাশা, তোমার পুতুল তোমার দেখা স্বপ্ন অবশ্য পূরণ করবে। ইন্টার পাশ করে আমি মেডিক্যালে ভর্তি হবো মা। ডাক্তার হয়ে দেখাবো মা আমি। আমি ডাক্তার হয়ে এখানেই থাকবো মা, কোথাও যাবো না। টাকার জন্য নয়, গরীবদের সেবার জন্য ডাক্তার হয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করবো। যাতে করে আর কোনো নতুন প্রত্যাশা জন্ম না নেয়। আমাকে ডাক্তারের অ্যাপ্রনে দেখলে তুমি নিশ্চয় অনেক খুশি হবে, তাই না মা? সেদিন কি তুমি নামক তারাটা সবচেয়ে বেশি আলোকিত হবে? এমনটা হলে আমি বুঝে যাবো তুমি অনেক খুশি হয়েছো মা।

তোমার কথা অনেক মনে পরে মা। তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে ইচ্ছে করে মা। তুমি কি একটি বারের জন্য ফিরবে মা? শুধু একটি বার মা...............

Gita Das / **গীতা দাস,** Dhaka, Bangladesh

আমার শহর আমার বাড়ি শব্দগুলো পড়ে আমার মনে হলো 'আমার' শব্দটি কি আসলে আমার! ব্যক্তি নারী হিসেবে আমি, আমার, আমারই , আমারও শব্দগুলো নিয়ে ভাবনা থেকেই এ কবিতা।

আমার শব্দটি আমার নয়

শৈশবে প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের নাম ছিল আমার বই
ওই বইটি আক্ষরিক অর্থেই আমার বই ছিল।
বিনামূল্যে পাওয়া।
তবে এর ভিতরের সব কথা আমার কথা ছিল না।
আমার ভাইয়ের মনের কথা ছিল।
ছিল ছেলেরা বল খেলে। আমার জন্য ছিল পুতুল খেলা।
এটা পড়ার পর আমার বইটি আর আমার মনে হয়নি।

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি --- জাতীয় সঙ্গীত গাই
যেখানেই শুনি শ্রদ্ধায় ভাস্কর্য হয়ে যাই।
কিন্তু আমার দেশ দূরে থাকুক, দেশটা যে আমারও তাই কিছু ধর্মান্ধ স্বীকার করে না।
শহরটা যে আমারও তা নগর পরিকল্পনাবিদদের মগজে কাজ করে না।

আমার এবং অথবা আমারই বাড়ি। দূর-দূরান্ত।
আমারও বাড়িই তো কখনো নয়।
দেশ আমারও বলা গেলেও
বাড়ির বেলায় আমার কখনো নয়।
এদিক থেকে পরিবারের চেয়ে রাষ্ট্র উদার।

তাই আমার এবং আমারই শব্দদ্বয় নিয়ে আমি বড়ো নিঃস্ব, ত্যক্ত ও বিব্রত।

এ শব্দদুটোকে নিজের করতে কত আন্দোলন করছি অসভ্য যুগ থেকে।

এখনো কি সভ্যতার সিঁড়িতে পা দিতে পেরেছি?

যতদিন পর্যন্ত আমার এবং আমারই শব্দদ্বয় আমার নিজস্ব হবে না

ততদিন সভ্যতার সিঁড়ি অদৃশ্যমানই থাকবে।

Gita Das / গীতা দাস, Dhaka, Bangladesh

আমার শহর আমার বাড়ি মানে ভৌগোলিক অবয়ব, বিভিন্ন অবকাঠামো , সম্পর্ক, যাপিত সময়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বলয়, এবং ভাষাও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে আমি মনে করি। আমি, আমার শহর, আমার বাড়ির সাথে আমার শৈশবে উচ্চারিত ভাষা ও শব্দগুচ্ছের অভাবও অনুভব করি, যা আমায় এ লেখা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমার শহরের ভাষা

আমি ষাট বছর বয়সী এক নারী। মধ্য-বয়স অতিক্রান্ত। এ বয়সের চেতনায় মহাকালে বিলীন হওয়ার ভয়, অদৃশ্য শক্তির প্রতি নমিত ভাব থাকার কথা। অলৌকিক শক্তির প্রতি একাত্মতার জন্য আকুলতা ব্যাকুলতা বাড়ার কথা।

কিন্তু আমার চিন্তা চেতনায় আলোড়ন তোলে আমার শৈশব ও কৈশোরের বিহ্বলতায় ভরপুর আমার এলাকা, আমার ছোট্ট মফস্বল শহর, আমার শহরের পাশের নদীটি, পথঘাট, কিছু মানুষ, কিছু সম্পর্ক, মফস্বলীয় বিকেল, দুপুর ও সন্ধ্যা। যাপিত সময়ের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বলয়।

আমার শহরের লোকের ভাষা। উচ্চারণ।

চাকরিসূত্রে ও বৈবাহিকসূত্রে আমি শহরান্তরিত হয়েছি। কিন্তু আমার নরসিংদীর ভাষা আমাকে আপ্লুত করে। আমাকে টেনে নিয়ে যায় অর্ধ-শতক বছর আগের রিকসার টুংটাং মাখা এক শহরে।

অনেক শব্দ আমার মননে গেঁথে আছে। এসব শব্দগুচ্ছ যেন আমার শৈশব ও কৈশোরকালীন যাপিত জীবনের প্রিয় কবিতা। আমার মগ্ন চৈতন্য শিস দেয়। আমাকে বিমোহিত করে। বিভোর করে। বিহ্বল করে।

এখন এসব শব্দ বললে এর অর্থ বলতে হয়। ব্যাখ্যা দিতে হয়। শব্দ প্রয়োগের কারণ বলতে হয়। আমার স্বতঃস্ফূর্ততায় বাধা পড়ে। সেন্সর নামক বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণে আমি আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। এ সেন্সর আমার মফস্বল শহরের পরিচয়ে পরিচিত হবার আশঙ্কায় নয়। এত আমার অহংকার যে আমার এলাকার নিজস্ব শব্দ ভান্ডার আছে। মাতৃভাষার শব্দ ভান্ডারের মধ্যে - নিজস্ব কিছু সম্পদ। আঞ্চলিকতার প্রলেপ লাগিয়ে একে সংজ্ঞায়িত করার পক্ষে আমি নই। সোঁদাগন্ধ জড়ানো শব্দগুচ্ছ আমার। কিন্তু এ

সেন্সর হলো অন্যকে বুঝিয়ে বলার জন্য নিজের আবেগের ছাড়।

নরসিংদীর কিছু স্পেশাল শব্দ আছে। মনে হচ্ছে বিশেষ শব্দটি বললে স্পেশালিটি কম মনে হবে। যেমন, ওঙ্গা তেঙ্গা আমার নরসিংদী এলাকার একটি শব্দ। শরীরটা ওঙ্গা তেঙ্গা লাগছে। তাল পাচ্ছি না। মানে শরীরটার আরামবোধ হচ্ছে না।

অফিসে কখনো খারাপ লাগলে স্বতঃস্ফূর্ত এ শব্দ বলার উপায় নেই। প্রথমত কেউ বুঝবে না এবং এ শব্দ যারা বুঝবে না এটা তাদের সমস্যা নয়। সমস্যা আমি বোঝাতে পারছি না এবং শুদ্ধ বাংলা বলতে পারছি না। প্রমিত বাংলা বলছি না। এর চেয়ে ইংরেজিতে একটা কঠিন শব্দ বলে শারিরীক অবস্থা বুঝালে আমার কৃতিত্ব বেশি। যদিও সবাই বাংলা ভাষাভাষি। কিন্তু প্রমিত বাক্যে আঞ্চলিক শব্দ বসিয়ে কথা বলার মজাই তো আলাদা। অথবা ইংরেজি বাক্যে আঞ্চলিক শব্দ। I am feeling Wonga Tenga.

ছোটবেলা রাতে হারিকেনের আলোয় পড়তে বসতাম। পড়তে পড়তে ঝিমুনি আসলে চিমনিতে কাগজের ঢাকনি দিতাম। জিজ্ঞেস করলে বলতাম আলো চোখে লাগে। বড়রা (একান্নবর্তী পরিবারে বড় হয়েছি বলে মা বাবা ছাড়াও কাকারা, ঠাকুমা, দাদু, ঠাকুমার বাল্য বিধবা বোন ওবোনের ছেলে আরেক কাকা মিলে আমাদের অনেক বড়রা ছিলেন) ঠিকই বুঝতেন যে আমি ঘুমে ঝিমাচ্ছি।

বলতেন, ওঙ্গাবি না। সারাদিন টই টই করে ঘুরে বেড়ায় আর সন্ধ্যাবেলা পড়তে বসলেই ওঙ্গায়। পই পই করে বলেও কথা শুনাতে পারি না।

ওঙ্গাবি না। মানে ঝিমুবি না।

ওঙ্গানোর এমন জীবন্ত চিত্রায়ন কি ঝিমানো শব্দে হয়!

আমার ঠাকুমা বলতেন ঢলক নামছে। মানে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। তোড়ে বৃষ্টি নামা। cats and dogs. এখানে আমার ঠাকুমার ব্যবহৃত ঢলক শব্দটি অতুলনীয়। এ ভাষা আমার ঘরের ভাষা। আমার পূর্ব প্রজন্মের ভাষা। আমার পিতামহীর ভাষা। আমার বড় হয়ে ওঠা পরিবেশের ভাষা। আমার শহরের ভাষা। যার অভাব আমি বোধ করি। ঢলক বললে আমার উত্তর প্রজন্ম বুঝে না। কাজেই আমার মন প্রাণ খুলে কথা বলা হয় না।

আরেকটি শব্দ – টিম্বিশ। না, আর কিছু খাওয়া যাবে না। আমি খেয়ে দেয়ে টিম্বিশ। এক শব্দে ভরা পেটের কী চমৎকার অবস্থা। ঠাকুরমা আরেকটা শব্দ ব্যবহার করতেন – খাইয়া দাইয়া শ্যাম হইয়া আছে।

বাচ্চাটা টাব্বুর করে জলে পড়ে গেল। টুপ করে জলে পড়ে যাওয়ার চেয়ে টাব্বুরটা বেশি অর্থবোধক আমার কাছে। পাকা আম টুপ করে জলে পড়তে পারে, কিন্তু শিশু টাব্বুর করে জলে পড়ে গেছে।

আমার শহরে একটা গালি আছে। বকা আছে। বাপজট্টা। বাপের মতো জট্টা। দুষ্ট। খারাপ। বদ। এ শব্দ চয়ন আমারে ছোট্ট মফস্বল শহরের। এ সব শব্দ আমার শহরের আদি বাসিন্দা প্রত্যেকে বুঝবে। বাংলাদেশের লৌকিক প্রায় সব গালি গালাজে নারীর সমাহার। যাকেই বকুক – বকাটি জলের মতো গড়িয়ে গড়িয়ে মা বোনদের উপরে গিয়ে স্থিত হয়। কিন্তু বাপজট্টা নারী বিবর্জিত। আমার বড়বেলায় এ বকাটি খুব প্রিয় প্রিয় লাগছে।

আমার শহরের এমনই অজস্র শব্দ আমি হারিয়ে ফেলেছি। বড় বেলায় – প্রৌঢ়ত্বে এসে এ সব শব্দ খুঁজি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকের বদৌলতে আমার শহরের অনেককে খুঁজে পেয়েছি। দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আমার পরিবেশের পরিজনদের সাথে অন লাইনে কথা বলি আমার শহরের ভাষায়।

কথোপকথনে বলি – নাড়া গোড়া করবি না। মানে ঢং করবি না।

কখনো শুনি – তোর তো ঢিলকি বেশি। মানে উচ্ছলিয়া উঠা শখ বেশি – শুধু শখ নয়।

শৈশবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মনে করিয়ে দিই – তুই তো দেংশালনি ছিলি। মানে কোনো কিছু পরোয়া না করা ।

আমাকে বলে – তুই তো এখন ঢাকালনি। মানে ঢাকায় থাকি।

এ আবেগ মাখা শব্দগুচ্ছ আমার পিতামহী বুঝতো। আমার মা কম কম বুঝতো। কারণ উনি আমার শহরে বড় হননি। আমার বোন বুঝে। আমার নারী বন্ধুরা বোঝে। কিন্তু আমার ভাই বা এলাকার পুরুষ বন্ধুরা প্রথম উচ্চারণে বোঝে না। তারা একান্ত কিছু বোঝে না। একান্ত কিছু বোঝাবুঝি মানেই নারী। নিজস্ব ভাষা মানেই নারীর কন্ঠ! তাই তো আমি আমার ঐকান্তিকতা –– নিজস্বতা খুঁজে ফিরি।

আমার শৈশব ও কৈশোরের শহরের বর্তমান মানুষেরাও আমার এ ভাষা – শব্দগুচ্ছ বোঝে না। আমার প্রিয়তম শহরের ভৌগোলিক অবয়ব, অবকাঠামো, ভাষা ও কথায় শব্দ ব্যবহার পালটে গেছে। আমার শৈশব স্মৃতির শহর এখন বিশ্বজনীন ভাবনায় আন্দোলিত।

আমি হারিয়ে ফেলেছি আমার আবেগ জাগানিয়া সামগ্রিক শহরটিকে।

Nargis Sultana Nadi / নার্গিস সুলতানা নদী, Dhaka, Bangladesh

আমি লেখার শুরুতেই মনে পাকাপোক্ত ভাবে স্থান দিয়েছি যে, 'আমার শহর-ই আমার বাড়ি' তাই নিজের বাড়ি মনে করেই নিজের শহর কে উপস্থাপন করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমি, তাই লিখতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই এই ভেবে আনমনা হয়ে গেছি বা বলা যায় দোদুল্যমনতায় ভুগেছি যেটা নিয়ে লিখছি সেটা আদৌ কি আমার শহর না মনের অজান্তেই আমার বাড়িতে রূপ নিয়েছে?

আমার শহর আমার বাড়ি

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে ''God made the Village, man made the town'' অর্থাৎ বিধাতা গ্রাম সৃষ্টি করেছে আর মানুষ তৈরি করেছে নগর বা শহর। মানুষ আদিম গুহার অন্ধকার থেকে সভ্যতার পথ পরিক্রমায় তৈরি করেছে অগণিত শহর। রাজ্য-শাসন, ব্যবসা, শিক্ষাকেন্দ্র এই সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত প্রাচীন শহুরে জনপদ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, চাকা এবং বিদ্যুতের আবিষ্কার পৃথিবীর মানচিত্রে নগর গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উৎসাহ যুগিয়েছে। রেললাইনের কল্যাণে এক হয়ে গেছে দূর-দূরান্তের বহু শহর। আধুনিকতা আর শিল্পের ছোঁয়ায় শহুরে জীবন পেয়েছে নান্দনিকতা।

সাধারণত শহর বলতে আমরা বুঝি আধুনিক সভ্যতার সকল উপকরণ সমৃদ্ধ লোকালয়কে। যেখানে শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে সব ধরণের নাগরিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। শহরের জীবনযাত্রার মান গ্রামীণ জনপদ থেকে অনেক উন্নত। শহর মানেই উচুঁ দালান-কোঠা, পাকা রাস্তা, যানবাহন আর জীবিকার সন্ধানে ছুটে চলা ব্যস্ত মানুষ। সভ্যতার ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর প্রাচীন শহর সমুহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বহু সভ্যতা। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬৫০ সালে তুর্কির "গজনিয়াতেপ" ছিল অফিসিয়ালি পৃথিবীর প্রথম প্রতিষ্ঠিত শহর। এছাড়া মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ফিলিস্তিনের জেরুজালেম, ইরাকের কিরকুক এবং চীনের সাঙজি প্রদেশের জিয়ান রয়েছে পৃথিবীর প্রাচীনতম শহরের মধ্যে। বর্তমানেও যত শহর পৃথিবী জুড়ে রয়েছে তার সবগুলোই আধুনিক এবং উন্নত সব প্রযুক্তি সংবলিত। শহর মানেই সময়ের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি এবং উন্নত জীবন যাপনের প্রাণকেন্দ্র।

অবিরাম ছুটে চলা, সময়ের ব্যস্ত চাকায় জীবনকে পিষে ফেলাই শহুরে জীবনের স্বরূপ। আপন ভুবন গড়ে তোলাকে নিয়েই দিনরাত ব্যস্ত শহরের মানুষ। মানবিক সম্পর্কগুলো শহরের মানচিত্রে জটিল এক সমীকরণ। জীবনের ব্যস্ত গোলক ধাঁধাঁয় পাক খায় মানুষের আবেগ। আর তাই কাউকে দেখা যায় বিলাসী জীবনের ছন্দে আটকে আছে আর কেউবা অযত্নে অবহেলায় মানবেতর জীবন যাপন করছে। শহর যাকে দেয় দু হাত ভরে দেয় আর যাকে দেয় না সে পড়ে থাকে পথের পাশে। শহর যেন অসমতার এক নীরব তটরেখা। এখানে একই আকাশের নিচে কেউ গরীব, কেউ ধনী, কেউ রাজপ্রাসাদে বাস করে আর কেউ ফুটপাতে। রঙিন বিজলী বাতি আর পাকা বাড়ি শহুরে জীবনকে নান্দনিক করে দিলেও কেড়ে নিয়েছে মানুষের আবেগ। শহরের চারদেয়ালে মানুষের জীবন তাই হয়ে গেছে রংহীন আলপনা। ব্যস্ত শহরের দূষিত বাতাসে আটকে পড়া মন তাই ছুটে যেতে চায় দিগন্তের কাছে। সবুজ গ্রামের উপর নীল আকাশ যেখানে ছাদ হয়ে ঝুলে আছে।

প্রকৃতি মানেই গ্রাম, যেখানে অবারিত মাঠে খোলা হাওয়া দোল খায় পাকা ধানের শীষে। গ্রামীণ জনপদ পেরিয়ে শহরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়ালেই মনে হয় প্রকৃতি যেন পিছনে হাঁটছে। শহরের ব্যস্ততম রাস্তায় বাতাস থমকে যায়। সবুজ মাঠ, অবারিত ফসলের ক্ষেত আর বহতা নদীর বড় অভাব ইট, কাঠের শহরে। ছয় ঋতুর বাংলাদেশ যেন শহরে এসে অর্ধেক হয়ে গেছে। ঋতু বৈচিত্র্য শহরে নেই বললেই চলে। এখানে ঋতুর পালা বদল মানেই বোশেখের তপ্ত রোদে দগ্ধ হওয়া, কিংবা নাগরিক কোলাহল ছাপিয়ে এক পশলা বৃষ্টির শব্দ। শহরে শীত আসে চুপিসারে, স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আবার বিদায়ও নেয়। দালানকোঠার আড়ালে হারিয়ে যায় শরতের কাশফুল। হেমন্তের নবান্ন উৎসব এখানে বড্ড বেমানান। ফসলের মাঠ যেখানে নেই সেখানে নবান্ন আসবেই বা কি করে। এই ছুটে চলা যান্ত্রিক জীবনে বাংলার প্রকৃতি, ছয় ঋতুর পালাবদল কোনো কিছুই চোখে পড়ে না। সবার অলক্ষ্যে নগরের কোনো ছোট্ট উদ্যানে ফুটে থাকে বর্ষার কদম ফুল। শহুরে জীবনে প্রকৃতি মানেই সূর্যের উদয়-অস্ত। ব্যস্ত জীবনে এক পশলা বৃষ্টিই সবাইকে প্রকৃতির ছোঁয়া এনে দেয়। শহুরে জীবনে প্রকৃতির উপস্থিতি তাই একদমই টের পাওয়া যায় না।

জীবিকার জন্য যেখানে ছুটে বেড়াতে হয় দিন-রাত সেখানে অবকাশ মানে বিলাসিতা। সারা সপ্তাহ কর্মব্যস্ত থাকার পর একদিনের ছুটি জীবনকে যেন উপহাস করে যায়। শহরের বেশিরভাগ মানুষ তাই ছুটির দিনে বিশ্রাম নিতেই বেশি পছন্দ করে। জীবন যেখানে আবদারের ঝুড়ি মেলে রাখে সেখানে ছোট্ট

অবসরটুকুও নানা ব্যস্ততায় কেটে যায়। ছুটির দিনে তাই কেউ কেউ ভিড় জমায় শপিং মলে। দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি প্রয়োজন মেটাতে ছুটতে হয় শপিংয়ে। কেউবা পরিবার পরিজন নিয়ে ঘুরতে যান চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, শিশুপার্ক কিংবা উদ্যানে। শৌখিন খাবার-প্রিয় মানুষ ভিড় জমান পছন্দের রেস্তোরাঁয়। কেউবা চলে যান সিনেমা দেখতে কিংবা শিল্পকলায় নাটক উপভোগ করতে। ছুটির দিনে তারুণ্যের আড্ডায় মুখরিত হয় টি,এস,সি, ব্যস্ত শহরে সন্ধ্যা নেমে আসে। স্বল্প পরিসরের অবকাশ শেষে আবার গন্তব্যে ফিরে যায় মানুষ। শুরু হয় কর্মমুখর, ব্যস্ত শহুরে জীবন।

সভ্যতা গড়ে উঠেছিল শহরকেন্দ্রিক হয়ে, আর তাই শহরে সংযোজিত ছিল মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সুবিধা। শহরে উন্নত জীবন যাপনের জন্য সব ধরণের সুযোগ সুবিধা রয়েছে। শিক্ষার জন্য রয়েছে নামি দামি সব স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়। চিকিৎসার জন্য শহরে রয়েছে অগণিত হাসপাতাল, ক্লিনিক যা মানুষকে সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকে। প্রচীনকাল থেকেই ব্যবসার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত শহর। গ্রাম থেকে বহু মানুষ এখনো শহরে আসে জীবিকার সন্ধানে। কর্মব্যস্ততার কারণে মানুষ এখানে ছোট ছোট কাজের জন্য অপরের শরণাপন্ন হচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র। অফিস, আদালত, কলকারখানাগুলো শহরে অবস্থিত হওয়াতে চাকুরির অন্যতম স্থান হিসেবেও বিবেচিত হয় শহর। গ্রামীণ কৃষির বাজার বলা হয় শহরকে। গ্রাম থেকে কৃষকরা ভালো দামের আশায় তাদের পণ্য নিয়ে আসেন শহরে। শহরে রয়েছে বিদ্যুৎ, যা সভ্যতাকে আলোকিত করেছে। দ্রুত যাতায়াতের জন্য রয়েছে মোটরযান, রেলগাড়ি এবং উড়োজাহাজ। পাকা দালানকোঠা, রাস্তাঘাট এবং রঙ–বেরঙের বিজলী বাতি শহুরে জীবনকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। শহরের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানে হাতের নাগালেই সব কিছু পাওয়া যায়।

নান্দনিক স্থাপত্য, আকাশচুম্বী সব অট্টালিকা শহরকে একদিকে যেমন দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে অপরদিকে করে তুলেছে বিষাদময়। শহরের কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া বাতাসকে করে দিচ্ছে শ্বাসের অনুপযুক্ত, এর বর্জ্য নদীর পানিকে নষ্ট করছে ক্রমান্বয়ে। জনসংখ্যার সাথে সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। ক্রমবর্ধমান গাড়ির কারণে বেড়ে চলছে যানজট আর শব্দদূষণের মাত্রা। সেই সাথে বাড়ছে দুর্ঘটনা এবং দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার। অনিয়ন্ত্রিত ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে ঘন্টাব্যাপী আটকে থাকতে হয় রাস্তায়। নিরাপত্তাহীনতা শহুরে জীবনের আরেক বিরূপ দিক। অনবরত ছিনতাই, ডাকাতি এবং খুনের ঘটনা জীবনকে

দুর্বিষহ করে তুলে। মাঝে মাঝে লোডশেডিংয়ে শহরের চিত্র বদলে যায়। ঘুটঘুটে অন্ধকারকে তখন মনে হয় বিভীষিকাময় রাত। কর্মব্যস্ততার আড়ালে মানুষের সাথে সম্পর্কগুলো কেমন যেন ঠুনকো মনে হয়। অনেক সুবিধার পাশাপাশি অসুবিধা শহুরে জীবনকে যেন বিষিয়ে তুলে। এইসব নেতিবাচক দিকের প্রভাবে শহুরে মানুষের মনের আবেগ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ক্রমেই অনুভূতিহীন হয়ে পড়ছে।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিলীন হচ্ছে গ্রাম আর বাড়ছে শহর। জীবনের তাগিদে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরে। মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়াচ্ছে শহরের পরিধি। যান্ত্রিকতায় আটকে যাচ্ছে গ্রামীণ জীবনও। শহর যেমন জেগে থাকে নিশিদিন তেমনি শহরের মানুষও জেগে থাকে নিয়ন আলোর শহরে। অফুরন্ত কাজ আর ব্যস্ততা এই নিয়েই শহরের জীবন। যে জীবনে সম্পর্কগুলোও ইট-পাথরের মতো জড় হয়ে গেছে। তবুও জীবনকে গতিময় করতে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে শহরে আসতে হয়, হতে হয় শহুরে আর শহর টাই হয়ে উঠে একসময় নিজের বাড়ি।

Zahura Yasmin Elina / শ্রীমতী জহুরা ইয়াসমিন এলিনা,
Buffalo, New York, USA

I get inspiration from my surroundings. The term 'My City My Home' inspired me to put my memories in words. Whatever I left behind always recalls me, and my sweetest memories in my life are connected with my city and my home. When I was writing on this topic it brought tears to my eyes. I miss my city, my home. I miss all of them.

স্মৃতির হাতছানি

'প্রয়োজন', জীবনে চলার পথে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় । 'আমি কখনো এটা চাইনা, এটা করবোনা', এভাবে বলে পুরো জীবন কাটে না। প্রয়োজনের সময় যেটা করার কথা, সেটা করতে মন না চাইলেও দরকার হলে সেটাই করতে হয়। যেমন, আমি জীবনের প্রয়োজনে আজ শত-সহস্র মাইল দূরে আমার প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে। চিরজনমের বাঁধন ফেলে যাওয়ার কী যে নিদারুন কষ্ট! বুকের ভিতর নিঃশব্দে পাঁজর ভাঙার শব্দ কেউ শোনে না, শুধু আমি জানি দিনরাত আমার কলিজাটা পুড়ে যাচ্ছে, নিশ্চুপ হাহাকারে কাঁদি সারাক্ষণ।

আমার বাড়ি ঢাকা জেলার কেরানিগঞ্জ উপজেলার রুহিতপুর গ্রামে, আর আমার শহরের নাম হচ্ছে ঢাকা। স্মৃতির মায়ায় জড়ানো তিলোত্তমা নগরী, প্রাণের নদী বুড়িগঙ্গা যার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ।

কলেজে যাওয়ার জন্য বা অন্য কোনো কাজে ঢাকা যেতে হলে যখন বুড়িগঙ্গা ব্রীজে উঠতো গাড়ি, আমি নদীর দুইপাশে দেখতাম আর মনে মনে বলতাম এই যে আমার নদী, আমার প্রিয় বুড়িগঙ্গা । দুইপাশে নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার যাচ্ছে তার বুক চিরে, দুই ধারে বড় বড় বিল্ডিঙের সারি, কতদিন তোমাদের দেখি না! এই শহরের বুকে প্রতিদিন কত-শত মানুষজন জীবন ও জীবিকার টানে ছুটে চলে অবিরত। পুরো শহরটা জুড়ে থাকে তাদের প্রাণচাঞ্চল্য। মনে পরে রিকশার টুং টাং শব্দ, রিকশায় চড়ার আনন্দ, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে চা, ফুচকা, ভেল্পুরি, ঝালমুড়ি খাওয়া বন্ধুরা মিলে। লোকাল বাসে করে কত জায়গায় যাওয়া। আর রাতের ঢাকা, সে তো অতুলনীয় । রঙিন বাতির বর্ণিল সাজে ঝলমলিয়ে নিজেকে সাজিয়ে

নেয়, আলো আঁধারের খেলায় রহস্যময়ী হয়ে ওঠে। রাতের বুড়িগঙ্গা, সে'ও অসাধারণ। লঞ্চে, স্টিমারে আলোর শিখা, দূরে দুইপাশের বিল্ডিং গুলোতে আলোর খেলা, চোখ জুড়িয়ে যায়। কতদিন দেখি না, জানি না আবার কবে দেখবো , দুচোখ ভরে আমার প্রিয় শহর, তোমাকে। চোখ দুটো জ্বলে যায়, নোনা পানিতে ভেসে যায়।

আমার অস্তিত্ব জুড়ে আমার বাড়ি, পুরো দুনিয়াতে সবচেয়ে আপন, সবচেয়ে ভালো জায়গা আমার কাছে। আমার বাড়ির যে দৃশ্য আমার চোখে সবচাইতে সুন্দর, তা হলো আমাদের উঠানের মাঝখানে অনেকগুলো বড় বড় নারিকেল গাছ। যেদিন জ্যোৎস্না হয়, নারিকেল পাতার ফাঁকে ফাঁকে সেই জ্যোৎস্নার আলো খেলা করে, পাতার সাথে মিতালি করে লুকোচুরি খেলে যায়। আমি দুয়ারে বা ছাদে বসে দুই চোখ ভরে দেখতাম আর মনে মনে বলতাম নিয়তি, আমাকে কোনোদিন এই অপূর্ব দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত কোরো না। আমি সারাজীবন তোমাদের মাঝেই থাকতে চাই। কিন্তু এখন চাঁদের আলো আর রাস্তার বাতির আলো মিলেমিশে একাকার। এখন চাঁদ দেখলে চাঁদকে বলি , চাঁদমামা ,তুমি আমার বাড়ি যাও, ওইখানে গিয়ে আমার বাবা-মা, ভাই-বোন, পাড়া-পড়শি, আমার প্রিয় গ্রামটাকে ছুঁয়ে দাও, ভাসিয়ে দাও তোমার আলোর বন্যায়। যাওয়ার সময় সাথে করে আমার স্পর্শটুকু নিয়ে যাও। সবাইকে তোমার আদর দিয়ে, সাথে আমার ছোঁয়াটুকুও দিও। আর সবাইকে কানে কানে বলে দিয়ো, আমি ঠিকই আছি তোমাদের সাথে মিশে সবসময়। আমি না হয় আরেক জনমে আমার গাঁয়ের ধূলিমাখা পথই হবো। তখন তোমার মমতামাখা হাসি দিয়ে আমায় ছুঁয়ে দিও।

আমার বাড়ির একেক বেলায় একেক রকম গন্ধ আছে, আছে একেক রকম অনুভূতি যেটা আমি টের পেতাম । সকালবেলার স্নিগ্ধ হাওয়ার মন মাতানো সুবাস, দুপুর বেলায় কেমন যেন বুকটা হাহাকার করা অনুভূতি, মনে হয় কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে যাচ্ছে, বিকেলবেলার পড়ন্ত বাতাসের পরশ, আর সন্ধ্যাবেলার মন খারাপের আবির রাঙা আকাশ দেখে কেন জানি না কান্না আসতে চাইতো। আবার শীতের সকালবেলা কুয়াশা মাখা ভোরের আকাশে সূর্যের প্রথম কিরণ, সেই সময়তেও কেমন যেন একটা গন্ধ পেতাম। কুয়াশার গন্ধ। এখনো চোখ বন্ধ করলেই সেইসব টের পাই, একদম আগের মতো।

আমি যেদিন চলে আসবো দেশ থেকে, তার আগের দিন মনে হচ্ছিলো, মরে যাওয়ার আগের রাতে বুঝি মানুষের এমনই লাগে। কোথায় যাবো এই প্রিয় বাড়ি

ছেড়ে, এই আঙিনা ছেড়ে একা একা। যেখানে যাবো সেখানে তো আমার কেউ নেই, সব অপরিচিত। আমি কেমন করে থাকবো ? আমার আপনজন তো সব এইখানে। তখন আমি বাইরে গিয়ে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিয়ে নিলাম, আমার বাড়ির ঘ্রাণ মনে গেঁথে নিলাম। একা একা পাশের রাস্তায় গিয়ে তার গন্ধও নিলাম। এখন আমি খুব বুঝতে পারি, এই কথাটার মানে যে, মানুষ থাকে এক জায়গায়, আর তার মন পড়ে থাকে আরেক জায়গায়।আমার মন আমার বাড়িতে সবসময়, সারাক্ষণ পড়ে আছে। আমি চোখ বন্ধ করলেই সেখানে চলে যাই।

আমাদের ঘরের জানলা দিয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়া দেখতে আমার খুব ভালো লাগতো। আরো ভালো লাগতো, টিনের চালের প্রতিটা ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে একভাবে বৃষ্টির রেখাগুলো পড়ছে, এটা দেখতে। বৃষ্টি আসার আগের মুহূর্তটাও অনেক পছন্দের। চারদিকের আকাশ কালো করে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যায়। আর দু'এক ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে পড়তেই সবাই ছুটাছুটি করে রোদে শুকাতে দেয়া কাপড়গুলো ঘরে নিয়ে যায়। আমার তখন পাগলা হাওয়ার সাথে দৌড়াদৌড়ি করে বাইরের কাজগুলো করতে কী যে ভালো লাগতো! মনে হতো আমিও বাঁধনহারা বাতাসের সাথে মিলে অনেক দূরের আকাশে ছুটে ছুটে বেড়াই। দিনের বেলায় বৃষ্টি শুরু হলে যেভাবেই হোক, আমি ভিজবোই। প্রতিদিন হলে প্রতিদিনই। বৃষ্টির পরে একটা সোঁদাগন্ধ বের হয় চারিদিকের ভেজা গাছের, ভেজা পাতাগুলো কেমন ঝিকমিক করে, সজীব হয়ে ওঠে চারপাশ। আর রাতের বেলা বৃষ্টির ঝমঝম শব্দ যেন ঘুম পাড়ানি গান হয়ে যায় চলে আসে যেন। চোখ বুজলেই সেই দিনগুলো আমার সামনে। তারা শুধু আমায় পিছু ডাকে। আমি সামনের দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তাদের অবিরত ডাকে বারে বারে পিছনে তাকাই।

মনে হয় যদি একটা পাখি হতে পারতাম, আমার ডানায় ভর করে যখন মন চাইতো ,সাথে সাথে ফিরে যেতে পারতাম! মন চাইলেই দেখে আসতে পারতাম আমার প্রিয় দেশটাকে, আমার গ্রামটাকে। কী করছে আমার মা একা একা বসে, কী ভাবছে? পেপার পড়তে পড়তে, বাবা কি আমার কথা মনে করছে? আমার বোন কি কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময় আমায় মনে মনে খোঁজে? নিঃশব্দে আমায় জিজ্ঞেস করে, দেখ তো আপু, এই রঙের টিপ কি আমায় মানায়? তোর জন্যেও একই রকম জামা বানাই? দুইবোন একসাথে পরবো। আমার ভাই কি বাইরে থেকে ঘরে আসার সময় ফোন করে আমায় খোঁজে? ভুল করে বলতে চায়, বুবু ফুচকা

খাবে? নিয়ে আসি? পুরি আনবো, চা দিয়ে খাবে?

আহা রে! মন চাইলেই যদি ফিরে যেতে পারতাম! সাথে সাথে সবাইকে দেখে আসতে পারতাম দু'চোখ ভরে! আমি ফিরে যেতে চাই আমার প্রিয় আঙিনায়, বসতে চাই মাঠের সবুজ ঘাসে। হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই আমার বাড়ির গাছগুলোকে, ফুলের বাগানের মাঝখানে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে।

নিয়তির কাছে প্রার্থনা, জীবন, তুমি যদি একটা বৃত্ত হও, তবে শুরু করে এসে মাঝপথে থেমে যেও না। বৃত্তটা পুরোপুরি শেষ করে আর একবার শুরুতে গিয়ে তারপর মিশে যেও দিগন্তরেখায়। শেষ রেখাটা বিলীন হয়ে যাবার আগে, আবার আমার শিকড়ের কাছে আমাকে যেতে দিও।

Zahura Yasmin Elina / শ্রীমতী জহুরা ইয়াসমিন এলিনা,
Buffalo, New York, USA

I get inspiration from my surroundings. The term ‘My City My Home’ inspired me to put my memories in words. Whatever I left behind always recalls me, and my sweetest memories in my life are connected with my city and my home. When I was writing on this topic it brought tears to my eyes. I miss my city, my home. I miss all of them.

আমার নকশিকাঁথা

শিউলি ফুলের গাছটা যখন,

ফুলে ফুলে ভরে উঠে,

সেই ফুল সে পুরো পথ জুড়ে বিছিয়ে দেয়।

বাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে।

হয়তো কেউ কুড়িয়ে নেয়, অথবা কেউ মাড়িয়ে যায়।

প্রিয় আমার শিউলি ফুল, তুমি কি চাও, আমি

এসে দাঁড়াই তোমার ছায়াতলে?

আমি খুব করে চাই, বিছিয়ে থাকা ফুলগুলোকে,

তুলে নিতে দু'হাতের মুঠোয় করে।

রাতের আঁধারে জোনাক পোকারা, দল বেঁধে

বাড়ির পাশের বাঁশঝাড়ে, কার খোঁজ করে?

তোমরা কি জানো?

আমি তোমাদের খুঁজে বেড়াই।

তোমাদের নিভে-জ্বলে,আলোর খেলা দেখতে দেখতে,

কী যে অব্যক্ত খুশিতে ভরে উঠতো মন আমার!

যখন উথালপাথাল জ্যোৎস্নায় পুরো বাড়ি ভেসে যায়,
পাগলপারা সেই আলোর বৃষ্টি গায়ে মেখে,
হেঁটে বেড়াই উঠানময়,
অনন্তকাল ধরে যদি হেঁটে যাওয়া যেত !
আমার গাঁয়ের মেঠোপথ ধরে দূরে, বহুদূরে !

আর ছোট্ট তুমি বেলগাছ,
এখন কি অনেক বড় হয়ে, দুয়ারে আলো-ছায়ার খেলা দেখাও?
আমি তোমার ছোট ছোট পাতার ফাঁক দিয়ে,
বিশাল আকাশটাকে দেখতে চাই।
হলুদ রাঙা করবী ফুল, তুমি কী করো?
বাড়িতে কেউ আসলে,
তুমি কি নুয়ে পড়ে অভিবাদন জানাও?
আমি চাই তুমি টুপ করে এসে বসো আমার খোলা চুলে,
যখন বাতাস এসে, তোমার পাতায় কাঁপন ধরায়।

আমের বোল, আমি যে চাই আকুল হয়ে তোমায় ছুঁয়ে দিতে,
প্রাণভরে তোমার কাঁচা সবুজ গন্ধ মেখে,
তোমার মতো সজীব হতে।
ঝড়ো বাতাসে খুব করে চাই,
কালবোশেখি ঝড়ের সাথে আম কুড়াতে।
তোমরা জানো? আমি মিশে আছি তোমাদের সাথে ।

আমার নদী, তোমার কি মনে পড়ে সেই যে–
প্রতিদিন তোমার আমার দেখা হবার কথা?
আমায় কি দেখতে চাও তুমি?
আগের মতো যদি ফিরে পেতাম দিনগুলো !
এই আঙিনায় দোলনা দোলার দিনগুলো কি,
আর একটিবার ফিরে পাওয়া যায় না?
আমি খুব করে চাই, যদি ফিরে পাই
সেই সোনালী দিন, রঙিন ঘুড়ির মতো করে,
আকাশে উড়িবার।

ফেলে আসা দিনগুলো হাতছানি দেয়,
মনের ভিতর অবিরাম বয়ে চলা স্মৃতির নদী,
ডাক দিয়ে যায় অবিরত,
আমিও তাই নিঃশব্দ চিৎকারে বলি,
আমি ফিরবোই, ফিরে আসবোই একদিন,
চিরচেনা এই পথে,
স্মৃতিমাখা রোদ্দুর যেখানে খেলা করে ।

আর আমার শহর, কেমন আছো তুমি?
তুমি কি ভুলে গেছ আমায়?
জানো? আমার মনে পড়ে তোমায়,
কতশত মানুষ, রিকশার টুংটাং, রাস্তার পাশে জারুল,
কৃষ্ণচূড়ার চিরল পাতায় ঝিরিঝিরি বাতাস,

চোখ বুজলেই সেই বাতাসের ছোঁয়ার অনুভবে,
তুমি আমার প্রাণের শহর ঢাকা। যেখানে,
কোলাহলপূর্ণ জীবন ছুটে বেড়ায়
বিরামহীন। জড়তাহীন।
কখনো কখনো করুণাহীন,কঠিন
ইট,পাথরের দালানের ভিড়ে।
আবার জড়িয়ে নেয় ভালোবাসায়, মমতার কোমল ছোঁয়ায়।
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর, অবিরাম বয়ে চলা,
যেন জীবনের প্রতিচ্ছবি।

যেখানে আমার নাড়ির টান – প্রাণের নদী,
খেলার মাঠ, বাড়ির উঠোন, সবুজ ধান আর
হলুদ সরিষা ক্ষেত আমার পুরো অস্তিত্ব জুড়ে।
তোমরা সবাই ভালো থেকো, সবসময়।

Sultana Rajia Shila / সুলতানা রাজিয়া শীলা, Dhaka, Narsingdi, Bangladesh

My City and My Home inspire me because of my hobby. So I am Inspired to write and work.

আমার শহর

হে ভিন দেশি মানব স্বজন
এসো গো আমার বাড়ি-
তোমায় দেখাবো আমার
ললিত শহর,
কেমন সোনার সাজন ধরি।
এক সবুজ শ্যামল স্বপন পুরী-
যেন ডাকছে তোমায় নিলাম্বরী
বকুল মালা হাতে।
ঐ নিলাম্বুধী সৈকত পেরে-
যেথা ঢেউয়ের ছোঁয়ায়
শিশির পড়ে-
তোমায় করিতে বরণ সোহাগ
ডালায়,
আমি ঘর বেঁধেছি তাতে।
আমার শহর ও বাড়ির মাটি-
সে তো পবিত্র আর বড়ই খাঁটি-

যার ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরা,
ঐ বঙ্গবীরের গড়া।
যে শিমুল হিজল কদম তলে-
এই জারুল স্বর্ণলতা তলে-
আজ নীরব নিথর সে মুক্তি
শহিদ।
সব ঘুমিয়ে রয়েছে ওরা।
ওগো আমার শহর মুখের হাসি-
বর্ণ বিভেদ ভুলা।
সে তো অতিথির তরে স্বর্গ
খুশির,
যেন পেলো সে নতুন দুলা।
আরো মায়ার দুহাত বাড়িয়ে ডাকে-
সন্তানের আদরে।
সেথা ঘুরবে যেথাই মনের খুশি,
ইচ্ছা যাহা ধরো।
তবে বিনয় আমার বেলা বলি-
এসো গো আমার বাড়ি,
নহে তো শহর পার করিতে,
রাতের প্রহর ধরি।
শুনতে হবে কড়ায় কড়ায়-
আর চোখে পেলে ঘুম-

হয়তো ধড়াস পড়ে ব্যাথার জ্বালায়
পারে আটকে যেতে দম।
ওহে এসো না একবার মোদের বাড়ি-
দেখে যাও শহর ঘুরে,
তোমার দুঃখগুলো সব ভুলিয়ে দেবে,
তাঁর হৃদয় স্নেহ ঘিরে।
হে ভিন দেশি মানব সজন-
আমার যদিও ছোট্টঘর-
তবুও মনের ঘরে রবে সবায়,
কেউ নহে মোর পর।
দেখো আমার শহর ধার ঘেসে-
ঐ নদী গেল বয়ে,
যার পূবাল হাওয়ায় পালের তরী
ছুটছে ভাটির নেয়ে।
উজান দেশে বাইছে কেহ-
মাস্তুলে ডোর বেধে,
নদীর পাড় ঘেঁষে গানে ছুটছে টেনে,
দাঁড় ধরা অন্য জনে।
দিন কি আঁধার রাতের কালো-
নেই ভেদাভেদ শুধুই আলো,
যেন আমার শহর স্বর্ণঝরা,
পূর্ণিমা চাঁদের ফালি ধরা।

আরো আকাশ কানন ফুলগুলো সব-
মাথার উপর হাসে।
শুধু একটি কথা বলতে গেলে-
হাতের কলম আর না চলে-
ঐ গাড়ীর চাপায় মরলে মানুষ,
তার চোখ জলে বুক ভাসে।

Kazi Tasmia Tazry / কাজী তাসমিয়া তাজরী, Muradnagar, Comilla, Bangladesh

My city, my parents, my dreams and my rights inspired me.

শহর বনাম স্বপ্ন

ছোট্ট শহরের এক কোণে
মায়ের আদরে ঘেরা
ভাই-বোনের কোলাহলে পূর্ণ
সঙ্গে বাবার মৃদু শাসন।

কী আছে আমার ছোট্ট শহর মুরাদনগরে?
এমন প্রশ্নের জবাব যারা চায়
তাদের আমি বলে দেই, কী নেই বলুন?
গোমতীর তীর থেকে আসা বিশুদ্ধ শীতল বাতাস
আমাদের ভালোবাসতে শেখায়।
আরো আছে আল্লাহ চত্বর, মোহনমার্কেট।
বেড়ে উঠার নিত্য সঙ্গী স্কুল-কলেজ
সেখানে পরিচিত কিছু হাসিমাখা মুখ
ভুলিয়ে দেয় সব কষ্ট।
চেনা রাস্তা, চেনা গলি
যেখানে জেগে থাকে খুপরির মতো ফুচকার দোকান
আড্ডায়-আড্ডায়।

ছোট্ট স্টেডিয়ামে বল নিয়ে ছুটতে ছুটতে
নিজেদের দর্শকের কাছে প্রমাণ করা রাস্তার ছেলেরা

যারা স্বপ্ন দেখে
ছাড়িয়ে যাবে পেলে, ম্যারাডোনা, মেসিকেও
শহরকে নিয়ে যাবে এক অনন্য উচ্চতায়।
আরও আছে শিল্পকলা একাডেমি
যেখানে শিশুরা নেচে বেড়াচ্ছে, গেয়ে বেড়াচ্ছে
হয়তো এরাই হবে বিশ্ববরেণ্য শিল্পী
পরম মমতায় বুকে আগলে নিয়ে
প্রিয় শহরের স্মৃতি।

আমারো বড় ইচ্ছে করে
বুকের মাঝে পুষে রাখা স্বপ্ন পূরণে
ছুটে যেতে বিশ্বদরবারে।
হয়তো দারুণ কিছু অপেক্ষা করছে
বাড়ির চার দেয়ালের বাইরে
শহর থেকে অনেক দূরে।

কিন্তু, তক্ষুনি অনুভব করি শক্ত শেকল
আমার পায়ে বাঁধা।
তবে কি এই শহর আমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসে?
নাকি এই শহর মেয়েদের জন্য রক্ষণশীল
ঠিক এখানকার দশটা পরিবারের মতো
যেখানে মেয়েদের লোক দেখানো লেখাপড়া শেখানো হয়
আর উচ্চমাধ্যমিক পেরোবার আগেই,
ধরে-বেঁধে বিয়ে।
স্বপ্ন, লেখাপড়া, ক্যারিয়ার

সব না হয় বিয়ের পর হবে।

সত্যি কি স্বপ্নগুলো পূরন হবে?

আমি সুলতানার মতো জীবন পেতে চাই না
যাকে রোজ মাতাল স্বামীর চড়-থাপ্পড় সহ্য করতে হয়।
কিংবা নিরুপমার মতো,
যৌতুকের টাকার জন্য দীর্ঘদিন নির্যাতিত হবার পর
একদিন সকালে তার লাশ ভেসে উঠেছিল
বাড়ির পাশে পচা ডোবায়।

আমি এভাবে মৃতের মতো বেঁচে থাকতে চাই না।
আমি শুধু নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই।
নিজের স্বপ্নকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই।
তক্ষুনি শুনতে পাই,
চারিদিক থেকে স্বজনেরা চিৎকার করে বলছে,
'দাঁড়াও, বাইরের পৃথিবী তোমার জন্য নয়।
যেখানে স্কুল বাসের জন্য একলা দাঁড়িয়ে থাকা
আট বছরের শিশুকেও
দেখতে হয় নিষ্ঠুর থাবা,
যেখানে নিষ্পাপ কিশোরীকে
রোজ রাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অশ্রুসজল চোখে
অ্যাসিড ঝলসানো চেহারায়
হাত বুলাতে হয়,
সেই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে

তুমি কখনোই নিরাপদ নয়।
ঘর থেকে বাইরে পা ফেলা মানেই
চরম অনিশ্চয়তায় নিজেকে ঠেলে দেওয়া।'

হয়তো তাদের কথাই ঠিক।
তবু বদ্ধ ঘরে নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়
যখন দেখি, পাশের বাড়ির সমবয়সী ছেলেটি
অনেক আগেই পাড়ি জমিয়েছে দূর দেশে
ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে
নিজের স্বপ্নের পথে।
মেয়েরা কি কখনো পাবেনা উড্ডয়ন-ক্ষমতা?

Halima Khatun / **হালিমা খাতুন,** Dhaka, Bangladesh

Social discrimination inspired me

আমার বাড়ি

এক সময় ভাবতাম –
যেথায় বেড়েছে মোর আজন্ম শৈশব।
অদৃশ্য মমতায় বাঁধা বন্ধন,
পরিবেশ, পড়শী আর স্বজন,
প্রশান্তি পেতাম দুঃখের দহনে-
নীলাকাশ আর শ্যামলিমা দেখে,
শ্বশুরালয়ে এসব ছেড়ে-
থাকবো কেমন করে।

সব ফেলে এসেছি হাত ধরে অন্যের,
সাজিয়েছি সুখের ঘরকোণের।
এরাই এখন আপন গত হয়েছে পর।
আজ ভাবি, কেমন করে যাব পরপার।
হয়তো এমন করে যাবো চলে,
এদিনকে পাবার বাসনা সেদিনে-
মনকে উদ্বেলিত করবে কিনা,
তা আজ অজানা আর অজানা।

Shahana Yasmin / সাহানা ইয়াসমিন, Dhaka, Bangladesh

In Dhaka, the city I live in, you can see mothers of school children waiting outside the school for 5 to 6 hours every day. This city does not have any public toilet for women. So these mothers cannot go to toilet for a long time, and develop urinary diseases. Their husbands don't find them attractive, so they develop relationships with other women. I wanted to write about the plight of these mothers. My City and My Home inspired me to write this.

এক 'কিচ্ছুই করে না' মেয়ের গল্প

ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেন?

আমি কিছু বলার আগেই আমার হয়ে উত্তর দিল শাহেদ, কিচ্ছুই করে না, হাউস ওয়াইফ!!

'হাউস ওয়াইফ' কথাটা শাহেদ এমনভাবে বলল যেন এর চেয়ে তুচ্ছ কাজ আর নেই, আত্মগ্লানিতে আমি মাথা নিচু করে বসে আঙ্গুলে আঁচল জড়াতে লাগলাম। ডাক্তার সাহেব ঘসঘস করে প্রেসক্রিপসন লিখে আমার হাতেই দিলেন।

– পেসাব চেপে রাখতে রাখতে আপনি রোগ বাঁধিয়েছেন... এই ওষুধগুলোর সাথে সাথে প্রতিদিন প্রচুর পানি খাবেন, আর কখনোই পেসাব চেপে রাখবেন না।

ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে আমি কুন্ঠিতভাবে শাহেদের দিকে চাইলাম, দেখলাম বিরক্তিতে শাহেদের কপাল কুঁচকে আছে, আমার দিকে একেবারেই তাকাচ্ছে না! বিরক্ত হবারই কথা, অন্যদিন এসময়ে অফিস থেকে ফিরে শাহেদ বিশ্রাম নেয়; টিভি দেখে, ফেসবুক করে। অথচ আজ আমার জন্য প্রায় তিন ঘন্টা গেল ডাক্তার দেখাতে, এখন আবার যানজট ঠেলে বাড়ি পৌঁছাতে লাগবে এক দেড় ঘন্টা! মনে মনে ভাবলাম, বাড়িতে ঢুকে আগে চুলায় চায়ের পানি চাপিয়ে দিয়ে

তারপর নিজে ফ্রেশ হতে যাব। গরম এক কাপ চা হয়ত শাহেদের মাথা কিছুটা ঠাণ্ডা করতে পারে!

সব কাজ সেরে শুতে শুতে রোজকার মতোই বারোটা বেজে গেল। শাহেদ ততক্ষণে গভীর ঘুমে; সকালে অফিস আছে বলে ও কোন রাতেই আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকে না... একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম; অনেক চেষ্টা করেও আমি এর চাইতে আগে শুতে আসতে পারি না... তাই কোনদিনই শাহেদের সাথে দুটা কথা বলার সময় হয় না। কিন্তু উপায় কী! আমার দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। শাহেদের মতো অফিসে যাই না কিন্তু আমাকেও প্রতিদিন শাহেদের মতোই সকালে বের হতে হয়, তবে আমার বের হওয়াটা শাহেদের মতো কাজে নয়, বরং মেয়ে তৃণাকে স্কুলে নিয়ে যাবার মতো অকাজে। বেরোবার আগে শাহেদের নাস্তা টেবিলে দেয়া, তৃণার টিফিন, দুপুরের একটা তরকারি এসব করতে হয়। দুপুরে কোনমতে এক তরকারি দিয়ে মা-মেয়ে খাই, কিন্তু রাতে ভালোমন্দ রান্না করতেই হয়। খাবার ভালো না হলে শাহেদ রাগ করে বলে, সামান্য রান্নাটাও করতে পারো না!

শুনে মনখারাপ হয়; তাই যতই ক্লান্তি লাগুক, সন্ধ্যা হতেই আমি শাহেদের পছন্দের তরকারি রাঁধতে শুরু করি, রান্না শেষ হতে রাত নয়টা। ফাঁকে ফাঁকে তৃণার পড়া দেখতে হয়। শাহেদ বলে, এমনই এম এ পাশ, যে মেয়েকে পড়াতেও পারে না!

একথা শাহেদ বলতেই পারে। ওর সহকর্মী শায়লা এম এ পাশ করে কেমন সুন্দর চাকরি করছে, অথচ আমি কিছুই করি না। অতএব তৃণাকে পড়ানোর দায়িত্ব আমারই ওপর।

শায়লার কথা ভাবলেই আমার বুকের কোথাও একটা চিনচিনে ব্যথা হয়। শাহেদের মুখে শায়লার প্রশংসা লেগেই থাকে, শায়লা কত স্মার্ট, কী সুন্দর ব্যবহার, কী মার্জিত সাজগোজ, আমার মতো হাউজ ওয়াইফ তো না! শায়লা

তেমন সুন্দরী নয়, কিন্তু সুন্দরভাবে মেকআপ করে সুন্দর শাড়ি পরে মুখে এমন স্মিত হাসি ঝুলিয়ে রাখে যে আমিই মুগ্ধ হই, শাহেদ মুগ্ধ হবে এ আর বেশি কী! শাহেদ যখন অফিসের গাড়িতে ওঠার সময় শায়লার দিকে তাকিয়ে হাসে, তখন ওর চোখ জুড়ে থাকে কী মুগ্ধতা!

প্রতি শনিবার অফিসের গাড়িতে ওঠার সময় শায়লার দিকে তাকিয়ে শাহেদের হাসি দেখি আমি। শনিবারে তৃণার স্কুল বন্ধ তাই আমার সুযোগ হয় জানালার পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে গাড়িতে বসা শায়লাকে দেখার! শায়লা শাহেদের দিকে তাকিয়ে হাসে আর শাহেদও হাসিমুখে গাড়িতে উঠে শায়লার পাশে বসে। আমার খুব মনখারাপ লাগে, কতদিন শাহেদ হাসিমুখে আমার সাথে কথা বলেনি...কতদিন শাহেদের সাথে সুখদুঃখের কথা বলিনি...

আমার সুখদুঃখের কথা বলার সাথী তাহমিনা, রিতা, সাবিহা... এরা আমার বান্ধবী। আমরা বান্ধবী হয়েছি মেয়ের স্কুলে এসে। আমাদের সবার বাসাই আজিমপুরের এই স্কুল থেকে অনেক দূরে। ঢাকার নানা প্রান্ত থেকে দীর্ঘ সময় বাসযাত্রা করে আমরা স্কুলে আসি। ট্র্যাফিক জ্যামের জন্য বারবার যাতায়াত করা সম্ভব না, তাই আমরা ছুটি হওয়া পর্যন্ত স্কুলের কাছাকাছি ফুটপাতে বসে আড্ডা দিই। আমাদের মতো এমন অনেক মায়েরাই সকালে বাচ্চা নিয়ে এসে ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করেন ফুটপাতে বসে। ফুটপাতে বসার এই জীবন আমরা বাধ্য হয়ে বেছে নিয়েছি সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখবার আশা নিয়ে। এই শহরে যে গুটিকয় ভালো স্কুল আছে তার একটিতে তখন সন্তান পড়ার সুযোগ পায়, তখন আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মা-বাবা সেই সুযোগ লুফে নেয়। বাড়ি থেকে স্কুল যত দূরেই হোক, আমরা সেই ভালো স্কুলে ভর্তি করাই। স্কুলে আনা নেওয়ার দায়িত্ব পড়ে 'হাউজ ওয়াইফ' মায়েদের উপরে, এই শহর ছোট মেয়েদের একাকী যাতায়াতের জন্য নিরাপদ নয়।

প্রথমদিকে ভালোই লাগতো, সুন্দর সালোয়ার কামিজ, কখনো শাড়ি পড়ে সাজগোজ করে স্কুলে আসতাম। কয়মাস পরেই সাজগোজ কোথায় উধাও...

আমরা বোরকা পরা ধরলাম কারণ রোদে–ঘামে অল্পদিনেই সব পোশাক মলিন আর বিবর্ণ হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় ফুটপাতে বসে থেকেও ঘরে ফিরে ঘরের কাজ করায় আমরা অভ্যস্থ হয়ে পড়লাম। শীতের ধোঁয়াশায় দিনে আমরা ঠান্ডা ফুটপাতে বসে কাঁপি, ঝমঝম বর্ষায় ছাতা মাথায় দিয়ে দোকানের ছাউনির নিচে দাঁড়াই, গ্রীষ্মের চড়া রোদে পুড়ে আমাদের চামড়া কালো হতে থাকে... আমাদের চেহারা ক্রমশ খারাপ হয়...

আমরা বসে কত গল্প করি। একসময় দেখা গেল আমাদের সবার জীবনের গল্প একই – আমাদের সবার স্বামীই এক ছাতের নিচে থেকেও আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকে... আত্মীয়– পরিচিত অনেকেই আমাদের করুণার চোখে দেখে, কারণ আমরা দেখতে ঝলমলে না, আমরা তুচ্ছ কাজে ব্যস্ত থাকি! আমাদের স্বামীরা যে আমাদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে প্রত্যেকেই নিজের আগ্রহের জায়গা খুঁজে নিয়েছেন, এসব কথা কাউকে বলার নয়। তাই তাহমিনা, সাবিহা, রিতা আর আমি স্বপ্না, এসব দুঃখের কথা আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে একটু হালকা হই।

ফুটপাতে বসে থাকতে থাকতে আমরা একটা অভ্যাস আয়ত্ত করেছি– সাত আট ঘন্টার জন্য প্রস্রাব চেপে থাকা। প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফিরতে আমাদের এই সময় লাগে। স্কুলের আশপাশে কোন পাবলিক টয়লেট নেই যে সেখানে যাব, আসলে এই শহরে মেয়েদের জন্য পাবলিক টয়লেট নেই বললেই চলে। এজন্য আমরা সকাল থেকে খুবই অল্প পরিমাণ পানি খাই যাতে প্রস্রাব না পায়। এর ফলে আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়েছে, যেমন আমার মাঝে মাঝে জ্বর হয় আর সহজে প্রস্রাব হতে চায় না। কিছুদিন ধরে খুব কষ্ট হচ্ছিল দেখে আজ ডাক্তারের কাছে গেছিলাম, কিন্তু ডাক্তার যে বললেন প্রচুর পানি খেতে আর নিয়মিত বাথরুমে যেতে – সেটা কীভাবে করব! নিয়মিত বাথরুমে যাবার জন্য আমাকে তো বাসায় থাকতে হবে; তাহলে তৃণা স্কুল করবে কীভাবে!

ঘুমন্ত শাহেদকে কী নিশ্চিন্ত দেখাচ্ছে। আমার দুশ্চিন্তার ভাগ নেবার মতো কেউ নেই এ বাড়িতে! ! দুশ্চিন্তার সাথে যোগ হয়েছে শরীরের কষ্ট, প্রস্রাব করার সময়

পেটে খুব যন্ত্রণা হতে থাকে কিন্তু সহজে প্রস্রাব হয়না। দীর্ঘ সময় বাথরুমের কল ছেড়ে রাখলে পানি পড়ার শব্দে একসময় আমার অল্প প্রস্রাব হয়।

বাথরুমে কলের জলের ধারার সাথে সাথে অঝোর ধারায় আমার গাল বেয়ে জল ঝরতে থাকে; এ জলে মিশে আছে এক মেয়ের যন্ত্রনা, অপমান আর অভিমান। আমার সংগ্রামের কথা ঘরের কেউ বুঝতে পারেনা... কিন্তু এই শহরের রাস্তা আর ফুটপাত কী জানে কতটা কষ্ট করে আমি টিকে আছি!

Sirajam Munira Binte Yusuf / সিরাজাম মুনীরা বিনতে ইউসুফ, Dhaka, Bangladesh

'মাই সিটি মাই হোম' আমাকে নারীদের সম্পর্কে বলার সুযোগ করে দিয়েছে। নারীদের ডানা মেলার সুযোগ নেই। সেই কথাগুলো আমাকে লেখার সময় বারবার মনে করিয়েছে। ধন্যবাদ 'মাই সিটি এন্ড মাই হোম' টিমকে নারীর না পাওয়ার বেদনা তুলে ধরার সুযোগ দেবার জন্য।

মেয়েমানুষ

আমি বিন্দু। গল্পের বিন্দুবাসিনী নই। শাড়ী, গহনা, পান খাওয়া ঠোঁট, হাসিহাসি মুখ সেই বিন্দুবাসিনী নই। ছোট্ট শহর হতে আসা মেয়ে আমি। নরসিংদীর শিবপুরের মেয়ে আমি। আমার ছিল মৃগের মতো এক জোড়া স্বপ্নচারিনী চোখ, যে চোখে আমি স্বপ্ন দেখেছি বড়ো হব বলে। কতটা বড়ো? পরিমাপ করিনি। ছোট্টবেলা পাইলট হবার স্বপ্ন দেখেছি আকাশে বোঁ বোঁ করে বিমান যেতে দেখে। তারপর বাবা যখন স্কুলে ছেড়ে এল, গুটি গুটি পায়ে নতুন স্বপ্নরা ডানা মেলল। স্কুলের টিচার আপাদের কথা শুনে মনে হত ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হলেই সব স্বপ্ন বোধহয় পূরণ হয়ে যাবে। স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে যখন কলেজে এলাম, স্বপ্নগুলো পাল্টে গেল। বাবার হাতে বিবর্ণ বাজারের ব্যাগ, মায়ের ছেড়া আঁচলে মোছা ঘাম, স্বপ্নগুলোকে বাস্তবতায় টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল। তখন স্বপ্ন আমার শুধুই আমাকে পরিচালিত করতে পারে এমন একজন ভাল ছেলে। সব রঙিন স্বপ্ন ডানা ভেঙে দুমড়ে পড়ে মুখ থুবড়ে।

তারপর একদিন আমাকে পরিচালিত করতে পারা ছেলের দেখা মিলে যায়। ততদিনে আমিও কলেজের দেয়াল পেরিয়ে ভার্সিটিতে উড়তে শুরু করেছি। রাফিদ। একটা বিদেশি কোম্পানির হিউম্যান রিসোর্স অফিসার। মাইনে ভাল। ঢাকায় ফ্ল্যাট আছে। একটি গ্রামের মেধাবী মেয়ের জন্য এর চেয়ে বেশি আর কি চাওয়া হতে পারে!

তারপর নতুন শহর। স্বপ্নের শহর। ঢাকা শহর। ইট, কাঠ আর পাথরের সাথে নতুন জীবন। কোথায় পাইলট, কোথায় ডাক্তার, কোথায় ইঞ্জিনিয়ার আর কোথায় স্বাবলম্বী হবার স্বপ্ন! মেয়েদের আকাশে ওড়ার স্বপ্ন আমাদের সমাজে দেখতে নেই। সেটা পাপ বৈকি!

টিপ টিপ শিশির ঝরছে। সবুজ পাতার ওপর শিশিরের বিন্দুগুলো যেন কান্না হয়ে ঝরছে। আমার কান্না। তোমার কান্না। কে জানে, কার কান্না? আজ বিকেলের মন খারাপ করেছে আমার সাথে। সকাল হতেই মন খারাপ। রাফিদ অফিস যাবার আগে খুচরো টাকা ধরিয়ে বলল, সবজি কিনে নিও। আর শুক্রবারে মাছ গোশত(মাংশ) কিনবনে। আম্মা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, পোলাগোর কাম মাইয়্যাগরে মানায় না। আজকালকার পোলারা কামচোর।

রাফিদ উপরের আর নিচের পাটির বত্রিশ দাঁত বের করে হাসি দিল। যেন আমার শাশুড়িমা মজার কোনো জোক বলেছেন। আমিও সংকুচিত হয়ে পড়লাম। আম্মা আমার হাতে পয়সা দেওয়াটা কখনই ভালো চোখে দেখেন না। বাড়ির বউদের পয়সা হাতে দিলে তারা নাকি আসমানে ওড়ে। আর কেনাকাটার ভার! সেটা তো গর্হিত কাজ, বাড়ির বউদের জন্য। নেহাত আম্মা বাতের ব্যথায় ভুগছেন, নয়ত এসব কাজ আমার হাতে আসার কোন কারণই ছিল না।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমি কুমড়োর ফুল আর লাউ কিনছি। বউ ভাল কইরা ওড়না দাও। সবজিওয়ালা বেডা কিমনে চাইয়া আছে!

আমি ওড়না টেনে নিচে ঝুড়ি ফেললাম। সবজিওয়ালার নিরীহ চেহারার সাথে আম্মার বাক্যের কোন মিল পেলাম না। তবে কোথায় যেন মরমে লেগেছে আমার। কত টাকার সবজি কিনলা? টাকা গুইনা রাখছ? দেহি.....দশ....পাঁচ.....বিশ.....চল্লিশ ট্যাহা বাঁচছে। হিসাব রাহ।

চোখ ফেটে জল এল। আমি কি চোর! টাকাটাও গুনে রাখতে হবে ওনার?

সবজি কুটতে গিয়ে খেয়াল করলাম হাতের দিকে। চামড়া উঠছে হাতে।

শীতকালে আমার হাতের চামড়া ওঠে। রাফিদকে বলতে হবে, একটা তিব্বত পমেট এনো। বুকের ভেতর অভিমান জমে ওঠে। কেন বলব? সে কি পারে না, আমি না বললেও আনতে! তিন বছরে এ বাসার অনেক কিছু পাল্টে গেছে। আমি আসার পর বান্ধা যে বুয়াটা ছিল তাকে আম্মা কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন। টাকার অপচয়। আর তাছাড়া বউ বসে বসে করবেটা কী? প্রথম প্রথম আমার হাতের চায়ের বেশ প্রশংসা শুনতাম বিকেলবেলা। এখন সেটা রূপ নিয়েছে বাড়তি খরচে। আর বলেন না ভাবি, বউ আসার পর বাসায় বাড়তি খরচ শুরু হয়েছে।

– কী বলেন ভাবি?

– হুম, প্রতি বিকেলে দুধ চা। দুধ আবার চা পাতা। খরচ কী কম!

চোখ ফেটে জল এসেছিল। আমি বাড়ির বউই রয়ে গেলাম। বাড়তি খরচের বউ। মেয়ে হয়ে উঠতে পারিনি।

কষ্ট হয়। আত্মনির্ভরশীলতা কাকে বলে? দুইটাকার জিনিসও আমি আমার পছন্দে কিনতে পারি না। চাকরি করলে ভাল করতাম। হাতে পয়সা থাকত। সে হবার জো নেই আমার কপালে। বিয়ের আগে যখন দেখতে এসছিল প্রথম শর্তই ছিল, বউ চাকরি করতে পারবে না। বউ চাকরি করবে না, তবে বউয়ের শখ আহলাদ পূরণ করার দায়িত্ব কার! আমার বড়ো পড়ার শখ। বই পড়া আমার নেশার মতন। সময় পেলেই আমি পড়তে বসে যাই।

– বিয়ের পর সংসারে মন দিতে হয়। এসব গল্পর বই পড়লে সংসারের পেট ভরে না।

রাফিদ আসতেই সে কী বকা!

– বলি এসব ছাইপাশ আনিস কেন কিনে? সেজন্যই সংসার হচ্ছে না।

সংসার মানে কী সেটাই এখনো আমি বুঝিনি। বই পড়ার সাথে সংসারের

অনাসৃষ্টি হবার কী সম্পর্ক, আমি তা আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। সব করে আমি শুয়ে বা বসেই কাটাই। বই পড়লে কি সমস্যা!

আমি সবজি কুটে রাখতেই মার আগমন।

– বিন্দু?

– জ্বি আম্মা।

– তাহানকে একবার ভাল ড্রেস পড়িয়ে দাও।

আমি একবার আকাশ হতে পড়লাম। আজ কি মেহমান আসবে নাকি? আম্মাতো আমাকে কিছু বলেনি।

– আম্মা কেউ আসবে?

– না, আমি তাহানকে নিয়ে রোজীদের বাসায় যাব। ছোটমানুষ। ওর বেড়ানোর দরকার আছে। ওর মন ভাল হবে।

আমার বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। আমি তবে মানুষ নই। আমি বউ। আমার মন নেই। সে মনকে ভাল করবার জন্যে বেড়ানোর কোন প্রয়োজন আমার কেন থাকবে? মনে পড়ে রাফিদের কথা। তুমি মেয়েমানুষ তোমার ঘরেই থাকার কথা। বুকের ভেতর চিনচিন করে বাজে কথাটা, মেয়েমানুষ!

আমি বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। দূরে বিল্ডিংয়ের কোন ফ্ল্যাটের জানালা দেখা যায়। জানলায় দেখা যায় কারও মুখ। বুকের ভেতর সমুদ্দুরের ঢেউ ভাঙে। শহরের জানলায় মুখ রাখা অচেনা আরেক মেয়েমানুষের জন্য। হয়ত তারও ডানা মেলে আমার মতই ওড়ার স্বপ্ন ছিল কে জানে! আমি চুপ করে শহরের স্বপ্ন ভাঙা মেয়েমানুষগুলোর জন্য বেদনা অনুভব করি। তবু স্বপ্ন দেখি রাফিদের মতন পুরুষরা একদিন আমাদের স্বপ্নগুলোও দেখবে ওদের চোখ দিয়ে। বুঝবে সাইকেল চলতে হলে একচাকা নয় দুই চাকাই সচল হতে হবে। আমরা মেয়েমানুষরাও একসাথে পথ চলব। আমরা এদিন হয়ত একসাথে করব কোন উৎসব! শুধুই প্রত্যাশা!

Sumaiya Santa / সুমাইয়া সান্তা, Dhaka, Bangladesh

A few days ago I learned from the newspaper that a garment worker has been diagnosed with a disease. But she hid her illness from her husband and her family. She knows, in this case, that her husband and his family will not show sympathy and they may leave her. So, she goes to work, hiding her illness. This news hit me hard. The city's going ahead but the attitude towards women has not changed. This incident inspired me to write about `My City, My Home'.

প্রতিটি শহর হতো যদি নারীর প্রিয় বাড়ি

আমার শহরের দিন-দিন উন্নতি ঘটছে। এ শহরে নারীরাও আজ পিছিয়ে নেই। নারীরা এখানে প্রধানমন্ত্রী, সংসদের স্পিকার, বিশ্ববিদ্যলয়ের উপাচার্য হচ্ছেন, উচ্চ-আদালতের বিচারক হচ্ছেন, সশস্ত্র বাহিনীতেও যোগ দিচ্ছেন। শতাধিক বছর আগে বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন সে আশা আজ পূর্ণ। শহর সমাজের যে উন্নয়ন হচ্ছে দিকে-দিকে তার অংশীদার আজ নারী, পুরুষের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে সেও ভূমিকা রাখছে সার্বিক উন্নয়নে।

যে শহরের উন্নতিতে নারীর অবদান কোন অংশে কম নয় সে শহর নারীকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পরিত্রাণ দিতে পারেনি। যে নারীটি গৃহবধূ সেও যেমন তার স্বামী-পরিবার দ্বারা নির্যাতিত হয়, ঠিক তেমনি চাকুরিজীবি নারীটিও স্বামী-পরিবার দ্বারা নির্যাতিত হয়। অর্থাৎ এ শহর আজ আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে এগিয়ে গেলেও, নারী আজও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে পদানত।

এ শহরের ফ্ল্যাটগুলো বিলাসবহুল; ফ্ল্যাট গুলোর এত জাঁকজমকের মাঝে পরিবারের কর্ত্রীর ইবাদত করার জায়গাটি হয়তো সুনির্দিষ্ট নয়, বেশিরভাগ ফ্ল্যাটেই নারীর রান্নাঘরগুলো সংকীর্ণ, সেখানে আজও রয়েছে কম ভোল্টেজের আলো। এই বিলাসবহুল ফ্ল্যাটগুলো চকচকে করে রাখতেই হয়তো গৃহকর্ত্রীর

পুরোটা সময় চলে যায়; তাই নিজের যত্ন নেওয়ার হয়তো আর সময় থাকে না।

বিনা পারিশ্রমিকেই যে নারী পরিবারের ঝামেলাগুলো সামলে চলে বছরের পর বছর সে কখনোই পারিশ্রমিক প্রত্যাশা করে না। কিন্তু দিনশেষে হয়তো একটু নির্ভরতাও সে স্বামী–পরিবার থেকে পায় না এ শহরে। এ শহরের পুরুষগুলোর অধিকাংশেরই ধারণা সংসারে কী আর এমন কাজ! !

এ শহরের নারীরা এখন আর গৃহকোণে বন্দী নেই; পুরুষের মতো সেও রোজ যায় অফিস ও কারখানায়। কিন্তু তার যাত্রাপথের নিরাপত্তা নেই এ শহরে। গণপরিবহন গুলোতে নারীর করুণ অবস্থার চিত্র সবারই জানা।

এ শহরের অলি–গলিতে রাত জেগে পুলিশেরা টহল দিলেও দিনের আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে সে গলিতে নারী আর নিরাপদ থাকে না। শিশু, যুবতী, বৃদ্ধা যে কোন বয়সের নারীই যে কোন জায়গায় হতে পারে ধর্ষণের শিকার।

এ শহরে নারী আজ অনেক স্বাধীন, অনেক আত্মবিশ্বাসী। স্বাধীন! তবু সে হয় ধর্ষণের শিকার। ধর্ষণের শিকার নারীটির অন্তর্জ্বালার সাক্ষী হয়ে থাকে তার ইট–পাথরে ঘেরা বাড়ির দেয়ালগুলো। বেশিরভাগ সময়ই ধর্ষকের বিচার হয় না। নারী কি আজও শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী রয়ে গেল?

শহরের মানুষগুলো একদম যৌতুকের বিপক্ষে! কিন্তু বিয়ের সময় কনের বাবার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা এখনও নেওয়া হয়।

এ শহরের অনেক পুরুষ শুধু ধর্মের দোহাই দিয়ে এটাই প্রমাণ করতে চায় যে, স্বামী সেবা করলেই পরকালে মুক্তি! কিন্তু এ ক্ষেত্রে ধর্মে স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে যে কতটা নমনীয় হওয়ার বিধিনিষেধ উল্লেখ আছে তা কি পুরুষদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়? স্বামী–স্ত্রী দুজনেই সহযোগিতায় এ শহরের প্রতিটি বাড়ি হয়ে উঠতে পারে শান্তিময়।

অফিস–সংসার–স্বামী–সন্তান সবকিছু সামলে নেয় পরিবারের স্ত্রীটিই। কিন্তু তার দিকে খেয়াল রাখার মতো কেউ কি আছে ব্যস্ত এ শহরে? মাতৃত্বকালীন সময়ে বা অন্য কোনো অসুস্থতায় কয়টা স্বামী তার স্ত্রীর পাশে থাকে? যত অসুস্থই

হোক পরিবারের দায়িত্ব থেকে তার নিস্তার মেলে না মুহূর্তের জন্য।

অনেক নারী তার শারীরিক অসুস্থতার কথা গোপন করে তার স্বামী ও পরিবার থেকে। সে জানে, অসুস্থতার কথা জানলে সামান্য সহানুভূতি তো দূরে থাক উল্টো তাকে পেতে হবে অবহেলা। নারীর যে সুন্দর একটি মন আছে সে মনের যত্ন নেওয়ার কি কোন অবসর আছে এই ব্যস্ত শহরে?

এ শহরে অনেক সময়ই নারী তার পোশাক নিয়ে সমালোচিত হয়। যে মেয়েটা ওয়েস্টার্ন্ ড্রেস পরতে অভ্যস্ত তাকে ব্যঙ্গ করা হয় এই বলে যে, 'এদের জন্যই ধর্ষণের ঘটনা ঘটে'। অনুরূপ ভাবে, পর্দানশীল একটি মেয়েকেও তার পোশাক নিয়েও ব্যঙ্গ করা হয়।

বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত 'রোকেয়া সাখাওয়াত' বহু বছর আগে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'স্ত্রী-লোকের কাজের মজুরি কম'। আজও এ শহরে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর কাজে কম মজুরি দেওয়া হয়। শহর-দেশের সার্বিক উন্নয়নে গার্মেন্টস শিল্পের অবদান অপরিসীম। সেই শিল্পের চালক যে নারী শ্রমিক, সে কতটা ভালো আছে এ শহরে? ঘন্টার পর ঘন্টা পরিশ্রম করেও যে সামান্য মজুরি সে পায় তাতে ব্যয়-বহুল এ শহরে দিনযাপন করতে হয় তাকে অনেক কষ্টে।

ব্যস্ত শহর আরো ব্যস্ত হচ্ছে দিনে দিনে। কিন্তু এই শহরটা কি কখনও নারীর জন্য শান্তির বাড়ি হয়ে উঠবে না? যেদিন এ শহরে নারী আর হবে না নির্যাতিত, নারীকে শুধুমাত্র তার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দিয়ে ভোগ্যবস্তু হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করা হবে না, নারীর প্রতি বন্ধ হবে সকল হিংসা, সেদিন এ শহর হয়ে উঠবে নারীর বাড়ি। যে বাড়িতে মা-বোন-স্ত্রী হিসেবে নারী পাবে তার যথাযথ মর্যাদা, যে বাড়িতে নারীর চিন্তা, চেতনা, কাজ যথাযথভাবে মূল্যায়িত হবে। প্রতিটি শহর যদি নারীর নিরাপদ বাড়ি হয়ে উঠতো! কবে আসবে সে শুভ দিন?

Lina Ferdows Khan / লীনা ফেরদৌস খান, Dhaka, Bangladesh

I was inspired by two things. Firstly, I grew up in a woman-unfriendly city. I found myself a voiceless girl to live my own life since my childhood. It is important to highlight the problems and voice our opinions and be part of the discussion to express our needs just to make changes in the society.

Secondly, Bangladeshi women are at a disadvantage as they face barriers in all aspects of their lives. This is a great opportunity to write about the disadvantages & raise my power and voice through writing.

I'm happy to be part My City My Home, this is indeed a great subject to write the untold stories of the women around me. It took me a great deal of strength & power to write about the women who are experiencing or will experience distresses to live their own life. I would like to change our lives and realities through my writing.

শহরের উপাখ্যান

ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে চুলায় চা বসিয়ে বারান্দার বাগানের শখের গাছগুলোতে পানি দেয় সুমনা, এই সময়টা তার একান্ত নিজের সময়, চা খেতে খেতে প্রতিদিন নিজের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো ডায়েরিতে লিখে রাখে সে। এই ঢাকা শহরে এত মানুষ অথচ খুব কাছের এমন কেউ নাই যাকে নিজের একান্ত কথাগুলো বলা যায়, তাই ডায়েরিতে লিখে রাখে সুমনা।

বারান্দায় একটুকরো কমলা-হলুদ রোদ এসে পড়েছে বোগেনভেলিয়া গাছটায়, ম্যাজেন্টা রঙ আর রোদ মিশে কেমন যেন রোমাঞ্চকর লাগছে, গ্রিলে চড়ুই আর শালিক পাখিদের নাচানাচি, স্বচ্ছ নীল আকাশ, মিষ্টি বাতাস – মন ভরে যায় এমন একটা সুন্দর সকালে।

সকাল সকাল রাস্তা পরিষ্কার করছে সিটি কর্পোরেশনের নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা। টিফিন বাটি হাতে তড়িঘড়ি বলিষ্ঠ পায়ে হেঁটে যাচ্ছে এক ঝাঁক নারী পোশাক শ্রমিক, এপাশের ফুটপাতে পিঠা আর চা বানাচ্ছে আরেক নারী – তাদের কল-কাকলিতে যেন জেগে উঠেছে এই শহর।

ওদেরকে দেখে মন ভাল হয়ে যায় সুমনার, এই সব খেটে খাওয়া নারীদের একটা নিজস্ব গল্প আছে – সংগ্রামের গল্প, এগিয়ে চলার গল্প। সুমনার কোন এগিয়ে চলার গল্প নেই, একই গল্প প্রতিদিন। ইদানীং খুব নিজের মত করে বাঁচতে ইচ্ছে করে, সন্তান–সংসারের বাইরে যদি নিজের একটা পরিচয় থাকতো, ছোটখাটো যা হোক তবুও একান্ত নিজের।

লেখা বেশি দুর এগোল না, কলিং বেল বাজলো, দরজা খুলে দেখে গৃহকর্মের সহযোগী শিল্পীর কপালে বেশ লম্বা একটা কালশিটে দাগ, নিশ্চয় কাল রাতে ওর স্বামী আবার মেরেছে।

এসব নিয়ে ভাবার এখন অবকাশ নাই, সকাল বেলা এই শহরের সব বাড়ির গল্প অনেকটা একই রকম। শিল্পী আটার রুটির খামির করতে করতে তার নির্যাতনের কাহিনী বলছিল, সুমনার চোখ ভরে এলো তবুও দ্রুত হাতে গরম তেলে পিঁয়াজ, মরিচ আর কুচানো আলু ছেড়ে, লবণ–পানি দিয়ে ঢেকে দিল। স্বামীর অফিস, মেয়ের স্কুল তাই তড়িঘড়ি করে রুটি সেঁকা, ডিম পোচ আর আলু ভাজি করে টেবিলে নাস্তা নিয়ে এলো। এভাবে প্রতিদিন রুটি–সেঁকার মত কত নারীর কষ্টের উপাখ্যান ধোঁয়ায় মিলিয়ে যায়।

মেয়েকে রেডি করতে করতে সুমনা ভাবে – এই শহরে মেয়েদের কোন নিরাপত্তা নাই, নিজের কোন জীবন নাই, মেয়েটা যত বড় হচ্ছে, চিন্তাটা তত মাথা চাড়া দিচ্ছে, প্রতিদিন মেয়েকে স্কুলে আনা–নেওয়া করা আরেক কাজ, এই শহরে কোন মেয়েই তো নিরাপদ নয়! আহা! মেয়েটাকে যদি একটা মুক্ত জীবন দিতে পারতো!

মেয়েকে স্কুলে দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফেরে সুমনা, স্কুলের সামনে অনেক মায়েরা সারা দিন বসে রাজ্যের গল্প করে, সুমনার ভাল লাগে না। স্কুল টাইমে ভীষণ ট্রাফিক জ্যাম, তাই হেঁটে বাড়ি ফেরে, তাতে শরীরও ভাল থাকে, এই শহরে মেয়েরা সংসারের ব্যস্ততায় নিজের শরীরের যত্ন নিতে ভুলে যায়। রাস্তার পাশে এক মহিলা একমনে ইট ভাঙছে, পাশেই তার বাচ্চাটি ময়লা একটা আধছেঁড়া কাঁথার উপর শুয়ে হাত পা ছুড়ে অনবরত কেঁদেই চলেছে, কী নির্মম জীবন! সন্তানের জন্য এভাবে কষ্ট করা একমাত্র মায়ের পক্ষেই সম্ভব, ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে যায় সুমনা, আচমকা একটা লোক পিছন দিক থেকে খারাপভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করে দ্রুত সামনের গলির ভেতর ঢুকে যায়, অপমানে–লজ্জায়–ঘৃণায় গা শিউরে উঠে সুমনার।

বাড়ি ফিরেই অনেকটা সময় ধরে গোসল করে, কিন্তু গা ঘিন ঘিন ভাবটা তবুও যায় না তার। সুমনা চুলায় ভাত–ডাল বসিয়ে দিয়ে ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়পোছে লেগে যায়, অনেকটা রোবটের মত, প্রতিটা মুহূর্তের কাজ ছকে বাঁধা, এগিয়ে চলা শহরের সাথে সাথে জীবনও যেন দৌড়ায়, এই শহরের মানুষের কেবল ছুটে চলা। চুলায় গরম তেলে পিয়াজ–রশুন, শুকনা মরিচ–আস্ত জিরে ভেজে ডাল বাগার দিতে দিতে মনে পড়ে যায় এরকম ধোঁয়া ওঠা গরম ডাল–ভাতে ঘি মাখিয়ে মা তাঁকে খাইয়ে দিতেন স্কুলে যাবার আগে। আজ মা–বাবা নেই, তাই আর বাপের বাড়িও নেই, ভাইরা এখন নিজেদের মত সংসার করছে, সেখানে বেশি গেলে তারা ভাবে সম্পত্তির ভাগ চাইতে এসেছে; যে বাড়িতে জন্ম, বেড়ে ওঠা, সেই বাড়িটাতে সে এখন অনাকাঙ্ক্ষিত – ভাবতেই কষ্টে বুকটা ফেটে যায়।

আসলে মেয়েদের নিজের কিছুই থাকে না, ইলিশ মাছের পেটিতে তেল, হলুদ, পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, সরিষা আর রশুন বাটা মাখাতে মাখাতে মনটা হু হু করে উঠে সুমনার। পাশের চুলায় গরম তেলে কাচকি মাছে একটু চালের গুড়ো, পেঁয়াজ কুচি, মরিচ লবণ মেখে বড়া বানিয়ে গরম তেলে ভাজতে লাগল, সারা বাড়ি রান্নার সুগন্ধে মাতোয়ারা।

প্রতিদিন খাবার টেবিলে স্বামীর পছন্দের খাবার সাজিয়ে একসাথে খাবে বলে অপেক্ষা করে সুমনা, কিন্তু খেতে বসে ভীষণ রকম তড়িঘড়ি করে স্বামী, কোনদিন সে বলে না 'আজ কচুর লতি আর চিংড়িমাছটা অসাধারণ ছিল'। সুমনার চোখের কাজল, পাটভাঙা তাঁতের শাড়ী, কপালের ছোট্ট টীপ কিছুই চোখে পড়ে না তার। পাশাপাশি শুয়ে থাকা মানুষ দুটি যেন দুই শহরের বাসিন্দা। বড় বেশি চাঁদ ছোঁওয়ার প্রতিযোগিতা এই শহরে। জীবন রেসে প্রথম হতে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে কত প্রিয় মুখ, কত আপনজন, সেগুলো ভাবার সময় আছে কারও!

অনেক রাত হয়ে গেল এখনো বাড়ি ফিরছে না সুমনার স্বামী, বাচ্চাটা অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে রাস্তায় জলের মাঝে আলোর প্রতিবিম্ব দেখে মনে হয় মেয়েদের জীবনটা এমনই দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। মাঝে মাঝে মনে হয় চারদিকটা রাতের মতই অন্ধকার।

রাতজাগা আলো আঁধারি রুমের নির্জনতা নতুন করে চিনিয়ে দেয় জীবনকে, এই অন্ধকার শহরে স্বামীকে কোথায় খুঁজবে, কার কাছে যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না সুমনা, উৎকন্ঠায় তার গলা শুকিয়ে আসছে, এমন তো কোনোদিন হয় না! সন্ধ্যে থেকে তার মোবাইল ফোনটাও বন্ধ, আজ এত বছরেও এই লোকটাকে ঠিক চিনতে পারলো না, বাড়িতে ফিরে কোন কথাই বলে না। এমন কী কোথায় যায়, কী করে জিজ্ঞেস করলেও বলে না, হয়তো ভাবে ঘরের বউ-এর এত কিছু জানার কী দরকার, ভাত-কাপড় পাচ্ছে এটাই অনেক।

জানলা গলে নিয়নবাতির মায়াবী আলো এসে পড়ে তার ছোট্ট মেয়েটার মুখে, এতটুকু শরীরে কত্তো মায়া, চারপাশের নিকষ অন্ধকারেও যেন বেঁচে থাকার আলো দেখায়। অস্থির ভাবে আবার এসে জানালায় দাঁড়ায়, সামনের লাইট পোষ্টের নিচে এক রাত পসারিণী আর দুজন লোকের কথা কাটাকাটি, ধস্তাধস্তি হচ্ছে, মেয়েটিকে চোখের সামনে নির্যাতিত হতে দেখেও কিছু করতে পারলো না সুমনা, কী করবে সে! মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় তার, কেমন যেন প্রাণহীন পুতুল

মনে হয় নিজেকে, স্বামীর পছন্দে নিজেকেও বদলে ফেলতে হয়েছে, এই শহরে তার দৌড় ওই মেয়ের স্কুল, আশেপাশের ছোটখাটো মার্কেট পর্যন্ত। ঘরকন্না ছাড়া অন্য কিছু করা স্বামী পছন্দ করেন না, সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এই পোড়া সংসারে পড়ে আছে সুমনা।

যত রাত বাড়ছে ততই উৎকন্ঠা বাড়ছে, দূরে কোথায় যেন কুকুরের গোঙানি, বুকটা অজানা আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে, ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে এই অন্ধকার রাতে স্বামীকে কোথায় খুঁজবে! এত রাতে কেউ জেগে নেই, এই শহরও নিরাপদ নয়। অনবরত পুলিশ ষ্টেশনে ফোন করছে কিন্তু তারাও ধরছে না, উৎকন্ঠায় আর্তনাদ করতে ইচ্ছে করছে।

এত বছর থাকার পরও আজ এই শহরটাকে একেবারেই অচেনা মনে হচ্ছে সুমনার রাতটাও যেন অন্ধকারের চেয়ে আজ বেশি গভীরতর...

হঠাৎ দরজায় কলিংবেল, দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লো সুমনা।

Lina Ferdows Khan / লীনা ফেরদৌস খান, Dhaka, Bangladesh

I was inspired by two things. Firstly, I grew up in a woman-unfriendly city. I found myself a voiceless girl to live my own life since my childhood. It is important to highlight the problems and voice our opinions and be part of the discussion to express our needs just to make changes in the society.

Secondly, Bangladeshi women are at a disadvantage as they face barriers in all aspects of their lives. This is a great opportunity to write about the disadvantages & raise my power and voice through writing.

I'm happy to be part My City My Home, this is indeed a great subject to write the untold stories of the women around me. It took me a great deal of strength & power to write about the women who are experiencing or will experience distresses to live their own life. I would like to change our lives and realities through my writing.

নিস্তব্ধতা

রাতের নিস্তব্ধতা আমাকে আটপৌরে গল্প শোনায়

নীহারিকা-লোকে হারিয়ে যাওয়া কত প্রিয় মুখ

অন্ধকারে মেঘদের গাল ছুঁয়ে খসে পড়া

তারার শিখণ্ডিত মুন্ডু, রক্ত জমাট দেহ,

পড়ে থাকে নর্দমায়।

জন্মান্ধ শিশুর ডুকরে কেঁদে ওঠা তমসা এই শহরে

অনন্ত মধ্যরাত নামে

ঘামে ভেজা নোংরা আঁচলে,

লাল-নীল রাতপরীরা ঝলমলে বিষাদের সওদা শেষে

দুমুঠো ভাত রাঁধে, নগর-সরণির নিয়ন জ্যোৎস্নায়।

ইট-শ্যাওলার ভিটে হারিয়ে
কারা যেন অন্ধকারে হারায়
খোলা ছাদে এখনো ভেজে ছেঁড়া শাড়ী, পুরনো আচার।
বৃদ্ধ বাবার কঙ্কালসার হাত
খুঁজতে থাকে শেকড়,
ব্যাধিঘোর জননী চোখ মেলে পথ্যের অপেক্ষায়।

মৌন মুখর রাত্রির নির্মম মায়াবী গল্প সযত্নে তুলে রাখি
মনের নীল নকশায়
সময়ের গ্রন্থি থেকে হারাবে না অসীমের জনাকীর্ণ নিস্তব্ধতায়।

Raushan Ara Mahmuda / রওশন আরা মাহমুদা, Dhaka, Bangladesh

এই শহরে জন্ম থেকে আমার বসবাস। শহরের ভালো মন্দ আমার কাছে নিজের ভালো মন্দের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। একজন নাগরিক হিসেবে প্রতিদিন চলার পথে নানারকম অসঙ্গতি চোখে পড়ে, যা হয়তো আমার একার পক্ষে নিরসন করা সম্ভব নয়। যদি এই লেখাটি কাউকে উজ্জীবিত করে আর তিনি এই শহরকে বদলাতে বদ্ধপরিকর হোন, তবেই হবে লেখাটির সার্থকতা।

যে শহরে বসত আমার

আমার শহর ঢাকা শহর। এ শহরে পঞ্চাশ বছর ধরে বসবাস করছি আমি। এমন এক ঘনবসতিপূর্ণ শহরে বাস করছি আমি, যেখানে আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক বেশি। প্রাণের শহর হলেও এটি পরিকল্পনাহীন, এলোমেলো একটি শহর। হালের নতুন ক্রেজ মেট্রোরেল চালু হলে আরো বেশি মানুষ এ ঢাকায় থাকার জন্য চলে আসবে।

আমি আমার শহরকে ছোট করছি না, দ্রুতই উন্নয়ন হচ্ছে এ শহরে, যা দেখতে ভালো লাগে। পাশাপাশি, প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতোই এখানে লুকিয়ে আছে যানজট, সরু ফুটপাথ, ধারণের অতিরিক্ত জনসংখ্যা, বর্ষাকালের উপচে পড়া ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বাড়িঘর বঞ্চিত শিশু, পানির হাহাকার, গ্যাস-বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও অপরিকল্পিত বৈদ্যুতিক তারের জট ইত্যাদি।

খুব আশা নিয়ে থাকি আমি, একদিন ঢাকা আদর্শ শহরে পরিণত হবে, হওয়ার মতো সব জিনিসই এর মধ্যে আছে। কিন্তু অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে ওঠার কারণে আর সঠিক পরিকল্পনার অভাবে বারবার সংস্কারের পদক্ষেপ নিতে হয়।

গাছপালা বিহীন শহরের অক্সিজেন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট আর হাতেগোনা কয়েকটি এলাকা ছাড়া কোথাও সবুজের কোনও রেশ নেই। অথচ সবুজের সমারোহ ছাড়া বেঁচে থাকা কষ্টকর। পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় গাছপালা এই শহরে নেই বললেই চলে। ভবনগুলোর একটা বড় অংশ অপরিকল্পিতভাবে তৈরি। সেগুলো পরিকল্পিতভাবে তৈরি হলে ভূমিকম্পে ক্ষতির ঝুঁকি কমে যেত। বেশিরভাগ

ভবনের সাথে লাগোয়া খালি জায়গা নেই, সেকারণে আগুন লাগলে দমকল বাহিনী সহজে ঢুকতে পারে না, সামান্য আগুনেই প্রাণ ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। শিশুদের খেলাধুলার জায়গা নেই, ভবনগুলোর সামনে এমন ফাঁকা জায়গাও নেই, যেখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যায়। আমাদের সকাল-বিকাল হাঁটা বা শরীরচর্চার জন্য সামান্যতম জায়গাও পাওয়া যায় না। চারদিকে শুধু ভবন আর ভবন। কংক্রিটের বিল্ডিং এর কারণে একটুখানি ফাঁকা জায়গা নেই যে দুটো গাছ লাগানো যায়। ভূমিকম্পেও তাই কোথাও নিরাপদে সরে যাওয়ার উপায় নেই।

অতিরিক্ত যানবাহন আবহাওয়াকে দূষিত করে তোলে। ব্যক্তিগত গাড়িতে চড়ার সৌভাগ্য আমাদের অনেকের হয় না কিন্তু গণমানুষ হিসেবে বায়ু দূষণের শিকার হচ্ছি প্রতিনিয়ত। অবশ্য যাঁরা ভিআইপি, এতে তাঁদের কোনো সমস্যা হয় না, তাঁরা এসি রুম থেকে বেরিয়ে এসি গাড়িতে ওঠেন, প্রয়োজনে রাস্তাও বন্ধ রাখা হয় তাঁদের যাতায়তের জন্য। যত সমস্যা হয় সব জনসাধারণের। যানজটের কারণে মানুষের স্বাভাবিক কর্মকান্ড বাধাপ্রাপ্ত হয়, প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমঘন্টার অপচয় হচ্ছে, যার চাপ পড়ছে অর্থনীতিতে। লক্ষ লক্ষ টাকার জ্বালানি পুড়ছে। মুমূর্ষু রোগী বহনকারী অ্যাম্বুল্যান্সকে থামতে হচ্ছে। পত্রিকার পাতা খুললেই আমরা দেখতে পাই দুর্ঘটনার খবর, কোথাও বাসে-ট্রাকে, কোথাও বাসের সাথে বাস, বাস-টেম্পো আবার কোথাও রিকশা বা নিরীহ পথচারীকে চাপা দেয় দ্রুতগামী বাস ট্রাক, কেড়ে নেয় তাজা প্রাণ।

এবার আসি শব্দদূষণের বিষয়ে, কিছু উচ্ছৃঙ্খল গাড়িচালক আর মোটরসাইকেল চালকের যত্রতত্র হাইড্রোলিক হর্ন এর উপদ্রব আর গগনবিদারী শব্দ খুবই বিরক্তিকর। রাজপথে ট্রাক চলাচলের জন্য কোন আলাদা লেন নেই, অথচ ট্রাক হচ্ছে বিপজ্জনক গাড়ি। প্রতি বছর বাস ট্রাক সংঘর্ষে বহু তাজা প্রাণ ঝরে যায়।

শহরের নিম্নবিত্তদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গার্মেন্টস শ্রমিক। যত্রতত্র ভাবে গড়ে ওঠা ফ্যাক্টরিগুলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আওতায় আনতে পারলে শহরের কর্মব্যস্ততা ও চাপ লাঘব হবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরের উন্নয়ন করলে ঢাকা শহরের উপর চাপ কমবে, তখন আমার বাড়ি তথা আমার শহর থাকবে আরও সুন্দর। ভালো মন নিয়ে দেখলে সবকিছুই ভালো লাগে। ঢাকা শহরের যে পরিমাণ জনবল, যে পরিমাণ সম্পদ আছে তা বিশ্বের অনেক উন্নয়নশীল দেশে নেই।

দৃষ্টিনন্দন পার্ক ও মাঠের অভাবে আমাদের শহরের তাপমাত্রা কমছে না। ঢাকা শহরের চারপাশে সুন্দর জলপথ নির্মাণ করলে এ শহর আকর্ষণীয় এক শহর হিসেবে গড়ে উঠতো। নবনির্মিত ফ্লাইওভার গুলোতে বিদেশের মতো সুন্দর রং থাকার পরিবর্তে দেখতে পাই পিলারগুলোতে আজেবাজে দৃশ্য সম্বলিত নানা পোস্টারের সমাহার। দেয়াল-লিখন, চিকামারা ইত্যাদিও দৃষ্টিকটু।

বিদ্যুতের প্যাঁচানো তারের জঞ্জাল আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য। মাটির নিচে তারের সংযোগ স্থাপন হলে দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে, রাস্তা ও ঘরবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে কয়েকগুন। ইন্টারনেট কেবল্ও কম দৃষ্টিকটু নয়।

আবাসিক এলাকাগুলো থেকে রাসায়নিক গুদাম ও প্লাস্টিক কারখানা স্থানান্তরিত না করলে এ শহর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। পাদচারী সেতুগুলো উঁচু করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। লেকের পাড়ে বাঁধাই করে ওয়াকওয়ের মত করে তৈরি করলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে বহুগুন।

নানা ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এ শহরে বিরাজমান। নারীরা আজ শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হতে চাইছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে পুরুষের জন্য সুযোগ-সুবিধা ও উদার মানসিকতা যতটুকু আছে নারীর জন্য ততোটুকু নেই। নারী শিক্ষায় একটি বিশেষ বাধা হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। অনেক অভিভাবক তাঁদের কন্যাসন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাঠাতে ভয় পান। এর সাথে রয়েছে চরম দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ থেকে বিপুল জনসাধারণকে মুক্ত করতে না পারলে শুধু শিক্ষাই নয়, শহরের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনাও ব্যর্থতায় পর্যবাসিত হবে।

যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলে আমরা শহরের সৌন্দর্য ম্লান করে করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার দৃশ্যও লজ্জাজনক, যাতে দুর্গন্ধময় হয়ে যাচ্ছে শহরের জীবন।

তবে, যে যাই বলুক, যতই বসবাসের অযোগ্য হোক, এই শহরে আমার বাড়িতে আমার বেড়ে ওঠা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সাথেই জড়িয়ে আছে এই শহরের এই বাড়ি। আমার আশা, একদিন ঢাকা শহর হবে সবুজের শহর, গাছ-গাছড়ার শহর, নির্মল বাতাস ও শান্তির শহর।

শহরের পরিবেশ রক্ষায় আমাদের করণীয়ঃ

- বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেটের তার মাটির নিচে স্থাপন করতে হবে।

– প্রত্যেকটি বাড়ির ছাদে ছাদকৃষি বাধ্যতামূলক করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনে সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতা কাম্য।

– ময়লা ফেলার জন্য কিছুদূর পরপর ডাস্টবিন দেওয়া দরকার।

– রিকশা তুলে দিয়ে ব্যাটারি–চালিত মিনি অটো রিক্সা চালু করা দরকার।

– ফুটপাথগুলো অন্তত পনেরো ফুট চওড়া করা দরকার।

– ফ্লাইওভারগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে স্থায়ী রং করা দরকার।

– যত্রতত্র পোস্টারিং, দেয়াল লিখন নিষিদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

– ঢাকা শহরের চারদিকে সুন্দর ও নিরাপদ জলপথ করলে জলাবদ্ধতা কমবে, শহরের তাপমাত্রা কমবে।

– মেইন রোডে রিকশা বন্ধ করে দিয়ে শুধু ছোট গলিতে চালু করা।

– স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প এর মতো প্রকল্প চালু করা, যাতে সাধারণ মানুষ সকলেই চিকিৎসাসেবার আওতায় আসে।

– অপ্রয়োজনে গাড়ির হর্ন বন্ধ করতে নো হর্ন জোন বিধিমালা ২০০৬ আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

– আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম ও প্লাস্টিক কারখানা স্থানান্তরিত করতে হবে।

– সকল আবাসিক ভবন ও প্রতিষ্ঠানে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

এ শহরের সাথে জড়িয়ে আছে আমার শৈশব কৈশোরের স্মৃতি। চারপাশে ঘটে যাওয়া সমাজের নানা সমস্যা, জীবনযাপনের সঙ্গতি অসঙ্গতি সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শহরের তথা নিজ বাড়ির উন্নয়ন প্রকল্পে বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি ও মতামত জানাতে পেরে আমি গর্ববোধ করছি। এত সমস্যার পরও আমার শহর, আমার বাড়ি আমার ভালো লাগে। খুব ভালোবাসি আমার শহরকে।

Fatema Israt Juthi / ফতেমা ইসরাত যুথী, Dhaka, Bangladesh

To write this story, existing social pattern and inequality between women and men influenced me. By the pace of globalisation, society is changing fast and both village and city are influenced by it.

Especially, women of the city bear the actual brunt of life. The proliferation of the theory of individualism has inspired women to be self-dependent. But still, women are bound to take their husband's title.

নমিতা

রবিবার, ১৩ ই মার্চ ২০১৬

আমি এখন ঢাকায়। গত দুদিন আগে আমি এই নতুন বাসায় উঠেছি। 'আমি' শব্দটা লেখা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না। বরং লেখা উচিত 'আমরা'! কারণ নমিতা এখন বিবাহিত! বিয়ের পর মাত্র একদিন শ্বশুরবাড়ি ছিলাম, তারপরই আবার কাজের শহরে ছুটে এলাম।

গত দুদিন কেটেছে শুধু ঘর গোছগাছ করেই। ডায়েরি লেখার একদমই সময় পাই নি। অথচ ডায়েরির অর্থ – Dear I always remember you! যাই হোক বিয়ের পর এটাই আমার প্রথম ডায়েরি আর আজ প্রথম কিছু লিখলাম। আমার মনের যত কথা, সারাদিনের যত ক্লান্তি, অভিযোগ আর অনুযোগ সব বলি ডায়েরিকে। সে কখনোই বিরক্ত হয় না। এই বিশ্বায়নের যুগে এরকম বন্ধু পাওয়া সত্যিই কঠিন! ডায়েরিতে আমার নতুন প্রেমিক–স্বামী-বন্ধু সম্পর্কে কিছুই লেখা হয়নি।

আমার স্বামী বিয়ের আগে ছিল শুধুই প্রেমিক আর বন্ধু। প্রত্যয়ের সাথে আমার পরিচয় অফিসে। আমরা কলিগ ছিলাম। তবে এখনো আমরা কলিগ! খুব অদ্ভুত–অসাধারণ–আনসোশাল ছিল প্রত্যয়। ভ্যালেন্টাইন্টস ডে কিংবা নিউ ইয়ারে ওকে কখনো

ইনফরমাল পোশাকে দেখা যায়নি। লিফটে কেউ হাই বললে সে শুধু হ্যালোটুকুই বলতো। আর আমি ছিলাম ওর সম্পূর্ণ বিপরীত। ঠিক কীভাবে যেন ওর সাথেই আমার প্রেমটা হয়ে গেল!

একবার সেন্ট মার্টিনে অফিস ট্যুরে গিয়েছিলাম। সেদিন আমি স্কাই ব্লু গাউন পরে, খোলা চুলে, জীবনানন্দের ধূসর পান্ডুলিপি হাতে নিয়ে বিচে হাঁটছিলাম। ওই দিন আমাকে নাকি ওর খুব অদ্ভুত লেগেছিল। তারপর সমুদ্রের পাড়ে নক্ষত্রের তলে অনুভূতি জানাজানি; তারপর প্রেমের কত দিন–রাত পার হলো। দু বছর পর আমরা বিয়ে করি।

কাল থেকে আবার অফিস শুরু। এতদিন মেসে বুয়া ছিল, সে রান্না-বান্না করতো আর কাল থেকে হাঁড়ি সামলাতে হবে আবার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আর প্রেজেন্টেশনের কাজও করতে হবে!

সোমবার, ১৪ ই মার্চ ২০১৬

কাল ছিল আমার বিয়ের পর প্রথম অফিস। আমি আর প্রত্যয় একসাথেই অফিসে গিয়েছিলাম। সহকর্মীরা ছোটখাট একটা সংবর্ধনার আয়োজন করেছিল। সব কিছুই দারুণ উপভোগ্য ছিল। কিন্তু কেকের উপরের মিঃ এন্ড মিসেস হাসান নামটি যেন আমায় অফিস থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল।

কি অদ্ভুত সমাজ আমাদের, বিয়ের আগে একটি মেয়ের পরিচয় হয় তার বাবা, বাবা না থাকলে ভাই কিংবা চাচা অথবা বাড়ির পুরুষদের পরিচয়ে। আর যখন বড় হয় তখন তার পরিচয় হয় স্বামী। অথচ স্বামীকে কখনো স্ত্রীর নামের পদবী ব্যবহার করতে দেখা যায় না। দিনটা খুব খারাপ কেটেছে। আজ আর লিখতে ইচ্ছা করছে না।

রবিবার, ২০শে মার্চ ২০১৬

বহুদিন পর ডায়েরি লিখতে বসলাম। লিখতে ইচ্ছা করে না। কিছুই ভালো লাগে না। সবকিছু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে একটা পরিবর্তন আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। অফিসের সবাই আমাকে মিসেস হাসান বলে সম্বোধন করছে। অথচ আমি একজন ইনডেপেন্ডেন্ট উইম্যান। সবচেয়ে বড় কথা আমি

একজন ইনডিভিউজ্যুয়াল পারসন আর আমার একটা নাম আছে।

সেদিন রাতে প্রত্যয়কে বলছিলাম, সহকর্মীদের দেয়া নতুন নামটা আমার পছন্দ হয়নি। ও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, "বেশ তাহলে কানে নিও না, তোমার পছন্দের না এটা সরাসরি বললে হয়ত ওরা তোমাকে দাম্ভিক ভাবতে পারে। সবচেয়ে ভালো হয় গায়ে না লাগানো।"

আমি সবকিছুই বুঝতে পারছি। জানি সমাজটাকে একদিনে পরিবর্তন করতে পারবো না। এও জানি এই সমাজে মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দের কোনো মূল্য নেই।

বুধবার, ৩০শে মার্চ ২০১৬

আজ সকালে রান্না করিনি। প্রত্যয় অনলাইনে অর্ডার করে খাবার আনিয়েছে। কোনো কিছুতেই ইদানিং মন লাগে না। নিজেকে কেন জানি মৃত বাতাসের সাথে তুলনা করতে ইচ্ছা করে। সারাদিন ছুটে চলছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি নিস্তেজ আর প্রাণহীন। ভাবছি আজ রাতের ডিনারটা আমি আর প্রত্যয় বাইরে করবো।

শুক্রবার, ১লা এপ্রিল ২০১৬

আজ বহুদিন পর আমি আর প্রত্যয় পার্কে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণের জন্য আমরা পুরানো সেই দিনগুলোতে ফিরে গিয়েছিলাম। ভয়ে ভয়ে সেই স্ট্রিট ফুড খাওয়া, দুজনে চোখে চোখ রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা, বসন্তকালের বাতাসে স্নান করা আর চাঁদের আলোতে ভিজে যাওয়া!

সত্যিই বহুদিন পর একটু ভালো সময় কাটালাম। এখন রাত বারোটা বাজে। প্রত্যয় ঘুমাচ্ছে আর আমি ওর পাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দিনটাকে কাগজে বন্দী করছি। ভাবছি কাল কিছু গাছ কিনে বারান্দায় লাগাবো।

বৃহস্পতিবার, ৭ই এপ্রিল ২০১৬

আমার বিয়ের প্রায় একমাস হতে চললো। এই একমাসে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে। আমার বাসা থেকে নাম অবধি চেঞ্জ হয়েছে। কিছু পরিবর্তন আমি মেনে নিইনি কিন্তু

মানিয়ে নিয়েছি। এই একমাসে আমার যোগাযোগের পরিমাণ বেড়েছে। সপ্তাহে একদিন গ্রামের বাড়িতে ফোন করি। শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ সবার সাথে কথা বলি।

তবে প্রত্যয়, প্রত্যয়ই আছে। ওর নাম এখনো প্রত্যয়। আর ওর যোগাযোগের পরিমাণ বাড়েনি। ও কখনো আমার বাবা–মায়ের সাথে যোগাযোগ করে না। ভাবছি একটা নিজের কমফোর্ট জোন তৈরি করবো। একটু নিজেকে সময় দিতে হবে। নাহলে হয়ত নমিতা একদিন ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাবে।

সোমবার, ১০ই এপ্রিল ২০১৬

সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। আজ অফিসে যাইনি। আমি জানালার পাশে বসে ডায়রিতে শব্দ বন্দী করছি আর গত রাতের কথা ভাবছি।

প্রত্যয় এখনো আমার সাথে হানিমুনে যাওয়া নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি অথচ গতরাতে ও আমাকে বেবি কনসিভ করার পরামর্শ দিল। ইদানিং ওর আচরণ খুব অদ্ভুত লাগে। কিন্তু বিয়ের আগে ও এরকম ছিল না। আমাকে বহুদিন বলেছে বিয়ের পর প্রথম হানিমুন হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর গ্রামে। বেবি নিতে আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার একটু সময় দরকার নিজের জন্য। এত দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাইছি না। আমি এখনো মানসিকভাবে স্থিতিশীল নই। হঠাৎ কেন জানি মনে হচ্ছে আমি অন্য কোনো গ্রহে এসেছি।

বাসার সামনে গাড়ির জ্যাম। স্কুলের ছেলে মেয়েরা ছাতা মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরছে। অবিরাম বৃষ্টির ধারা শুষ্ক পৃথিবী শুষে নিচ্ছে। সবকিছুই চলমান মনে হচ্ছে আমি আর ট্রাফিকজ্যামে পড়া গাড়ীগুলো নিশ্চল।

সোমবার, ১৭ ই এপ্রিল ২০১৬

আজ সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে দেখি দোলনচাঁপা গাছে শ্বেতশুভ্র ফুল ফুটেছে। ফুলগুলোকে একটু আদর করে মৌরলা মাছের ঝোল রাঁধলাম। প্রত্যয় এখনো ফেরে নি। এখন মনে হচ্ছে প্রত্যয় আসলে বন্ধু আর কলিগ হিসেবেই ভালো ছিল। স্বামী মানেই সেই ক্ষমতাসীন কেউ। ও এখন আর আগের মত আমার দিকে কাজের ফাঁকে মিষ্টি করে তাকায় না কিংবা কফি খেতে যাওয়ার কথাও বলে না।

নিজেকে কেন জানি মনে হয় মেশিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে রান্না-বান্না, এরপর অফিসে যাওয়া, ঢাকার জ্যাম মাড়িয়ে বাসায় এসে আবার রান্না করা, আর তারপর স্বামীর আবদার বেবি কনসিভ করার। তারপর মলিন মুখে ঘুমাতে যাওয়া।

ভাবছি একটু নিজেকে ছুটি দেব। একটু রবীন্দ্রসংগীত শুনবো আর জীবনান্দের কবিতা পড়বো।

শনিবার, ২৩শে এপ্রিল ২০১৬

গতকাল আমার জন্মদিন ছিল। প্রত্যয় ভুলে গিয়েছিল। আমি এখন কক্সবাজারে। হোটেলের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখছি। আসার আগে একটা মেসেজ লিখেছিলাম প্রত্যয়কে। এখনো উত্তর দেয়নি। মেসেজটা ছিল:

প্রিয় প্রত্যয়,

জানো, তুমি অনেক বদলে গেছো। আমি জানি তুমি চাও আমাদের বেবি হোক। আমিও চাই, তবে এটা চাই না যে, আমাকে কেউ অমুকে-তমুকের মা বলে সম্বোধন করুক। আমি আমার নামকে ভালবাসি। তবে হ্যাঁ, সমাজকে আমি রাতারাতি পরিবর্তন করতে পারবো না। ফিরে আসবো শীঘ্রই আর মা হবো। নিজের খেয়াল রেখো।

ইতি,

নমিতা।

Nasreen Meghla / নাসরিন মেঘলা, Chattogram, Bangladesh

This competition aims a theme 'My City, My Home', which is very close to my heart. My city has always been a center of my emotion and affection. So, when I get to know about this competition I take the chance as a privilege to share my memories with my cities.

আমার চেনা শহর

আমার শহর চট্টগ্রাম, একটি মনোমুগ্ধকর শহর যাকে ঘিরে রয়েছে আমার অনেক স্মৃতি। হাঁটি হাঁটি পা পা করে বেড়ে ওঠা এই শহরে আমার স্কুলের গণ্ডিতে পদার্পণ পূর্ব নাসিরাবাদ এ. জলিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাধ্যমে। শুরুতে মায়ের হাত ধরে স্কুলে যেতাম। অল্প সময়েই অবশ্য একা একা স্কুলে যেতে শিখে গিয়েছিলাম। স্কুলের খোলামেলা পরিবেশ, চারিদিকের পরিবেশ সবুজাচ্ছন্ন। নতুন বন্ধুবান্ধব, নতুন শিক্ষক, নতুন জামা পরে স্কুলে যাওয়ার মজাটাই ছিল অনেক আনন্দের। সকলের সাথে খেলাধুলা, দৌড়-ঝাঁপ করে অনেক আনন্দের সাথে সারাবেলা পেরিয়ে যেত। বন্ধুদের মধ্যে হীরা, ঝুমা, মায়া, রনি আর মেহেদীর সাথে প্রতিযোগিতা চলত বেশি। কে প্রথম হবে, কার চেয়ে কে বেশি নম্বর পাবে, এসব নিয়েই আমাদের খুনসুটি লেগে থাকত। স্কুলের শিক্ষকরাও বন্ধুসুলভ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখতেন।

আমাদের সময়ে আমরা যতটা আনন্দের সাথে দিনটা পার করতাম, এখন আর আগের মত তা হয় না। পুরনো শিক্ষকরা আর নেই; নেই পাঠদানে সেই আন্তরিকতাও। বাচ্চারাও স্কুলে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এখন আর শিশুদের মাঝে জ্ঞানার্জনের আনন্দময় সেই প্রতিযোগিতা নেই। অট্টালিকার ভিড়ে চাপা পড়ে গেছে ছেলেবেলার খেলার মাঠগুলোও। চারিদিকে শুধু ইটকাঠের জঙ্গল।

শহরের এ জীবনটা আমার কাছে অন্যরকম আনন্দের মনে হয়। এ শহরে কাটানো প্রতিটি দিনই আমার জন্য নিয়ে আসে নতুন নতুন স্মৃতি, ভালো লাগার কিছু অনুভূতি।

সাধারন দিনগুলোও হয়ে ওঠে অনন্য, আর বিশেষ দিনগুলো হয়ে ওঠে স্মৃতিময়। ছোট্ট একটা উদাহরন দেই। কদিন আগেই ছিল মহান বিজয় দিবস। প্রতিবছরই বিজয় দিবসে সকালবেলা আমার খুব প্রিয় দৃশ্য হলো আশেপাশের মানুষজনকে ছাদ কিংবা অলিগলি পতাকা দিয়ে ছেয়ে ফেলতে দেখা। আমি নিজেও সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে লাল সবুজ শাড়ি পড়ে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে যাই। লাল-সবুজের এই দিনটি আমার জন্য হয়ে ওঠে বর্ণিল।

আরও একটি দিন আমি অন্যরকমভাবে পালন করি, তা হলো বিশ্ব ভালবাসা দিবস। এই দিনটি সবাই পালন করে তাদের ভালবাসার মানুষের সাথে, আর আমরা ক'জন দিনটা পালন করি পথশিশুদের সাথে। এই দিনটায় আমরা তাদের জন্য দুইবেলা খাবার আর তাদের সাথে খেলাধুলা করে কাটাই। তাদের হাস্যোজ্জ্বল মুখে যখন মিষ্টি রোদ ঝলমল করে, তখনই মনে হয় সত্যিকারের ভালবাসা সহজ হলেও কতটা দুর্লভ।

শহরের শীতের সকালটা অনেক সুন্দর হয়। সকাল বেলা কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থায় কনকনে কাঁপুনিতে শীতের চাদর গায়ে দিয়ে রোদ পোহানো, কিংবা সন্ধ্যাবেলায় মুরুব্বিদের চায়ের আড্ডা। রাস্তার ধারে ছোট বড় ভ্রাম্যমান পিঠার দোকানে হরেক রকমের পিঠা আর চলতি পথে পিঠার জন্য দাঁড়িয়ে পড়া মানুষের ভিড়। আবার রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে তাপ পোহানো, ব্যাডমিন্টন খেলা। এই ছোট ছোট আনন্দগুলো নিয়েই শহরে থেকেও শীতের কুয়াশায় ডুবে থাকতে ভালো লাগে।

সাগরপাড়ের শহর আমাদের চট্টলা। সাগরের বিশালতায় আর মনোরম পরিবেশে গেলে মনের জানলা দিয়ে যেন এক ঝলক সতেজ বাতাস ছুটে আসে। সাগরপাড়ে বিশাল বিশাল পাথরের খন্ড দিয়ে বাঁধ দেয়া; সমুদ্রবিলাসিরা পাথরের উপর বসে আড্ডা দেয়, গান করে, সূর্যাস্ত দেখে। সাগরপাড় থেকে একটু পথ হেঁটে গেলেই সামুদ্রিক খাবারের পসরা সাজানো দোকান। সন্ধ্যা নামতেই চারিদিকে আলো ঝলমল করে উঠে, শুরু হয়ে যায় উৎসবের আমেজ। আর দূরে ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠা শুরু করে ভেসে থাকা জাহাজের আলো। দূরে জাহাজের মিটমিট আলো, সন্ধ্যা তারা, কনকনে ঠান্ডা বাতাস সাথে মশলাদার কাকড়া, এই পরিবেশটা ভোলার মতো

নয়। খুব খারাপ লাগে যখন দেখি একটু পরপরই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আইসক্রিম, চা-কফি বিক্রি করতে আসে। ওরা সকালে স্কুলে যায়, আর বিকেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফুচকা, চটপটি, চা, কফি বিক্রি করে; এটাই ওদের পরিবারের রোজগার। জোয়ারের সময় সাগরপাড়ের সৌন্দর্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, বিশেষ করে গোধূলি লগ্নে যখন সূর্যটা সাগরের বুকে ডুবে যায়, সেই সময়টা অনেক বিশেষ কিছু হয়ে ধরা দেয় আমার চোখে।

এ শহরের মানুষ অনেক অতিথিপরায়ণ। আমার শহরের মেজবানি অনুষ্ঠানের খ্যাতি রয়েছে দেশজুড়ে। সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ এই মেজবানির দাওয়াতে আসে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ থাকে ঝাল গরুর গোস্ত আর সাদা ভাত। চট্টগ্রাম পর্যটন নগরী, উঁচুনিচু পাহাড়ী টিলায় সাজানো এই শহরে রয়েছে সবুজের সমারোহ। এ শহরের আনাচেকানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে আমার অনেক গল্প, যা আমাকে সবসময়ই গর্বিত করে। আর এই ছোট ছোট গল্পগুলোই আমাকে এ শহরের সাথে এক মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে।

Suborna Akter / সুবর্ণা আক্তার, Netrakona, Bangladesh

I thought that I should write about my surrounding. Because, when I share my feelings, I feel comfortable. So, when I saw a theme of name 'My City My Home', I decided to write something about my city.

বাবার বাড়ি ও স্বামীর বাড়ি আছে, কিন্তু নারীর নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই

'আমার শহর, আমার বাড়ি' বলতে খুব ভালো লাগে। কিন্তু আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সামাজ ব্যবস্থায় একজন নারী হয়ে বুক ফুলিয়ে আমি এটি বলতে পারছি না। কারণ একজন নারীর যে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই! বিয়ের আগে বাবার বাড়ি আর বিয়ের পরে স্বামীর বাড়ি। জীবনের একটা অংশ বাবার পরিচয়ে আরেকটা অংশ স্বামীর পরিচয়ে কাটিয়ে দেয় একটা নারী। নিজ পরিচয়ে সে প্রকাশিত হতে পারে না। পরিচয় দেওয়ার জন্য তার দু'টো বাড়ি থাকে। এক হলো বাবার বাড়ি আর দুই স্বামীর বাড়ি। কিন্তু তার নিজের কোনো বাড়ি নেই। তাই 'আমার শহর, আমার বাড়ি' নিয়ে আমি কী লিখব? তবে হ্যাঁ, আমি যেখানে থাকি, যে শহরে থাকি তা নিয়ে লিখতে পারি। কাগজ ও কলম আমার সব থেকে ভালো বন্ধু। তাকে আমি নিঃসংকোচে সব বলতে পারি। আমি যা বলি এই সাদা কাগজ যেন সব কিছুই বুঝতে পারে, বুঝতে পারে আমার অনুভূতিগুলো। তাই আমার যখন খুব মন চায় আমার কষ্টের অনুভূতিগুলো শেয়ার করে হালকা হতে, তখন আমি ডায়েরি আর কলম নিয়ে বসি। তবে এটা খুব কম সময়ই হয়। কারণ আমি খুব চাপা স্বভাবের। নিজের কষ্টের অনুভূতি কেন জানি ডায়েরি ছাড়া কারো সাথে শেয়ার করতে মন চায় না।

আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্নালিজম & মিডিয়া স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে তৃতীয় বর্ষে পড়ছি। আমার বাবা বি.এ পর্যন্ত পড়েছেন আর মা ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। আমার দাদা ও নানা দু'জনই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু তাঁরা

কেউই নিজেদের মেয়েদের প্রাথমিকের গন্ডি থেকে বের করেননি ধর্মের দোহাই দিয়ে।

আমার মায়ের প্রজন্ম বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি যদিও তাঁদের বাবা শিক্ষক ছিলেন। এখন আমাদের প্রজন্মে সমাজ ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন এনে মেয়েদের কিছু সুবিধা দিলেও মূল কাঠামোতে আজও তেমন পরিবর্তন ঘটেনি। বদলায়নি সমাজের মানুষের মানসিকতা।

আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছি, নিজের ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা আমার হয়েছে। প্রতিদিন যা দেখছি, সব বিষয়েই এখনো মেয়েদের ওপর সামাজিক চাপ একটু বেশিই কঠোর। একা বা অবিবাহিতা, কিংবা বিবাহবিচ্ছিন্না বা বিধবা নারীদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সামাজিক বিধি-নিষেধগুলো দৃষ্টিকটুভাবেই বহাল আছে। তারা এটা ভাবে না যে জীবন যার তারই অধিকার থাকা উচিত সে জীবনে কীভাবে চলবে সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার।

আমি সাংবাদিকতা নিয়ে পড়ছি যা আমার পরিবার, সমাজ তথা আপনজনদের পছন্দ না। তাদের মতে এটা ছেলেদের পড়ার বিষয়। পরিবার, সমাজ চায়না যে আমি মিডিয়া বা সাংবাদিকতা রিলেটেড কাজ করি, ব্যাংক কিংবা পুলিশে কাজ করি। কারণ আমি মেয়ে। যদিও নানা বাস্তব প্রয়োজনেই আমরা শিক্ষিত হচ্ছি, উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগও গ্রহণ করছি, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের মতো জীবনযাপন বা জীবিকা নির্বাহ করতে পারছি না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমরা এখনও সমানভাবে অংশ নিতে পারি না।

আমি মেয়ে, তাই আমাকে দ্রুত পাত্রস্থ করে চিন্তামুক্ত হওয়া পরিবার ও সমাজের অন্যতম দায়িত্ব। যে ছেলের সাথে বিয়ের কথা হয় সে আমার সাথে পারসোনালি কথা বলতে চায়। সে এম.এ পাশ। আমার কথা ছিল যে, এখন যদি আমি বিয়ে করি তাহলে আমার স্বামী আমার স্বপ্নকে তার নিজের স্বপ্ন মনে করে আমার স্বপ্ন পূরণে আমার পাশে থাকবে কি না। আর তার বক্তব্য ছিল এমন, যে আমি পড়াশোনা চাকরি সব করবো এতে তার কোনো আপত্তি নেই, তবে আমাকে সংসার সামলে সব করতে হবে। সে একটি

শিক্ষিত ছেলে হয়েও নারী পুরুষের কাজকে আলাদা করে দিল। এই ছেলের তথা পুরুষদের এই মানসিকতা আকাশ থেকে পড়েনি। এই সমাজই তাদের এই মানসিকতা তৈরি করেছে। যাই হোক, কোনো কারণে বিয়েটা হয়নি। তো এটা যে শুধু আমার সাথে হয়েছে তা নয়। এটিই আমাদের সমাজের নিত্য চিত্র। অর্থাৎ, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেই নারীর আর কোনো সমস্যা থাকবেনা বলে যে একটি ধারণা চালু আছে তা শতভাগ সঠিক নয়। অর্থনৈতিক মুক্তিই নারী মুক্তি নয়। নারীর কাজ এবং পুরুষের কাজ বলে যে বিভাজন তৈরি করা হয় তা-ও আসলে অধিকারবঞ্চিত করে রাখার একটি কূটকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। যেসব পুরুষেরা নারীবাদী কথা বলেন, নারীদের অধিকার আদায়ে মাঠে নামেন তারাও কি কখনো নিজের স্ত্রীকে রান্নাঘরের কাজে সাহায্য করেছেন? মাছ কাটতে পারেন? ৮-১০ টা রেসিপি বানাতে পারেন? এক মাস স্ত্রীকে রান্না করে খাইয়েছেন? উত্তর আসবে, না। কিন্তু উত্তরটা কেন 'না' আসবে? নারীরা তো বাইরে পুরুষের সাথে সমানতালে কাজ করছে। তাহলে ঘরে এসেও তাকেই কেনো পুরোটা সামলাতে হবে? তাহলে কোথায় সাম্যতা? আমরা শিক্ষিত হচ্ছি, প্রতিষ্ঠিত হচ্ছি, কিন্তু পরিবার, সমাজ আমাদের বেঁধে রেখেছে শক্ত রশি দিয়ে। আসলে আমরা তো যান্ত্রিকশক্তি রূপে ব্যবহৃত হচ্ছি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কল্যাণে; পুরুষের সমান নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় নয়।

কাউকে তার মানবিক গুণের বদলে চেহারার মাপকাঠিতে বিচার করা অন্যায় ও অশিক্ষা। সেই ধারাবাহিক লজ্জার ইতিহাসে আত্মগোপন করে আছে অসংখ্য কালো মেয়েদের যন্ত্রণা। মাত্র দু'টি অক্ষরের একটি শব্দ 'কালো' এই শব্দ মিসাইলের মতো কাজ করে। এই একটি শব্দ ছুঁড়ে দিলেই একটি মেয়ে কেমন কুঁকড়ে যায়, অসম্মানিত বোধ করে, অসহায় হয়ে পড়ে। অথচ ছেলেদের কখনো সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে মাপা হয়না।

মিডিয়াগুলো পর্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক আচরণ করে। মূলধারার চলচ্চিত্রগুলোতে আজীবন দেখেছি শাবানা, রোজিনা, ববিতাকে চোখের পানি স্বামীর পায়ে ফেলে জীবন কাটাতে, কথায় কথায় স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়তে। মিডিয়াগুলো আমাদের শেখাতে চেয়েছে এই শাবানা-ববিতারাই হলো আদর্শ বাঙালী নারীর রূপ। এখনো পর্যন্ত ইন্ডিয়ান সিরিয়ালগুলোতে আমরা এসব দেখেই তৃপ্ত হচ্ছি। যেখানে প্রধান নায়িকা চরিত্র তারা

হয়, যারা অসীম অন্যায় উৎপীড়নকে অনন্তকাল মুখ-বুজে হাসিমুখে মেনে নিয়ে চলতে জানে। গোপনে শোষণের বীজটা ঢালছে এ প্রজন্মের নারীর অন্তরেও। হয়তো বুঝতেও পারছি না কখন সিরিয়ালের নায়িকার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ট্রায়াল দিচ্ছি। আমাদের মা-চাচিদের মনেও ঠিক এভাবেই বোনা হয়েছিল শাবানার বীজ।

একটি নারী ধর্ষণের শিকার হলেও তার দোষ মেয়েটির কাঁধেই এসে পড়ে। পরিবার সমাজ বলবে সে অসময়ে অজায়গায় গিয়েছিল, সে অশালীন পোশাক পড়ে রেপ ইনভাইট করেছিল। হয়তো কখনো কখনো আমি এসবের বিরুদ্ধে ফেসবুকে দু'চার লাইন লিখি। কিন্তু আমার পরিবারের ধারণা কিন্তু ভিন্ন নয়। তারাও এটা গলা উঁচু করে বলে যে মেয়েটারই দোষ। পরিবারের লোকেরাও নারীকে নিজেদের সম্পত্তি মনে করে। নারী নিজের জন্য বিচার চাইবে কি না তা-ও পরিবারের লোকেরাই মূলত সিদ্ধান্ত নেন। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ষণ নারীর একার শরীর ও মনের ওপর ঘটলেও সমাজে শরীর ও মনসমেত নারীর নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। এমন সমাজ ব্যবস্থার নারী হয়ে আমি বলতে পারিনা 'আমার শহর, আমার বাড়ি।' আমার কিছুই নয়, আমিও তো আমার নই। যে নিজেই তার নয়; তার আবার কী থাকবে?

অ্যালিস ওয়াকারের 'কালার পার্পল' উপন্যাসে ১৪ বছর বয়সী কিশোরী দীর্ঘদিন ধরে বাবার কাছে ধর্ষণের শিকার হতে হতে ভাবে, কেবল বিধাতাকেই অত্যাচারের কথা খুলে বলা যায়। তাই নিয়মিত ঘটনার বর্ণনা লিখে বিধাতার কাছে চিঠি লেখে "প্রিয় বিধাতা..."; বাস্তবে পরিস্থিতি এমনই। আমাদের ওপরে ঘটে যাওয়া পরিবার, সমাজ ও পুরুষতান্ত্রিকতার অন্যায় আচরণ ও বৈষম্যের কথা আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে পারিনা। আমরা গুমরে গুমরে কাঁদি কিন্তু বলি না। কেন? বলি না, আমাদের সাজানো সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পুরুষতান্ত্রিকতার ঘেরাটোপের কারণে। আমরা জানি আমাদেরকেই হেয় করা হবে, প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হবে।

Israt Jahan Tuna / ইসরাত জাহান তুনা, Dhaka, Bangladesh

To me, writing is a way to express my joy, anxiety and uncertainty. I love to read books and newspaper and try to figure out how a writer or journalist depicts a scenario by creative writing. While reading "Prothom Alo" newspaper, I learnt about the writing competition. The topic seemed very interesting to me. As I have grown up in a city of Bangladesh, I have lots of memories of the city. I am a sixteen plus girl studying in a college. I am living in a culture where most of the time, the voice of girls remains unheard. Writing gives me a freedom to express my feelings without any hesitation. This competition came as an opportunity to prove myself as an emerging writer. When I started to write about my home and my city, I looked behind. I collected the memories of my childhood I passed in my home, in my city. I did not need to struggle to find lines for the write up. After finishing the write up, when I read it thoroughly, it feels like I am seeing my whole journey in the city. The writing is not only a competition but also an effort to recollect my memories and my hope for a better living in the city as a girl through my writing.

আমার শহরের না বলা কথা

আজ প্রায় চার মাস পর বাসা থেকে বের হয়েছি। অনেকদিন পর বাসা থেকে বের হওয়ার কারণে নিজ শহরটাকে কেমন যেন অচেনা মনে হচ্ছে। গত দশ বছর ধরে এই শহরে আছি, কিন্তু এর আগে কখনো এত দীর্ঘ একটা সময় গৃহবন্দী থাকতে হয়নি। তবে করোনার কালে এই দীর্ঘ সময় গৃহবন্দী থাকতে আমার খুব একটা কষ্ট হয়নি, কেননা আমার জীবনের দীর্ঘ একটা সময় ঘরেই কেটেছে। শহরে থাকা মানুষদের জীবন অনেকটাই যান্ত্রিক। এই শহরে কাজ সেরে ঘরে ফেরা আর দশটা মানুষের মতোই কলেজ থেকে ফেরার পর আমার বাকিটা সময় ঘরেই কেটে যায়। আমার ঘরটাও আমার খুব

আপন। অনেকের মতে নারীরাই কংক্রিটের চার দেয়ালকে ঘরে এবং সংসারে পরিণত করে। আমিও আমার ঘরটাকে নিজের মত করে এমনভাবে সাজিয়ে রাখার চেষ্টা করি, যাতে সারাদিন পর ফেরার পর মানসিক প্রশান্তি মেলে।

নিজের ঘরের সাথে একটি মেয়ের অনেক গভীর সম্পর্ক থাকে, আমারো তাই। আমার অনেক ভালোমন্দ মুহূর্তের সাক্ষী আমার ঘর। আর ঘরে আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা আমার বারান্দা। বারান্দায় নিজ হাতে লাগানো গাছগুলোর সাথে অবসর সময় কাটাতে ভালো লাগে। বর্ষাকালে যখন মুষলধারে বৃষ্টি নামে, বারান্দায় হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির পানি ধরার যে আনন্দ, তা লিখে প্রকাশ করা মুশকিল।

জন্ম গ্রামে হলেও আমার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এই শহরেই, তাই এই শহরের প্রতি মায়া কোন অংশে কম নয়। সাভার নামের এই ছোট্ট শহরটির সাথে জড়িয়ে আছে আমার অনেক স্মৃতি। আমার শহরের ইতিহাস অনেক পুরোনো না হলেও অনেক সমৃদ্ধ। এই ছোট্ট শহরেও অনেক মানুষের বসবাস। সাভারে আমরা প্রথম যে বাসায় উঠি সেই বাসা ছিল অনেক খোলামেলা আর আমার খুব পছন্দের। ছোট ছিলাম বলে বিকেলে খেলা করতে যেতাম পাশের বাসার মাঠে, কিন্তু ধীরে ধীরে জায়গাগুলো দখল করে নেয় ইটপাথরের দালান। আমাদের এক চিলতে বাসার ভিতরটা ঢাকা পড়ে যায় বড় বড় দালানের আলো-আঁধারিতে। আর আমি হারিয়ে ফেলি আমার ছুটে বেড়ানোর জায়গাটুকু, যেখানে আমি আর আমার বড়বোন মা'র বানিয়ে দেয়া পুতুল নিয়ে খেলা করতাম, হাঁড়ি-পাতিল খেলতাম।

আমাদের শহরের মধ্যে দিয়ে বংশী নদী বয়ে গেছে। ছোটোবেলায় আমি মাঝে মাঝেই মা আর বড় বোনের সাথে নদীর পাড়ে ঘুরতে যেতাম। আগে নদীর দুই পাশে অনেক বড় পাড় ছিল, নদীর তীর জুড়ে বসতো বড় বড় মেলা। কিন্তু এখন নদীকে ঘিরে উন্নয়নের আসর বসেছে, গড়ে উঠেছে অসংখ্য কল-কারখানা। নদীটার মৃত প্রায় চেহারাটা দেখার আশংকায় এখন আর নদীর পাড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

এই শহরে এসেই আমার বন্ধুত্ব হয়েছিল একটি কুকুরের সাথে, ওর নাম চিনু। অবুঝ প্রাণী হলেও আমার সাথে ওর সম্পর্কটা আর পাঁচটা সাধারন বন্ধুদের মতোই ছিল। আমার

স্কুলের যাওয়ার পথে ওর সাথে দেখা হতো, ওকে খাবার খাওয়াতাম। আবার মাঝে মধ্যে কোথায় যেন চলে যেত। আমাদের বন্ধুত্বের গভীরতা গড়ে ওঠার গল্প চলার পথেই থমকে যায়, যখন কে বা কারা চিনুকে মেরে ফেলে রেখে যায়। এ শহরে আমার স্মৃতির খাতায় জমা হয় আরো একটা হারিয়ে ফেলার গল্প।

যদি কেউ আমার কাছে জানতে চায় যে এ শহরের কোন দিকটি আমাকে বেশি আকৃষ্ট করে, আমি বলবো আমার রাতের শহরটাকে দেখতে খুব ভালো লাগে। রাতের বেলায় এই শহরের বুকে এক অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দেখা যায়, আলোয় ঘেরা নিস্তব্ধ শহর। শুধুমাত্র এই সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আমি মাঝেমধ্যে ছাদে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকি। রাতের বেলায় শহরে ঘোরার মধ্যেও রয়েছে এক অন্য রকমের শেকল-ভাঙ্গা আনন্দ। কিন্তু যে শহরে দিনের আলোতেই মেয়েদের নিরাপত্তা দুষ্প্রাপ্য, সেখানে রাতের নরম আলো-আধাঁরে ডানা মেলতে চাওয়ার ইচ্ছাগুলো মনের ভেতরেই বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। ছোটোবেলা থেকে এ শহরে বেড়ে ওঠার কারণে এই শহরের রাস্তা, অলি-গলি, হাওয়া-বাতাস সবই আমার আপনজন। ছোট্ট এ শহরেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ উৎসবে আনন্দগুলো একে অন্যের সাথে ভাগ করে নেয়ার মতো ঘটনাগুলো হঠাৎ করেই মন ভালো করে দেয়ার উপলক্ষ্য হয়ে হাজির হয়।

ইট পাথরে বন্দী হয়েও এই শহরের প্রতিটি ঋতু আমি অনুভব করতে পারি। বৈশাখ মাসে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করতে প্রতি বছর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। ক্যাম্পাস বাসা থেকে অনেকটা কাছে, তাই পহেলা বৈশাখে বড় বোনের সাথে ঘুরতে যাওয়া হয় নিয়ম করেই। বৃষ্টি আমার অসম্ভব পছন্দের, রাস্তায় জমে থাকা কাদাজল বৃষ্টি আসার আনন্দে বাধা হয়ে ওঠেনা। শরৎকালে শহরের শেষ প্রান্তে জমে ওঠে কাশফুলের শুভ্র রাজত্ব। শহুরে শীতকাল মানেই স্কুল-কলেজে পিঠাপুলির উৎসব, পাড়ার মোড়ে মোড়ে ভাপা আর চিতই পিঠার দোকানে সান্ধ্যকালীন ভিড় আর আড্ডা। আবার বসন্তকাল এলেই বুঝতে পারি, যখন দেখি শহরের ধুলোয় ম্লান হয়ে যাওয়া গাছগুলোর শরীরেও নতুন পাতার শিহরণ, রংবেরঙের ফুলের সাজ। বসন্তবরণের দিন অমরা হলুদ শাড়ী পরে মাথায় কাঁচা ফুল দিয়ে বসন্ত উৎসব পালনে মেতে উঠি। একেক ঋতুতে একেক রূপে আত্মপ্রকাশ এ শহরেরে প্রতি আমার টান আরো বাড়িয়ে তোলে।

কিছু অন্ধকার দিকও রয়েছে মায়ায় ঘেরা এ শহরের। একুশ শতকের আধুনিকতায় বাহ্যিক অনেক পরিবর্তন হয়তো এসেছে, কিন্তু একজন নারী হিসেবে অনেক সময়ই মনে হয় যেন এ শহর আমার নয়। গত বছরের একটা ঘটনা বলি। একদিন আমি আর আমার বড়বোন সাভার থেকে ঢাকা যাচ্ছি মামার বাসায়। মধ্যবিত্তের যাতায়াতের সবচেয়ে সুবিধাজনক নাগরিক পরিবহন বাস। সেদিন বাসে অনেক ভিড় ছিল বলে দাঁড়িয়েই যেতে হচ্ছিলো। কিছুক্ষন পর এক মধ্যবয়স্ক লোক বাসে উঠে আমার পিছনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বারবার আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। পাশে বসে থাকা একজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যাপারটা লক্ষ করে তাঁর সিটটায় আমাকে বসতে দেন। সেদিনের পর থেকে নিজের শহরেই নিজের মতো করে চলাফেরা করা নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়।

আমি আমার এই শহরটাকে ভালবাসি, ঠিক যেমন ভালোবাসি আমার নিজের ঘরটাকে। খুব ইচ্ছে করে নিজের ঘরের মতো করে শহরটাকে সাজিয়ে রাখতে। পুরো পৃথিবীকে তুলনা করা হয় একটি গ্রামের সাথে, তেমনি আমি আমার শহরটাকে আমার ঘরের মত করে ভাবার চেষ্টা করি – যেখানে আমি নিজেকে সম্পূর্ন নিরাপদ ভাবতে পারব, যেখানে চলাফেরার সময় চিন্তা করতে হবে না যে পাশে কেউ বাজে কিছু বলছে কি না বা গায়ে হাত দিতে চাচ্ছে কি না।

খুব করে চাই যান্ত্রিক এই শহরের উন্নয়নর সাথে সাথে মানুষগুলোর চিন্তাভাবনার ও উন্নয়ন হোক। ঘরে যেমন আমি আমার মতামত দিতে পারি, তেমনি শহরের উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীদের মতামত দেওয়ার সুযোগ তৈরি হোক। জেগে থেকেও স্বপ্ন দেখি আমার শহর একদিন নারীদের জন্য কেবলই সুখস্মৃতিময় গল্পের খাতা হয়ে উঠবে।

Khadijatul Kaminy / **খাদিজাতুল কামিনী,** Dhaka, Bangladesh

I have always been in love with fiction, and also with the real world around me. Writing about my experiences, ideas, and feelings give me solitude. Though I cannot call myself a professional writer, I know that I'm always thinking about writing even when I'm not writing. I came to know about this competition through Facebook. As soon as I saw the theme, I knew that I had a lot of stories in my head. I always wanted to live freely as a human being, and the place I live in has had a great impact on my freedom. From a very young age I knew that my experience of life is extremely different from a man's life. So, the hazards that simply exists in a woman's life have been bothering me since long. I believe, a writer is always influenced by his or her own life, and so am I. The given theme 'My City and My Home' triggered me the moment I came across them. I knew I must write about it because I have stories to tell.

গন্তব্য

– কী যে ভাল লাগে বিকেল বেলাটা ছাদে বসতে আমার! মনে হয় যেন অন্য কোথাও আমি। যেন এই বাড়ি, এই ছাদ, আকাশ, এখানকার মানুষগুলো সবাই অচেনা।

– তুই একটু পাগল আছিস রে। অচেনা হলে ভাল লাগতে যাবে কেন! চেনা মানুষ, চেনা ঘর না হলে বুঝি ভাল লাগে? আমার তো যাদের চিনি না তাদের একদম ভাল লাগে না। কথাই বলতে ইচ্ছে হয় না।

হেসে ফেললো মনিরা, বিন্তিটা এমন বোকা না!

– ধুর, তোকে কী বলছি আর কী বুঝছিস।

- তোর যে মাথায় পোকা সেটাই বুঝছি। আচ্ছা শোন, তোকে একটা কথা বলবো, বলবি না তো কাউকে?

- তোর কোন কথাটা কাকে বলেছি আমি কবে?

একটু তেঁতুলের আচার মুখে দিয়ে তারে ঝুলানো শাড়ী দেখিয়ে উদাস গলায় বলল মনিরা, দ্যাখ কেমন উড়ছে শাড়ীটা – নৌকোর মতন !

- হায় রে কপাল! নৌকো পেলি তুই কোথায়? আর নৌকো উড়তে কে দেখেছে কবে? বলছি একটা কথা আছে, মনিরা-বু, শোন না?

- জ্বালিয়ে মারলি! বল তো দেখি, বল?

- তুই কী বুঝবি! তুই তো পড়াশুনোয় ভাল। আমি মরছি নিজের জ্বালায় বাবা!

- হুম, এই কথা তো? রেসাল্ট নিয়ে ভয় করছে? ও কিছুনা, অমন হয়। দেখিস তুই খুব ভালমত পাশ করে কলেজে উঠে যাবি।

- তুই তো বলবি এসব, নিজে তো সবচেয়ে ভালো কলেজটায় চান্স পেয়ে গেছিস। মুখে সহজেই বলা যায়।

- উফফ! ভারি আমার কলেজ! একদিন ক্লাস হয় তো দশ দিন খবর নেই।

- এই মফস্বলে তুই আর কত ভাল যে চাস! কিন্তু আমি যদি ফেল মারি কী হবে রে আমার, মনিরা-বু?

- কী আর হবে? বেশি হলে চাচা তোর বিয়ে দিয়ে দেবে। তুই তো তাতে খুশি, আমি জানি!

- তা তো ঠিক, খুশি তো হবোই! সেই সুখ কি আর আছে আমার? মা বলেছে রেসাল্ট খারাপ হলে আবুলের মা কে ছাড়িয়ে দেবে, আর বাড়ির সব কাজ নাকি আমার। এটা একটা কথা হলো, বল তো?

- এ আর নতুন কী? ঘরের কাজ মেয়েদের না করে উপায় আছে নাকি !

- আচ্ছা, মনিরা-বু, ছেলেদের কি খেতে হয় না? নাকি পরিষ্কার জামা লাগে না, পরিষ্কার ঘর লাগে না?

- তা তো সবার লাগে।

- তবে? আমরাই কেন ঘরের সব কাজ করে মরব ? আমার ভাইটাকে দেখেছিস কোনদিন কুটোটাও নাড়তে?

- তোর ভাইটা তো তবু পড়াশুনো করে, আর আমার বড়টা? না করে পড়াশুনো, না করে বাড়ির কোনো কাজ। তাও আম্মার চোখের মণি।

- আর আমার মা? সারাদিন বলছে, মেয়ে পালা মানে হাতি পোষা, পরের বাড়ি গিয়ে কী করে খাব যদি কাজ না করি, উফফ! বিয়ে হয়ে গেলেই বাঁচি।

- কী যে বলছিস না! ঐ বাড়ির আন্নি ভাবির কথা মনে আছে? সবাই বলল গলায় ফাঁস দিয়েছে, আমার তো বিশ্বাস হয়না। কী হাশিখুশি ছিল ভাবি, আর কী মিষ্টি করেই না কথা বলত।

- শ্বশুরবাড়ি কি এমন হয়, মনিরা-বু?

- ধর, একটু এদিক আর ওদিক। মোটের উপর সব এক।

- আমার কী মনে হয় জানিস? মেয়েদের কোথাও শান্তি নেই বু।

- তা তো নেই একেবারেই। দ্যাখ না, ফাতিমার সাথে কী হলো?

- সবাই ওকেই কত বাজে কথা বলছে, কোথায় যেন পাঠিয়েও দিল ওকে।

- ঈশ, ভাবলে গা শিউরে উঠে, স্কুলের স্যার এমনটা করতে পারে!

- ক্যামেরা নিয়ে কত লোক এল কয়েকদিন, তাইনা বু?

- হুম, পুলিশও এসেছে কতবার। কই, এখন তো আর আসে না! সবাই ভুলে গেছে। এখন ফাতিমাকে বাড়ি আনবে কি না কে জানে।

- পুলিশ ভুললে কী হবে ? শহরের লোকেরা ঠিক মনে রেখেছে। আর পারবে না ফাতিমা নিজের বাড়ি ফিরতে। আচ্ছা , আমাদের ছোট শহর বলে এমনটা হয়, তাই না ? বড় শহরে তো মেয়েরা কত কাজ করে, ঘুরে বেরায় , খুশি মত চলতে পারে , তাদের কেউ কিছু বলেনা।

- এজন্যই তো আমি ঠিক করেছি ঢাকায় গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হব। ঢাকা ইউনিভার্সিটি হলে তো কথাই নেই! ভাল করে পড়লে বাবা যেতে দেবে। তাই বলছি তুইও একটু পড়ায় মন দে। আমরা দুজন তাহলে একসাথে ঢাকায় থাকব, ভাবতে পারছিস?

- হুম, তুই ওই স্বপ্নই দেখতে থাক। আমার মাথায় পড়া ঢোকে না।

সন্ধ্যা হয়ে এল, আমি নামলাম আচারের বয়ামগুলো নিয়ে।

মনিরা আর খানিকক্ষণ বসেই রইল। ভাবল, ঢাকা আমায় যেতেই হবে। কত কিছু দেখার বাকি, জানার বাকি। কত ঘুরতে চাই আমি, বড় শহরে না গেলে কিচ্ছু হবে না। কেউ চলতে দেবে না ইচ্ছে মতন। এই যে সুন্দর আলো নামে সন্ধ্যায়, কী যে ইচ্ছে করে হাঁটতে রাস্তা দিয়ে। মা দেবে যেতে? ধুর !

নিচে নামতেই বিন্তি দৌড়ে এল।

জানিস কী দেখাচ্ছে টিভি তে? দেখবি আয়।

বিন্তিদের ঘরে ঢুকে টিভির পর্দায় চোখ রাখল মনিরা।

দেখাচ্ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন ছাত্রীকে সন্ধ্যায় ইউনিভার্সিটি বাস থেকে নামার পর বাড়ি ফেরার পথে এক মাতাল গাঁজাখোর ধর্ষণ করেছে - তাই নিয়ে প্রতিবেদন।

Sabrina Sazzad / **সাবরিনা সাজ্জাদ,** Dhaka, Bangladesh

আমার শহরের প্রাণবন্ত নানান উপাদান কবিতাটি রচনায় অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। একজন মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার মাঝে এই উপাদানগুলোই দায়ী। তাই আমি আমার শহরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্যই কবিতাটি রচনা করেছি।

আমার এ শহর

এই শহর আমার–
মাটি ক্ষুদ্র পরিসর
তবুও অতুলনীয় সেই স্মৃতি।
আমার বুকে যেন খচিত
আকাশের মেঘে আচ্ছন্ন কুয়াশা ভরা সকাল।
মনের এক গভীরতম সম্পদ কাটানো সেই কাল।
স্মৃতি বিজড়িত নববর্ষ হতে নবান্ন
কেটেছে নিমিষেই হারিয়ে
বর্ষার জলে ভেসে নাড়িয়ে।
এবং বাহার নিয়ে এসেছে বসন্ত।

ঠান্ডা এক সকালে, রমনার পথে
হাঁটি এবং ভাবি কোন এক ক্যানভাস যেন–
এই যে চারিদিকের আচ্ছন্ন রোদ,
বাতাসের দোলা দেওয়া গাছের সবুজ পাতা–
ওইযে চলে রিকশা, পাশে মানুষ
যেন এক গভীরতম শিল্পের রং।
যেন এক কল্পনার রাজপথ–
আমার এ শহর।

Amily Mazumder / এমিলি মজুমদার, Chittagong, Bangladesh

I found an intangible connection between the terms My city and My home, which inspired me to write about it.

বাড়ি সাজলেই সাজবে শহর

মা-বাবা , স্বামী সন্তান নিয়ে আমদের পরিবার। পরিবার নিয়েই বসবাস আমাদের বাড়িতে। আর অগণিত পরিবারের বসবাস আমার এই শহরে। আমার শহর, আমার বাড়ি, একটার থেকে অন্যটা কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন নয়। আমার জন্ম রংপুরে হলেও বাবা'র জন্মসূত্রে আমার শহর চট্টগ্রাম। তিন বছর বয়সে রংপুর ছেড়েছি, সেই থেকে চট্টগ্রামে। আমার পরিচয়, আমি চট্রগ্রামের মেয়ে, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে আমার জন্ম। কম বয়স থেকেই পরিবারের প্রয়োজনে, প্রথম সন্তান হিসেবে বাবার পাশে দাঁড়াতে হয়েছে। সাধারণত ছেলেরা পরিবারের হাল ধরে থাকে, কিন্তু মেয়ে হলেও পরিবারের হাল ধরতে হয়েছে আমাকে। উচ্চাভিলাষী না হলেও কাজের প্রতি ছিল শ্রদ্ধা, একাগ্রতা, সততা, আর ছিল পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ। এগুলোই এগিয়ে নিয়ে গেছে আমাকে, সমস্ত বাধা বিপত্তি পার করে আরও দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছে আমার অবস্থান। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বিয়ে করবো না, কারণ আমার পরিবারের পাশে আমাকে থাকতেই হতো। কিন্তু মা-বাবা কোনভাবে মেনে নিতে পারছিলেন না। ভেবে চিন্তে একটু বেশি বয়সেই রাজি হয়ে যাই, তবে বিয়ের আগেই আমি ছেলের সাথে কথা বলে নিয়েছিলাম যে বাবা-মা, ভাই-বোনদের আমায় দেখতে হবে। সেই থেকে সে আমাকে কোনদিন বাধা দেয়নি। সময় গড়িয়ে আমার ছেলে-মেয়ে হয়। কর্মক্ষেত্রে অনেক বেশি সময় দিতে হতো, ছুটোছুটি করতে হতো দেশ-বিদেশে। তাই বাধ্য হয়ে বাবা'র বাসার সাথে আমি বাসা নিই বড় মেয়ে কোলে আসার পর। ধীরে ধীরে সময় গড়িয়ে যায়, বোনেরা বিয়ে হয়ে চলে যায় স্বামীর ঘরে, ভাইদের পৃথক সংসার হয়, কখন যে মায়ের সংসার আর আমার সংসার মিলে এক হয়ে যায় বুঝতে পারিনি। মা-বাবা রয়ে যায় আমার সাথে। ভাই-বোন , শ্বশুড়বাড়ি সবার সাথেই রয়েছে সুসম্পর্ক ।ভাই-বোনেরা গেঁথে রয়েছি এক সুতোয়।

পরিবারের সবার প্রতি সব দায়িত্ব পালনে আমার এতটুকু অসুবিধা হয়নি। আমার মত অনেক মেয়ে ঘরে বাইরে সব ক্ষেত্রে দক্ষতার সাথে সব দায়িত্ব পালন করে চলেছে। প্রথম কথা হচ্ছে পরিবারকে ভালোবাসতে হবে। পরিবারের সদস্যদের পরস্পরের সম্পর্ক হতে হবে শ্রদ্ধার, সম্মানের, আর এগুলো পরিবারের খুঁটি, যা পরিবারের ভিত শক্ত করে।

পরিবারের সাথে যেমন আমার নাড়ির টান রয়েছে, আমার শহরের জন্যও তেমনি নাড়ির টান রয়েছে। দেশের বাইরে ৫-৭ দিন কাটাবার পর পরিবারের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মনটা যেমন ছটফট করতে থাকে, ঠিক তেমনি শহরটাকেও মিস্ করতে থাকি। পরিবারের সাথে বাইরে গেলেও, দেশের মাটিতে ফ্লাইট ল্যান্ড করার পরই মনে প্রশান্তির ছোঁয়া লাগে। শহরে নেমে বুক ভরে যেন নি:শ্বাস নিতে পারি, গন্ধটাই যেন আলাদা। 'বন্দর নগরী' অর্থাৎ 'পোর্ট সিটি', 'বাণিজ্যিক রাজধানী' হিসেবে পরিচিত আমাদের চট্টগ্রাম। কথিত আছে বারো-আউলিয়ার জায়গা আমাদের এই চট্টগ্রাম। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, নেলী সেনগুপ্ত, সূর্য সেনের মতো বহু বিখ্যাত লোকের জন্মস্থান চট্টগ্রাম। মাস্টারদা সূর্য সেন, যিনি ভারতবর্ষের ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিত্ব। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী মুক্তিযোদ্ধা ও প্রথম বিপ্লবী মহিলা শহিদ ব্যক্তিত্ব। বিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে তখনকার ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং জীবন বিসর্জন দেন। বিনোদ বিহারী চৌধুরী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের একজন বিপ্লবী কর্মী যিনি বিপ্লবী সূর্য সেনের সহকর্মী ছিলেন। ড. অনুপম সেন একুশে পদকে ভূষিত বাংলাদেশি সমাজবিজ্ঞানী। অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ। আমরা চট্টগ্রামবাসী আমাদের কৃতি সন্তানদের জন্য গর্বিত। গারমেন্ট শিল্প বহির্বিশ্বে আমাদের পরিচয়ের অন্যতম মাধ্যম। সেই পোশাক শিল্পের পথ চলা শুরু হয়েছিল এই চট্টগ্রামে থেকেই, যার মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ অর্জিত হচ্ছে, কাজ করছে ঘরে বসে থাকা লক্ষ লক্ষ মেয়েরা, পরিবারের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পরোক্ষভাবে অংশ নিচ্ছে দেশগঠনে।

সাগর, নদী, পাহাড়, লেক কী নেই আমাদের এই চট্টগ্রামে যা দেখতে মানুষ ছুটে যায় দেশ-বিদেশে , দূর-দূরান্তে — প্রকৃতি মায়ায় ঘিরে রেখেছে আমাদের এই চট্টগ্রাম, কিন্তু

আমরা তার যত্ন করি না। একটু হাত লাগালেই গড়ে উঠতে পারে খুব সুন্দর সম্পদশালী এক পর্যটন কেন্দ্রে, অর্জিত হতে পারে বৃহৎ অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা। কিন্তু সুন্দর ফলপ্রসূ পরিকল্পনার অভাবে তা আজও হয়নি! পাহাড় কেটে নদী ভরিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে খর্ব করার জন্য যেন উঠে পরে লেগেছে প্রভাবশালী মহল। সবকিছু থাকার পর আজও অবহেলিত চট্টগ্রাম। পোর্ট সিটি বা দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর হওয়া সত্ত্বেও, প্রকৃতি উজাড় করে সৌন্দর্য দেয়া সত্ত্বেও, রাজধানীর কৃত্রিম সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে যে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, চট্টগ্রামে তার এক অংশও করা হচ্ছে না। সঠিক প্ল্যানে প্রাকৃতিক এই সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে এই শহরটাকে দৃষ্টিনন্দন নগরীতে পরিণত করতে পারলে অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেত বলে আমার বিশ্বাস। আমার এ শহরের মানুষ যেমন খেতে ভালোবাসে, তেমনি খাওয়াতেও ভালোবাসে। বিয়ে, মেজবানে এরা হাজার হাজার মানুষ খাওয়ায়। মেয়ে বিয়ে দিয়ে ট্রাকে বা ঠেলাগাড়ীতে করে করে পিঠা, ফল, পোলাও, কোরমা, বিরিয়ানি পাঠায় বেয়াই বাড়িতে, কোরবানীর সময় মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে বড়সড় একটা গরু না পাঠালে সম্মান থাকে না সাথে মরিচ মশল্লা! খেতে, খাওয়াতে এদের জুড়ি মেলা ভার, কিন্তু নিজেকে পরিষ্কার রাখতে গিয়ে আশপাশ নোংড়া করা, রাস্তা, ফুটপাত, সমুদ্রের পার ইত্যাদি সুন্দর পর্যটনকেন্দ্রগুলোকে আবর্জনার স্তুপে পরিণত করতেও এদের জুড়ি নেই —চট্টগ্রামের মেয়েরা আগের চাইতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগিয়ে গেলেও মানসিকতার তেমন পরিবর্তন হয়নি। লেখাপড়া শেষ করে স্বামী সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য করে আজও। বাইরে কাজ করে নিজের একটা আলাদা পরিচয় তৈরিতে এদের অনীহা। চোখ থাকতেও এরা অন্ধ। বিশ্বের মেয়েরা আজ কোথায় পৌঁছে যাচ্ছে, আর আমরা কোথায়! আমি গারমেন্ট শিল্পের সাথে জড়িত। খুব কষ্ট হয় যখন বাইরে বিজনেস মিটিং এ্যাটেন্ড করতে গিয়ে দেখা যায় বিদেশে এই শিল্পের ৮০ শতাংশ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নারী। আর আমাদের দেশে মেয়ে শ্রমিক রয়েছে হয়তো ৮০ শতাংশ কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মহিলাদের সংখ্যা নগণ্য। পারিবারিক সহযোগিতার অভাবে অধিকাংশ মেয়েরা আজও ঘরবন্দী। খেটে খাওয়া পরিবারের মেয়েরা ঠিকই বাইরে বের হয়ে রোজগার করে সংসার চালাচ্ছে। কিন্তু সামর্থ্যবান পরিবারগুলো থেকে খুব কম মেয়েই এ সুযোগ পাচ্ছে। এর জন্য পরিবারের পাশাপাশি

মেয়েরাই অনেকাংশেই দায়ী। আমাদের মেয়েদের মানসিক সংকীর্ণতা দুর করার ক্ষেত্রে পারিবারিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শুনতে হয় — এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, এটা বলা যাবে না, ওটা বলা যাবে না, ওখানে যাওয়া যাবেনা, এ পোশাক পড়া যাবে না, মেয়েদের কষ্ট সহ্য করতে হয়, সমঝোতা করে চলতে হয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের পরিবারগুলোতে ছেলেমেয়ের মধ্যেকার প্রভেদ কমিয়ে আনতে না পারলে অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়।

আমরা আমাদের বাড়িটাকে ঠিক করতে পারলে শহর ঠিক করতে বেগ পেতে হবে না। বাড়ি তথা পরিবারের মানুষগুলো যদি দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা, উদারতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতার যথাযথ শিক্ষা পায় তাহলে শহর তাদের শিক্ষায় আপনা আপনিই আলোকিতহবে। এসো আমরা সবাই আমাদের বাড়িটার যত্ন করি, পরিচ্ছন্ন রাখি, সম্পর্কগুলোর যত্ন করি, ছেলেরা যেন মেয়েদের যথার্থ মর্যাদা দেয়ার শিক্ষা পায়, মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করি, আর পরিবারের সবাই মিলে আমাদের শহরের যত্ন করে আমাদের বাড়ি আর শহরটাকে আলোকিত করি।

Monira Ahmed / মনিরা আহমেদ, Dhaka, Bangladesh

I am fond of reading poetry and books. I always wanted to write. But the bad effect of globalization and Information Technology means we are becoming mechanical day by day. I have inner turmoil observing the new trend in young generations. I saw the advertisement for the competition in a newspaper and I thought that It could be a great opportunity for me to write.

Your given topic is very is important because people are migrating from Bangladesh to other countries, with very lame excuses. Whereas you can never love another country more than your motherland.

So the topic is very important as we are born in a country and in a specific village or in a town, where lots of memories are gathered. Those memories and experiences guide us, motivate us to lead our lives in a respective manner.

Your word limit is 1000 so I had to think a lot to make it precise.

But I am feeling very happy for the opportunity that you have given to the women of Bangladesh. Thanks from bottom of my heart.

যেথায় চিত্ত প্রশান্ত, সেথায় আমার শহর, আমার ঘর

আমার বাড়ি যাইও ভোমর,
বসতে দেব পিঁড়ে,
জলপান যে করতে দেব
শালি ধানের চিঁড়ে।

আমার লেখাটি পল্লী কবি জসীম উদ্দীনের 'আমার বাড়ি' কবিতাটি দিয়েই শুরু করলাম। কারণ একটু বুদ্ধি হওয়ার পর আমি এই কবিতাটিকে লালন করেই বেড়ে উঠেছি। আমার জন্ম ০৮ই আগস্ট ১৯৮৫ সালে ঢাকার মিরপুরে। আমার নিবিড়-নিশ্চিন্ত নিবাস ছিল ৬/ডি, ৩/২৭ নম্বর বাড়ি। বাবা, মাকে নিয়ে এককভাবে ঢাকায়

থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মা চেয়েছিলেন বাবার একান্নবর্তী পরিবারকে আপন করে তাদের সংসারটি সাজাতে, কারণ সম্পর্কে ওঁরা ছিলেন আপন খালাতো ভাই-বোন। বয়সে বাবা ছিলেন মার চাইতে দশ বছরের বড়, তাই ওঁদের সম্পর্কটি ছিল সম্মান ও স্নেহের। আমার নানা মায়ের বিয়ে ঠিক করেছিলেন। আমার মা ভয়ে বাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওঁর খালার আঁচলের নিচে। আর এত গুণী, সুন্দরী মেয়েকে কি হাত ছাড়া করা যায়?

আমাদের গ্রাম মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরের বাড়েই গ্রামের মুন্সী বাড়ি। আব্দুর রহীম খাঁ আমার দাদাজান। গ্রামের মুরুব্বিদের তত্ত্বাবধানে বাবা-মা'র বিয়েটা সম্পন্ন হয়েছিল। বাবা-মা'র নানি তাঁর আদরের দুই নাতি-নাতনিকে স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি খুশি মনে লিখে দিয়েছিলেন। যদিও তাঁর আরো নাতি-নাতনি ছিল।

১৯৮৩ থেকে বাবা-মার বৈবাহিক জীবন সংগ্রামের যাত্রা শুরু। বাবার ৫০ টাকা বেতনে গার্মেন্টসের চাকরী দিয়ে ঢাকাতে টিকে থাকার সংগ্রাম তো চলছিলই। আমার দাদা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করতেন। ইংরেজরা ভারত ছাড়ার পর তিনি বিভিন্ন ব্যবসায় নিজেকে সম্পৃক্ত করে জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন। আমার বাবা ছিলেন দাদার দশ সন্তানের মধ্যে একমাত্র ভরসা।

বাবা-মায়ের পড়াশুনা তেমন ছিল না, কিন্তু তাঁরা দুজনেই ছিলেন ভীষন পরিশ্রমী এবং সৎ: একজন ঘরে আরেকজন বাহিরে। আমার বাবা-মায়ের আচরণে ছিল তীব্র মেধার দ্যুতি। মা তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁর পাঠ্য কবিতাগুলো থাকত তাঁর ঠোঁটের আগায়। আর আমি বার বার 'আমার বাড়ি' কবিতাটি শুনতে চাইতাম। এই কবিতাটি ছিল আমার 'Childhood Lullaby'। কল্পনায় আঁকতাম আমি সেই বাড়ি।

আমাদের ৬/ডি, ৩/২৭ নম্বর বাড়ি: কখনো ভাবিনি বাড়িটি ছিল ভাড়ায়। ছয় কামরার বাড়ি ছিল। দুপাশে তিনটি করে ঘর আর মাঝখানে গলি। বাড়ির সামনে খোলা বাগান। বাড়ির সামনে এবং পেছনে দুটি অত্যন্ত সুস্বাদু পেয়ারা গাছ। একটার ভেতর ছিল সাদা আর অন্যটির ভেতর লাল, এখনো মুখে লেগে আছে সেই স্বাদ!

দাদা-দাদি, চাচা-ফুপিদের সাথে ভেসেছি অজস্র আনন্দে। আমি পড়তে খুবই ভালোবাসি, আর রবিবার ছিল বাবার ছুটির দিন। রবিবার বাবা ছাড়া মন বসতো না কিছুতেই। এখনো মনে পড়ে বাবার কিনে দেয়া সুনীল গঙ্গপাধ্যায়ের 'ছুটির সানাই' বইটার মলাট, রং আর তুলি। তখন মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চলে গেলে বাড়ির ছাদে পাটি বিছিয়ে গল্প শোনাতেন মেজ চাচা, কী যে অপূর্ব স্মৃতি।

আমার নিজের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতেন মা, এ ঘর, ও ঘর করেই অমার খুবই ব্যস্ত দিন কাটতো। ক্যাপ্টেন প্ল্যানেট, মোগলী আর ম্যাকগাইভার দেখার অধীর অপেক্ষায় থাকতাম।

ছোটো কাকু ছিলেন স্কুলের ফার্স্ট বয়। ওঁর পড়াশোনার স্পৃহা, আমার অজস্র বই পড়ার অনুপ্রেরণার উৎস। উনি উপন্যাসের জায়গায় ধরিয়ে দিতেন প্রবন্ধ, যাতে মাথাটা খোলে। দাদার সুললিত কন্ঠের কোরান পাঠ দিয়ে দিন শুরু হতো, তারপর চলতো রবীন্দ্রসংগীত। যে কবির গুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম, তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। 'আহা আজই এই বসন্তে', 'তুমি রবে নীরবে', আরো কত গান!

আহা! মিরপুর আমার প্রাণের এলাকা আর ঢাকা প্রাণের শহর! মিরপুর এলাকাটি ছিল গাছ-গাছালি আর পাখিদের অভয়ারণ্য। উঁচু দালান-কোঠার সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আমাদের বাড়ি থেকে খুবই কাছে ছিল বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং তুরাগ নদীর বেড়িবাঁধ। নদী আর শুধুই সবুজ। কী যে স্নিগ্ধ, সুন্দর!

১৯৯৫ সালে আমাদের বাড়িওয়ালা ৩/২৭ বাড়িটি ছেড়ে দিতে বললেন। আমার বাবা ছিলেন অপ্রস্তুত, কারণ আদর যত্নে, ফুলে-ফলে, আবেগ এবং স্মৃতি-স্মৃতিতে ভরানো ছিল বাড়িটি। তখন আমি আমার অস্তিত্বকে নড়তে অনুভব করলাম। ভেতরটা ছিল দুমড়ানো-মোচড়ানো, কারণ ৫ম শ্রেনীতে পড়ার সময় স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় 'আমার শখের বাগান' নামে লেখা বের হওয়ায় বাবা আপ্লুত হয়ে এক ট্রাক ফুল গাছ দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন পুরো বাড়ি। ওখানে আমার সব প্রিয় ফুল গাছগুলো গন্ধরাজ, বেলি, হাসনাহেনা, আরো ছিল কালো গোলাপ সহ নানা পদের ফুল গাছ। ঐ পাষান্ড গন্ডার লোকটা খুন করলো আমার গাছগুলো আর আমার ক্ষুদ্র, কোমলমতি মন! তখন

আমার ভেতরে প্রথম জেগে উঠলো মেয়ে হিসেবে প্রথম আত্মদর্শন এবং এক অদ্ভুত স্বাধীনচেতা বোধের সাথে আমিত্বের তীব্র সুখবোধের দ্বন্দ্ব।

আমরা নতুন বাড়িতে উঠলাম, একই রোডের ১১ নম্বর বাড়ি। মোজাইক করা দোতলা বাড়ি। পরিবারের সদস্য বেশি হওয়ায় আমার বাবা বিশাল ড্রইং রুমকে তিন ভাগ করে আমাদের তিন ভাই-বোনকে একপাশ সুন্দর করে সাজিয়ে দিলেন। টেবিলে মা গুছিয়ে দিতেন প্রথাগত বই সহ সমসাময়িক লেখকদের বই। আমার দাদা ছিলেন ধর্মপ্রাণ এবং অসাম্প্রদায়িক মানুষ। ওঁর কাছে ছেলে-মেয়েদের মতামতের মূল্য ছিল সমান। আমার দাদি, মা, ফুপিদেরও ছিল নিজস্বতা এবং চিন্তার শৈলী। তবে আমার চিত্ত ছিল অশান্ত, আমি 'Virginia Woolf' এর মতো নিজের ঘর পাওয়ার জন্য যুদ্ধ করলাম। বাবা বারান্দার বাম দিকে থাই গ্লাস দিয়ে খুব সুন্দর একটি ঘর করে দিলেন।

আমার নিজের একটি ঘর, ভাবা যায়! এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আমার একটি নিজস্ব ঘর, সেখানে আমার ছবি আঁকার ক্যানভাস, হারমোনিয়াম, বেহালা, এ্যকুরিয়াম রঙিন মাছ, টেপ, পড়ার টেবিল আর আমার বই দিয়ে সাজিয়েছিলাম।

ফুপি-চাচাদের বিয়ে হচ্ছিল একে একে, তার ফলশ্রুতিতে আসতে থাকলো আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা। দাদাজান শিশু ভূমিষ্ট হলে আজান দিতেন শিশুর কানে। তখন বেশির ভাগ শিশুরাই জন্মাতো ধাত্রীর হাতেই। পাত্রে ভেজানো হতো মরিয়ম ফুল, সে এক কুদরতি ব্যাপার! কিন্তু আমাকে এই নিছক জৈবিকতা টানতো না। আমার বিশ্বাস, 'Sexuality is not only sex. Sexuality is always facilitated to connect one language between man and woman and marriage is a constitution and union between two souls with same state of mind.'

ঘটনার আবহে আমার জীবনের সব চাইতে কাছের বন্ধু, দাদাজানকে হারালাম। ওই দিনের মতো এই এলাকা, এই শহরকে এত অচেনা লাগেনি আমার কখনো। কেউ আর আমাকে বলবেনা- 'রঙ্গীলা, রঙ্গীলা, রঙ্গীলারে, আমারে ছাড়িয়া বন্ধু কই গেলা রে'।

দশ বছর ঐ বাসায় থেকে ২০০৫ বাসা পাল্টে পাশের সেকশনে ৪/সি, ৭ নম্বর বাড়িতে উঠলাম। সেখানে আমাকে বড় ঘর দেয়া হলো, আর সঙ্গী হলো দাদি। ২০১৪ নিজের

সিদ্ধান্তে বিয়ে করলাম। আমার স্বামী উচ্চ শিক্ষিত, অত্যন্ত বিনয়ী এবং স্থির চিত্তের মানুষ। ওঁর সাথে এই শহরে অনেক অনেক স্মৃতি। উনি আমাকে নিয়ে উঠলেন ওঁর ১৬৮/সি, গ্রীন রোডের বাসায়। আমি আমার মতো সাজিয়েছি আমার ঘর। যেখান থেকে আকাশ দেখা যায়, নিজের মতো নিশ্বাস নিতে পারি, মন খারাপ হলে কাঁদতে পারি। আমার নিজের একটা জগৎ।

নারী-পুরুষ বলে কথা না, সবারই একটা ঘর প্রয়োজন, যেখানে সে নিজেকেই আবিষ্কার করতে পারে। যেমনটি আমি পেরেছি। সদা বর্তমানে থাকার কী যে আনন্দ। আমার আজন্মের সাধ ভালো মানুষ হবো, চিন্তা করবো আর শিখবো স্রষ্টার ভাষা। তাঁর প্রেমেই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

সেথায় আমার শহর, আমার ঘর, যেথায় আমি আমার স্রষ্টাকে উপলব্ধি করতে পারি, যেথায় চিত্ত প্রশান্ত!

Monira Ahmed / মনিরা আহমেদ, Dhaka, Bangladesh

In my poem I tried to reflect my short story. And I think I can express my feeling by my poetry too. Please do comment and criticize me. I want to write more. Excited to listen from you. Thanks from bottom of my heart. Receive lots of respect and love.

আমার ঢাকা, আমার মীরপুর

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
জন্মেছি তোমারই বুকে
তোমারই রোদ, বৃষ্টি, শ্যামল ছায়াতলে
কাটাই অজস্র রাত, দিন আর দুপুর।

তোমার ধুলাতে প্রথম গড়াগড়ি

প্রথম শব্দ শিখা,
যাবো কি ভুলে? কাদা মাটি জলে
শুধু তোমারই নামটি লিখা।

২৬শে মার্চ, ১৬ই ডিসেম্বর আর ২১ শে ফেব্রুয়ারী
ভাই হারানো, বোন হারানোর
দুঃখ সইতে না পারি;
চেতনাতে থাকে বঙ্গবন্ধু, শেরে বাংলা আর ভাসানী
শুনি তবু কেনো দেশটা নাকি কিছুই দিতে পারেনি?

যে যা বলুক কি যায় আমার তাতে
দেশকে আমি দিতেই পারি, দিবোই বা না কেন?
যেমন নীরবে দেশ মা দিয়েছে
উর্বর মাটি, পানি আর ষড়ঋতু।
দিয়েছে ভাষা, রক্ত তাজা

মায়ের স্নেহ, শহিদের প্রেম,
রণাঙ্গনে বিসর্জন।

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
দাদার বক্ষে, দাদির স্নেহে
আমি দুলি দুল-দুল;
গল্প শুনি, কবিতা পড়ি
জীবনানন্দ, রবীন্দ্র আর নজরুল।

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
পুরান ঢাকার হাজীর বিরিয়ানী
ক্ষুধায় মধ্য দুপুর; জিভে লাগা স্বাদ!
মধ্য রাতের চাঁদ, আলোর ঝলমলানি
দেখে মনে হয় মাত্র সকাল, দেন-দরবার
ওখানে রাতই হয়নি!

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
আমার দাদির চুনের হাঁড়ি,
বুজি কিছু খাইছো বলা দুপুর।
দাদি নেই আজ তবুও আছে
ঘরের দেয়ালে চুনের দাগ লাগানি।
কে বলেছে দাগ খুব সুখ দেয় না
আমার অনেক সুখ;
সুখে কেঁদেছি, দুঃখে হেসেছি
দাদি-নাতনি মিলে কত
আমার দাদি, আমার বুজি
শুকতারাটির মতো
দাদির ময়লা-মলিন কাপড়ে মুখ ডলেছি কত!

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর

স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ করেও শেষ,
মেটেনা আশা, পাঠের তৃষা
আমি বড়ই আপসেট!
আছে বাবা-মা, ভাই-বোন আর স্বামী
সময় শিখিয়েছে সম্পর্কগুলোই দামী।
তারপর হায় কি যে ঘটে যায়
চিনিনা আমি কাউকে!
অনেকটা "Van Gogh" আর "The Starry Night" এর মতো।

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
আমার সমগ্র চেতনার উন্মেষ তোমাকে ঘিরে
আমি যেতে চাইনা ছেড়ে তোমায়
যতোই আদিম বলুক লোকে,
যাবো না আমি নিউইয়র্ক, প্যারিস, সানফ্রানসিস্কো।

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
আমি তোমায় ভালোবাসি;
যা পেয়েছি তা স্রষ্টার দান আর যা হারিয়েছি
তা তো ছিল ভুল বোঝাবুঝি।
তুমি আমাকে গ্রহণ করো, বেঁধো আমায় প্রেমে।

আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রাণের মিরপুর
আমি তোমায় ভালোবাসি;
আমি তোমায় দিবো অমার বিশ্বাস,
আমার জ্ঞান, বিদ্যা, প্রতিটি নিশ্বাস।
আমার প্রতিটি স্মৃতিতে তুমি,
তুমি আমার কাছে পৃথিবীর সব স্থানের চেয়ে দামি।
আমার প্রাণের ঢাকা, আমার প্রিয় মিরপুর
আমার বাংলাদেশ, আমার প্রিয়তম স্বদেশ
আমার মাতৃভূমি।

Nipa Rani Das / নিপা রানী দাস, Narayanganj Sadar, Bangladesh

Lifestyle of city people and my surrounding inspire me.

স্বপ্নের শহর, ভালোবাসার শহর

শহর জুড়ে কুয়াশা হয়েছে। চারপাশে স্তব্ধতা শীতের রাতকে আরো শীতল করে দিচ্ছে। এ চরাচর জুড়ে যেন এক বিশাল শূন্যতা। কোথাও কেউ নেই এমন অনুভূতি শীতের রাতকে আরো বিষণ্ণ করে দেয়। নিয়ন আলোয় চেনা শহরটা যেন অচেনা রূপে ধরা দেয়। আমার শহর নারায়ণগঞ্জ, বংলাদেশের ক্ষুদ্রতম জেলা। এই শহরে আমার বাস ২৭ বছর। আমার নিজস্ব জায়গা, পরিচিত গলি স্বস্তির নিঃশ্বাস সবই এই শহর ঘিরে। যদিও আমার জন্ম গ্রামে। শিকড়ের টানে গ্রামে যাওয়া হয়ে ওঠে না অনেকদিন। বহু বছরের চেনা শহর গ্রামকে ভুলিয়ে দেয় তা নয়। শহুরে জীবনের ব্যস্ততাই অবসর দেয় না। বন্দর নগরী হওয়ার কারণে আমার শহর যেন লোকে লোকারণ্য। বছরের দুটি ঈদ ছাড়া এর ফাঁকা রূপ চোখে পড়ে না। শহর মানেই যেন ছুটে চলা। গতিশীলতাই শহরের প্রাণ। গ্রামের শান্ত নিবিড় সৌন্দর্যের পরশ শহরে নেই। শহর গতির কথা বলে। সকালে বাসা থেকে বের হয়ে যখন রাস্তায় নামি, দেখি গার্মেন্টসকর্মী মহিলাদের ঢল নেমেছে রাস্তায়। প্রাণের স্পন্দন যেন তাদের চলার গতিকে দ্রুততা দান করে। স্বচ্ছল জীবনের হাতছানি তাদের চলার ভঙ্গিতে ক্ষিপ্রতা এনে দেয়। তাদের দেখে আমি অতীতে ফিরে যাই। একটা সময় ছিল যখন নারী স্বাধীনতা বলে কোন শব্দ ছিল না। নারী মানেই যেন পরগাছা, যাদের নিজের কোন বাড়ি নেই, শহর নেই। সেই অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে আজ, তবুও কিছু বৈষম্য কি রয়ে যায়নি? মেয়ে হওয়ার কারণে যখন নানা ধরনের সামাজিক বাধা পায়ে শিকল পরিয়ে দিতে চায় তখন মনে হয় আমরা কি সত্যিই স্বাধীন?

এ শহর কি আমার? স্কুলের পড়াকালীন সময় থেকে আমার শহরটাকে আমি একটু একটু করে চিনতে শুরু করেছি। এর ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে শুরু করেছি।

শীতলক্ষ্যা নদীর পাড়ের আমার এই শহর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত। তাই এখানকার সকল কর্মকাণ্ডেই নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ দেখা যায়। আমি মনে করি শহরে বাস করার কারণেই আমি পড়াশুনা করার সুযোগ পেয়েছি। শহরের অবাসন সুবিধা, যাতায়াত সুবিধা আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আমার মা বলতেন, আমার জন্মের তিন বছর পর তিনি গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার চিন্তা করেন, কারণ গ্রামে মেয়েদের পড়াশুনার, চলাফেরার সেই সুবিধাটুকু নেই যা শহরে আছে। আজ আমি যখন পেছন ফিরে তাকাই তখন বুঝতে পারি আমার মা কতটা ঠিক ছিলেন। আমার সমবয়সী চাচাতো-ফুফাতো বোনেরা অনেকেই গ্রামে থাকার কারণে বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছে। ইভটিজিং থেকে রক্ষা পেতে তাদের বাবা- মায়েরা তাদেরকে কৈশোরকালেই সংসার জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। গ্রাম বা শহর দুটোই আমার আপনতর হয়ে পড়েছে। এই শহরেও কি বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং নানা ধরনের অন্যায় নেই? আছে, এখানেও নারীর প্রতি সহিংসতা আছে। আছে ধর্ষণের মতো ক্যান্সার। আছে নারীদের নির্যাতনের হিংস্ররূপ। তবুও এ শহর যেন ল্যাম্পপোষ্টের আলোর মত স্বপ্ন দেখায়। পথ চলতে সাহায্য করে। আমার ২০ বছর বয়সে যখন আমার মা মারা গেল, বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। আমার সৎ মা আমাদের তিন বোনের কোন খরচই বহন করতে চাইলেন না। তখন আমি অথৈ সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। পড়াশোনাটাও বন্ধ হয়ে যেত যদি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়তাম। সেই সময়ে এই শহর আমাকে বাঁচিয়ে রাখলো। শহর বলতে তো শুধু ইট, কাঠ, ইমারত নয়। এর মানুষ, এর জীবনাচরণ সবকিছু মিলিয়েই তো একটি শহর। সেই কঠিন দিনগুলোতে নিজেই নিজের উপার্জনের পথ খুঁজে নিলাম। বন্ধুরা পাশে এসে দাঁড়ালো, নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। শহর আমাকে স্বাবলম্বী করেছে। যদিও মেয়ে বলে, এখনও বিয়ে করছি না বলে সমাজের মানুষের কটু কথা বন্ধ হয়ে যায়নি। একটু বেশি রাতে বাসায় ফিরলে প্রতিবেশী সহ পরিবারের মানুষের সন্দেহের চোখ এড়াতে পারিনি। তবু সবকিছু দেখেও থেমে যাওয়ার কথা ভাবতে পারিনি। রেলগাড়ি যেমন একটি নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে চলে, আমিও এগিয়ে চলি। আমার নিজস্ব কোন বাড়ি নেই, তাই যেখানটায় থাকি সেটাই আমার ঘর। এই শহরের প্রাণশক্তি হচ্ছে মানুষ। মানুষই এই শহরের চাকা সচল রেখেছে।

আর রেখেছে নদী। নদীকেন্দ্রিক শহরে বাস করার দরুন নদীর স্নিগ্ধ পরশ মনকে প্রশান্ত করে। নদী তো নারীরই আরেক রূপ। সে শুধু দিয়েই যায়। সমৃদ্ধ করে চারপাশের জীবন ও জীবিকাকে। নারী যেমন নিজেকে নিংড়ে দেয় পরিবারের জন্য`, সমাজের জন্য। ইতিহাস ঘেঁটে জানতে পেরেছি আমার এই শহরে কত সমৃদ্ধ জনপদ ছিল এক সময়। নদীর পানি ছিল স্বচ্ছ। বাতাস ছিল দূষণমুক্ত। আজ দেখি নদীর পানি দূষিত। বাতাসে সীসার পরিমাণ ভয়ংকর রকমের বেশি, শ্বাস নিতে গেলে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে ফুসফুস আর্তনাদ করে উঠে। নানা ধরনের অন্যায় যখন আমার শহরটাকে ঘিরে ধরে তখন আমার প্রাণে মোচড় দেয়, মনে হয় আমি বা আমার মত আরও যত নারী আছে তারা কতটা নিরাপদ। নারীদের জন্য নিরাপদ কোন জায়গা কি নেই? নেই কি নিশ্চিন্তে হেঁটে চলার মতো কোন পথ? যেখানে কোন পুরুষ বিনা কারণে কোন নারীর অঙ্গে ধাক্কা দেবে না বা দৃষ্টির লেহনে সংকীর্ণ করে দেবে না নারীর চলার পথ। যেখানে বাসে উঠতে গেলে নিজেকে পুরুষের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বুকে চেপে ধরে রাখতে হবে না ব্যাগ। পাশের সিটে যাতে কোন নারীই বসে সেজন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে কাতর মিনতি জানাতে হবে না। বেশি রাতে রাস্তায় হাঁটতে গেলে দ্রুত পা চালাতে হবে না এই ভেবে যে হঠাৎ বুঝি কেউ পথ আটকে দাঁড়াল। আমার দেশের শহরগুলো নারীর জন্য আজও এতটা নিরাপদ নয়। তবুও এই ভেবে আনন্দ পাই, ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমরা নরীরা ধীরে ধীরে জেগে উঠতে পেরেছি। আমার শহরের অনেক অনিশ্চয়তা থাকলেও এই শহর এই মানুষেরাই আবার আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। চলার পথ তো কখনো মসৃণ হয়না। আমার শহরে যদি অন্যায় থেকে থাকে তবে এখানে অন্যায়ের প্রতিবাদও আছে। পাশে দাঁড়িয়ে গলায় গলা মিলিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেওয়ার মনোভাব আছে। শহর আমাকে একা থাকার সুবিধাও দিয়েছে। কারও পদানত হয়েই থাকতে হবে, বাঁচতে হবে এ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছে। এই শহরের কোন এককোণে আমার নিজের ঘর আছে। যেখানে দিন শেষে আমি ফিরে যেতে পারি। আমি স্বপ্ন দেখি আমার শহর একদিন মুক্ত বায়ুতে পরিপূর্ণ হবে। সবুজের ছায়া স্নেহ মায়ায় জড়িয়ে রাখবে শহরের সকল প্রান্ত। নদীর জল হবে স্বচ্ছ। শিল্প-সংস্কৃতি, পেশা-বৃত্তি সকল ক্ষেত্রে নারীর পথ চলা হবে অবাধ, মুক্ত। সমতা শুধু মুখেই নয় সকল মানুষ

মননেও ধারণ করবে। সবাই সবার প্রাণে প্রাণ মিলিয়ে বাঁচবে। প্রাণের আলোয় মনের অন্ধকার ঢেকে যাবে। তারপর যে ভোর আসবে তা হবে আলোকিত ভোর, নতুন সকাল। সেই নতুন সকালের মিষ্টি আলোয় আলোকের ঝরনাধারায় প্রাণের স্পন্দনে শহর স্পন্দিত হবে। এই অবারিত আলোক ধারায় যা কিছু শুভ তা ভেসে যাবে। শুভ্র, সুন্দরের আগমন ঘটবে। সেখানে থাকবে না কোন হিংস্রতা, কোন ভয়। সবাই সুন্দর জীবনের স্বপ্নে নতুন পথে হাঁটবে। সেখানে কে নারী, কে পুরুষ তার বিচার হবে না। বিচার হবে মেধার, মননের। সবাই মানুষ বলে পরিচিত হবে। নারীদের চলার পথে থাকবে না কোন বাধা। কোন বিঘ্ন এসে পায়ে জড়িয়ে ধরবে না। পরিচ্ছন্ন শহর পরিচ্ছন্ন জীবনের হাতছানি দেবে। নারীরা তাদের সন্তানের জন্য সুন্দর স্বপ্ন দেখবে। শিশুরা ছিন্নমূল হয়ে ঘুরে বেড়াবে না এখানে সেখানে। ফুটপাতে শুয়ে থাকা অসংখ্য এতিম শিশুর মলিন মুখগুলোতে হাসি ফুটবে। আমি এমন এক শহরের স্বপ্ন দেখি, আমার শহর সবার জন্য নিরাপদ হবে। শহরের সকল সুবিধা সবার মাঝে সমানভাবেই ছড়িয়ে যাবে। এখানে কন্যা-শিশু হয়ে জন্মানোর কারণে পরিবারের লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে না। নারীর নিরাপত্তার জন্য পুরুষকে সঙ্গ দিতে হবে না। বরং সবাই সবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁচবে, হাসবে কাঁদবে। আমার স্বপ্নের শহরের এই রূপে কোন মাদক নামের কোন ধোঁয়া থাকবে না। এখানে জীবন শুরু করার আগেই ঝরে যাবেনা কোন নারী। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার দায় তাকে মাথা পেতে নিতে হবে না। স্বপ্ন মানুষকে পথ চলতে শেখায়, নতুন জীবনের হাতছানি দেয়। আমি আমার শহরের এই স্বপ্নময় রূপের কথা ভাবি। যা আমার পরবর্তী প্রজন্মের সকল নারীর জন্য আশীর্বাদ হবে। তাদের স্বপ্নগুলো এই শহরে আরও বড় ডানা মেলে সুদূরের পথে উড়ে যাবে।

Rezina Parvin / রেজিনা পারভীন, Dhaka, Bangladesh

I love to read. My reading habit inspired me to write, especially when it's something about women. My City My Home - this inspired me a lot because they give women a very big opportunity to express their feelings about their home and their state of mind.

আমার শহর আমার বাড়ি

আমার শহর আমার বাড়ি, এই বাক্যটা অনেক আঙ্গিকে আলোচনা করা যেতে পারে। সে আলোচনা পরে করা যাবে, আগে দেখে নিই সাধারন ভাবে প্রথমে বাক্যটা মনের ভিতর কোন অনুভূতির সৃষ্টি করে।

'আমার শহর'-এ আমার শব্দটা নিয়ে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই, 'আমার' এই শব্দটার অর্থ খুবই পরিষ্কার ভাবে বোধগম্য, নিজস্ব সবকিছুই আমার, যার উপর আমার স্বত্ব আছে। আর শহর বলতে আসলে এমন একটা জায়গা বোঝায় যেখানে জীবনযাপনের আধুনিক সব নাগরিক সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকে এমন একটি জায়গা।

'আমার বাড়ি'-র ব্যাপ্তিটা আসলে অনেক বড়, যার বিস্তৃতি আমার বস্তুজগৎ থেকে মনোজগৎ পর্যন্ত বিদ্যমান, কারণ বাড়ির সাথে মানুষের আবেগকেন্দ্রিক সম্পর্কের যোগ আছে।

এবার আসি আমাদের শহরের গল্পে, আমার জন্ম গাইবান্ধা শহরের অদূরে একটা গ্রামে, যেখানে আমার জন্ম এবং শৈশব কেটেছে। শহরের সাথে প্রথম ঠিক-ঠাক পরিচয় মাধ্যমিক স্কুলে উঠার সুবাদে, কারণ আমার মাধ্যমিক স্কুলটা গাইবান্ধা শহরে ছিল। এই পড়াশুনার সুবাদেই মুলত আমার শহরগুলো পরিবর্তিত হয়েছে একাধিক বার। যাই হোক, মাধ্যমিকের কঠোর বাঁধাধরা নিয়মের মাঝে শহরটাকে ঠিকমত চেনা হয়ে উঠেনি আর। এর পর সময়ের আবর্তে মাধ্যমিকের গন্ডি পেরিয়ে উচ্চ-মাধ্যমিকের পড়াশুনা শুরু, সাথে সাথে আমার শহরটারও

পরিবর্তন ঘটলো, রাজশাহী শহরে শুরু হলো আমার উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশুনা। রাজশাহী, পদ্মা নদীর কোন ঘেঁষে গড়ে উঠা এক শান্ত, সুন্দর শান্তির শহর, যে শহরটার প্রেমে পড়ে যাই আমি। কৈশোরের উচ্ছ্বাস পুরোটা যেন বাস্তবতা পেল এ শহরে। কৈশোর পেড়িয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হলো, তখন এ শহরটা ছাড়তে হবে বলে খারাপ লাগতে শুরু করল, কিন্তু অন্যান্য শহরগুলোর কিছু বিশ্ববিদ্যালেয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও তা বাদ দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম, কারণ রাজশাহী আমার ভালোবাসার শহর। উচ্চতর পড়াশুনা শেষ করে সময়ের প্রয়োজনে এ শহরটা আমার ছাড়তেই হলো একসময়। জীবনের গতিময়তায় ভীষন বিশ্বাস করি আমি, তাই আমার শহরগুলো পরিবর্তিত হতেই থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে ভবিষ্যতে আমি বিশ্বের যেখানেই থাকি না কেন এ শহরটাকে আমি ভীষনভাবে অনুভব করব সবসময়।

এবার আসি 'আমার বাড়ি' প্রসঙ্গে। বাড়ি বলতে প্রথমেই যে জিনিসটা আমাদের চোখে ভাসে তা হলো পরিবারের সদস্যরা মিলে যেখানে বসবাস করি এমন একটি কাঠামো। বাড়ি আসলে এমন একটি নিরাপদ বাসস্থল যার সাথে মানুষের জন্মের যোগ থাকে, এ জন্য 'বাড়ি' জিনিসটার সাথে মানুষের আবেগের খুব শক্ত একটা সম্পর্ক বিদ্যমান।

কারণ শুধুমাত্র বাসস্থানকেই বাড়ি বললে বাড়িকে খুব ক্ষুদ্রভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে যাবে। কারণ বাসাতেও আমরা নিরাপদে বসবাস করি, তা কিন্তু মানুষের বাড়ি নয়। কারণ বাসার সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে দেখা যায় বাসা হলো মানুষের অস্থায়ী বসবাসের স্থান, সাধারনত সেটার মালিকানার স্বত্ব তার থাকে না। দীর্ঘদিন কোন বাসায় বসবাস করলেও সেটা মানুষের বাড়ি হয় না। যেখানে মানুষের জন্ম হয় বা তার অতীত বংশধরেরা জন্মেছেন এমন একটি জায়গাই হলো মানুষের নিজের বাড়ি। আমার দৃষ্টিতে বাড়ি জিনিসটা যতটা না বস্তুগত তারচেয়ে বেশি অবস্তুগত অর্থাৎ মানসিক একটা বিষয়।

এবার আসি মেয়েদের জীবনে বাড়ি জিনিসটার ব্যাপ্তি প্রসঙ্গে। এই লেখার প্রতিযোগিতায় মেয়েরা অংশগ্রহণ করছে, তাই মেয়েদের জীবনে বাড়ি জিনিসটা কেমন অর্থ বহন করে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মেয়েদের প্রেক্ষিতে, তা নিজের ভাবনাতে তুলে ধরতে চাই।

বাংলাদেশের নারীদের চোখে নিজের বাড়ির প্রসঙ্গ আসলে পরিবর্তনশীল। আর মেয়েরা তার নিজের বাড়িকে চেনে কোনো এক পুরুষবাচক শব্দের বিশেষণের মাধ্যমে, যেমন বিয়ের আগে যেটাকে নিজের বাড়ি বলে চেনে তা বিয়ের পর হয়ে যায় 'বাবার বাড়ি', বাবার মৃত্যুর পর বাবার বাড়িটা হয়ে যায় ভাইয়ের বাড়ি। বিয়ের পর মেয়েরা স্বামীর বাড়িটাকে নিজ বাড়ি হিসাবে পরিচয় দেয়, আবার এখানেও দেখা যায় সেই পুরুষবাচক কোন বিশেষণ! মেয়েদের 'আমার বাড়ি' আসলে কোনটা!?

না, এই পুরুষবাচক শব্দ বা ব্যক্তিগুলোর সাথে আমার কোন লড়াই নেই, আমার আপত্তি এই সামাজিক মানসিকতায়, যেখানে আপন বাড়ির স্বত্ব মেয়েদের দেয়া থেকে বঞ্চিত করা হয় বিভিন্ন ভাবে। মেয়েদের আপনত্বকে এ সমাজ মানতেই পারে না, বিশেষ করে বাড়ির ক্ষেত্রে। যে বাড়িটাতে শৈশব, কৈশোরে হেসে খেলে বড় হয় মেয়েরা হঠাৎ করে তাদের জানানো হয় এটা তোমার আপন বাড়ি নয়, শ্বশুর বাড়িটাই তোমার আপন। এ সমাজটা এত কৃপণ কেন মেয়েদের বেলা? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সত্যি শ্বশুর বাড়িটাও মেয়েদের জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কিন্তু যে বাড়িতে মেয়েটার জন্ম হয় কেন এ সমাজ মেয়েটার বাড়ি হিসাবে তার স্বত্ব তাকে দিতে চায় না! আমার কথা, বাড়িটা যদি ভাই জালালউদ্দিনের হয়, সে বাড়িটা বোন জান্নাতেরও হবে। মানুষ যদি বাড়িটাকে জালালের বাড়ি হিসাবে চেনে, তাহলে সে বাড়িটা জান্নাতেরও বলে জানবে, বৈবাহিক অবস্থার জন্য যেন তা পরিবর্তিত না হয়। বাড়ির স্বত্ব সমান হবে, শুধুমাত্র বস্তুগত স্বত্ব নয়, মানুষ মানসিক ভাবেও সে স্বত্বকে স্বীকৃতি দেবে সমান ভাবে। বাড়ির ব্যাপারে যে আপনত্বের আবেগটা থাকে সেখানে মেয়েদেরও সমান অধিকার দিতে হবে।

পুরুষ বা নারী সবারই মানসিকতায় পরিবর্তন আনা খুব প্রয়োজন। আমরা যে সমান সমান সমাজের কল্পনা করি তা কখনোই সম্ভব হবে না যদি না আমরা নারী-পুরুষকে সমান মর্যাদার মানুষ মনে না করি।

নারী হিসাবে আমি চাই, অন্য কারও নামের বিশেষণে আমার বাড়িটাকে আমার কাছে যেন পরিচিত না করা হয়। আমার বাড়িটা এ সমাজ যেন আমার নামেই আজীবন পরিচিত করে। জন্মসূত্রে সমান মানুষ হিসাবে জন্মানো মানুষ হিসাবে সমাজের কাছে আমার এ দৃঢ় উচ্চারণ।

আমি চাই মানুষতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে সব মানুষের প্রথম পরিচয় 'মানুষ'ই হবে। নারীর আপন বাড়িটা তার নামেই এ সমাজ পরিচয় দেবে এবং এ সত্য সর্বস্তরে স্বীকৃত হবে। নারী-পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এ অদ্ভুত প্রতিযোগিতা একদিন বন্ধ হবে, সমতায় এ সমাজ এগিয়ে যাবে মেধা, মনন এবং ঐশ্বর্যে। পুরো পৃথিবীটা একদিন সবার জন্য নিরাপদ হবে। তখন পৃথিবীর প্রত্যেকটা শহর সব মানুষের আপন হবে, পুরো পৃথিবীটা মানুষের নিজের বাড়ি হবে।

স্বপ্নময় সমতার এ পৃথিবীটাই 'আমার বাড়ি' হবে।

Tiasha Chakma / শ্রীমতী তিয়াশা চাকমা, Nagasaki, Japan

My City My Home inspired me to express my celebration of Motherhood into words throughout a 30 years of journey from Khagrachari to Nagasaki.

আমার মা হয়ে ওঠা

ছোটবেলা থেকেই শুনতাম বাবা বলত, আমার দুই মেয়েই ডাক্তার হবে। একজন হবে রোগ সারানোর ডাক্তার, আরেকজন হবে জ্ঞানের ডাক্তার, পিএইচডি। আর আমি মনের গভীরে অনুভব করেছি, শিশুর জন্য ভালোবাসা।

একদিন স্কুল থেকে ফিরে আমি ঘরে বসে আছি। হঠাৎ মা বাইরে থেকে ছুটে এসে গম্ভীর হয়ে দুশ্চিন্তা চেপে রাখার চেষ্টা করতে করতে বসার ঘরে বসে রইল। বাবা অফিস থেকে ফিরলে নিজেরা কী সব ফিসফিস করে বলতে লাগলো। আমি শোনার চেষ্টা করেও উদ্ধার করতে পারলাম না। সন্ধ্যায় এক খালাত বোন এর সঙ্গে দেখা হতে জানলাম। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, কে মারা গেছেন, মা? একটু চাপাচাপি করতেই বলল বিস্তারিত।

- স্কুলের পাশের ব্রিজে একটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে। ঐ সময় কাছাকাছিই ছিলাম।

- কীভাবে, মা?

- গুলি করে। মোটরসাইকেলে করে এসে গুলি করে চলে গেছে।

মা কেন সেই ঘটনা বা ঘটনার উত্তেজনা লুকোতে চেয়েছেন আমার কাছে? অন্য মায়েরা তো বলত!

আজ বুঝি, মায়ের মা হওয়া হলো সন্তানকে সকল ভয়ংকর ঘটনা থেকে দূরে রাখা।

খাগড়াছড়িতে যখন স্কুল-কলেজে পড়তাম, তখন কেবল পড়াশোনা আর বই পড়া, গান শোনা আর নাচ-গান শেখা, এইই ছিল জীবন। বাবা-মায়ের ছায়াতলে কখন যে আঠারোটা বছর কাটিয়ে দিলাম টের পাইনি। মনে আছে, কলেজে ভর্তির সময় আমি

খাগড়াছড়ির গন্ডি ছেড়ে ঢাকায় পড়তে যেতে পারিনি বলে আমার সে কী প্রচন্ড রাগ! আমার সব বন্ধুবান্ধবরা যাচ্ছে, আমি কেন পারলাম না! আমার শৈশবের শহর তখন আর আমাকে নতুন যুগের হাওয়া দিতে পারেনি। তখন বাংলাদেশে কেবল মোবাইল কোম্পানিগুলো চালু হতে শুরু করেছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংযোগের বাইরে। এখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে নাকি সংযোগ দেয়া হবে না। ঢাকা-চট্টগ্রাম থেকে ফিরলে সবাই মোবাইলের গল্প করতো। দেশ যেখানে নতুন ফ্রিকোয়েন্সিতে আলাপ করছে, আমাদের তখন রেডিও টেলিভিশনের সীমিত প্রচারণার যুগ।

আমার কলেজ জীবনে বোনের বিয়ের পর দীর্ঘসময় মা আমার বিয়ের প্রসঙ্গে কথা বলেনি নিজে থেকে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতো, পড়াশোনা শেষ করে আগে চাকরি করবে। তারপর বিয়ে। অথচ আমার উৎসাহ ছিল গগনচুম্বী। কোনো লাভ হয়নি। মা নিশ্চুপ, সিদ্ধান্তে অটল।

আজ বুঝি, মায়ের মা হওয়া হলো সন্তানকে স্বাবলম্বী করে জীবনযুদ্ধে ছেড়ে দেয়া।

খাগড়াছড়ি পেরিয়ে জাহাঙ্গীরনগরে আসা ছিল জীবনের প্রথম মোড়। এখানে জীবন মানে ছিল অভিনয়, সংগঠন, বিভাগ, অনুষ্ঠান এ সবের চঞ্চল চর্চা। এত ব্যস্ততাও আমার নারী হয়ে ওঠার ভাবনাকে দমায়নি, বরং উদ্বুদ্ধ করেছে প্রতি পদে পদে। যৌন নিপীড়ন কী বুঝেছি, যৌন নিপীড়ন বিরোধী মোস্তফা আন্দোলন কিংবা সানি আন্দোলনে রাস্তায় নেমে স্লোগান দিতে গিয়ে জেনেছি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি; প্রতি মুহূর্ত ভাবিয়েছে, নারীর নারী হয়ে ওঠা কী!

এসবের মাঝেই একজনের ভাবনা আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। বান্ধবী শায়লা। বাসা ধামরাই। প্রতি সপ্তাহে ধামারাই থেকে এক সপ্তাহের জন্য হল–এ এসে থাকত। সপ্তাহ শেষে বাসায় ফিরত। আমরা থাকতাম ফজিলাতুননেসা হলে। বিকেলে চায়ের কাপে ধোঁয়ার সঙ্গ বা রাতের ভাতের প্লেটে অতিরিক্ত তরকারি ছিল আমার সাংসারিক জ্ঞান। প্রায়ই সংসার প্রসঙ্গে বিভিন্ন কথায় সে রসিকতা করতো। দুজনেই খুব উপভোগ করতাম। তবু আমার কানে বাজতো 'সংসার'। এই মেয়েটা কেন এত সংসার সংসার করে? একদিন জিজ্ঞেস করলাম। শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, একই সময়ের দুইজন মায়ের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে এত আলাদা হতে পারে?

-আমি ছোটবেলা থেকে এই শুনে এসেছি যে আমার সংসার হবে, সুন্দর চমৎকার একটা সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েছে মা চিরকাল। তাহলে আমি এখন কেন তা লালন করব না, বল?

- তিনি কি কখনও স্বাবলম্বী হওয়ার কথা বলেননি?

- বলেছে, ততটা নয় যতটা সংসার। বলেছে, জীবন চলার জন্য চাকরি হলেই হবে। তাই কেরিয়ার নিয়ে খুব একটা ভাবা হয়নি কখনও।

আমি তখন কেরিয়ার নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছি। বাংলা বিভাগে পড়ে সবচেয়ে ভাল কেরিয়ার কী হতে পারে আমি তাই মনে মনে খুঁজে বেড়াচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার স্বপ্ন দেখছি। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে পুলিশ হওয়ার কথা ভাবছি। আর শায়লার জীবনের লক্ষ্য একটা সংসার! নারীর নারী হওয়া মানে তবে কী? কেরিয়ার? সংসার? নাকি দুটোই? আজ বুঝি, মায়ের মা হওয়া মানে হলো, সন্তানের জন্য সুন্দর সুস্থ পরিবারের স্বপ্ন দেখা যেন সে একাকী জীবন না পায়। কন্যা সন্তান হলে তাকে ভাবী জীবনযুদ্ধ ও সঙ্কটের জন্য তৈরি করা।

অনার্স-মাস্টার্স শেষ করে যোগদান করলাম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম রাতের অনুভূতি বড়ো ভয়ংকর। জেমসের গান "জেল থেকে আমি বলছি" হয়ে উঠলো চরম সত্য। স্বাধীন জীবন থেকে হঠাৎ করে যেন কুয়োয় গিয়ে পড়লাম। খুব দ্রুত মানিয়ে নিতে শুরু করলাম। কিন্তু প্রচন্ড একাকিত্ব আমাকে জেঁকে বসলো। নির্জনতা হয়ে উঠল আমার দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত চিত্র। একাকিত্ব আমাকে আঁকড়ে ধরলো অক্টপাসের মতো হাত পা দিয়ে। শূন্যতা কেবল অন্তর নয়, আমার বহির্জগতকেও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল। ভিড়েও একাকীত্ব অনুভব করা হয়ে গেল আমার শখ। আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। এভাবে বছর দেড়েক যেতে না যেতেই কথার ফুলঝুরি আসতে শুরু করল, তুমি বিয়ে করবে না? কবে বিয়ে করবে? নিজের কমিউনিটির কাউকে বিয়ে করবে? নাকি বাঙালি বিয়ে করবে? বিয়ে করলে দেরি করো না। সন্তান ধারণে অসুবিধা হতে পারে। বিয়েতে আমরা সবাই থাগড়াছড়ি যাব। ইত্যাদি। ইত্যাদি।

আমি আবার অস্তিত্ব সংকটে পড়ে গেলাম। বিয়ে ছাড়া নারীর গতি নেই? কিন্তু বিয়ে করার জন্য তো আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত নই। পরিণত, তবু প্রস্তুত নই। নতুন একজন মানুষকে নিজের জীবনে ঠাঁই দেয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি আমার নেই। অথচ মা হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে কেন মুক্তি নেই? একাকী জীবনে জীবনসঙ্গীর চেয়েও একজন সন্তান তীব্র আকাঙ্ক্ষিত। এই আকাঙ্ক্ষায় না সমাজ বড় না রাজনীতি, না সংসার না পরিবার। সবচেয়ে বড়ো সত্য আমি মা হতে চাই।আমার নিম্নগামী স্নেহময় ভালবাসা কেবল সন্তানকে দিয়ে তাকেই পরিপূর্ণ করে তুলে পৃথিবীতে চিহ্ন রেখে দিতে চাই।

এরপর বিয়ে, ঢাকা আর কুষ্টিয়া আমার সংসার, অতঃপর মাতৃত্ব।

পাঁচ মাসের ছেলেকে দেশে রেখে চলে এলাম নাগাসাকিতে। নতুন শহর, নতুন মানুষ, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন ভাষা। অল্প সময়ের ব্যবধানে নাগাসাকিতে শুরু হলো ছেলে স্বামীকে নিয়ে সংসার। ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকা। প্রচণ্ড চঞ্চল ছেলের পেছনে অস্বাভাবিক সময় দেয়া। পড়াশোনা সব শিকেয় তোলা।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয়, জীবন বড় ক্ষণজীবী এক সত্য। কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের খাগড়াছড়ি জেলাশহরের পাহাড়ি বাতাবরণে বেড়ে ওঠা এক মেয়ে শিশু রাজধানী, জাহাঙ্গীরনগর, কুষ্টিয়া ছাড়িয়ে আজ জাপানের এক মফস্বল শহরে জানালা দিয়ে চেরি ব্লসম দেখছি।

তবু কোথায় যেন শূন্যতা অনুভব করি। তবু নাগাসাকির বিষন্ন দুপুরগুলোতে ঢাকা-খাগড়াছড়ি রোডের বারৈইয়ার হাটের পর দু'পাশের ঘন সবুজ গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে দূষণহীন নির্মল বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে বাড়ির দিকে যাওয়ার তীব্র ইচ্ছা বারবার মাথাচাড়া দেয়। তবু নাগাসাকির বরফঝরা ভোরগুলোতে মনে হয়, ছেলেকে একবার সেই পথের সন্ধান দিতে না পারলে আমার সমগ্র সত্তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়বে। আমার সেই ছেলেবেলার শেওলা-ধরা উঠোন কিংবা বিয়েবেলার উঠোনের টকপাতা-কামরাঙা-জাম্বুরা-কলাপাতার মেলায় আর জবার ঝোপের আড়ালে ছেলেকে একবার হারিয়ে যেতে না দিলে যেন ব্যর্থ হবে তিলে তিলে অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত চিরন্তন মাতৃত্ব।

Aditi Das / অদিতি দাস, Sylhet, Bangladesh

The attachment between my city and me inspired me much to write up this article. The term 'MY CITY MY HOME' inspired my work greatly, because I love my city, I belong to this city and this is my origin.

প্রিয় শহর আর সর্বনাশা অক্টোবর

আমার শহরটা আমার কাছে আমার ঘরের মতই ছিল। প্রিয় শহরকে নিয়ে যখন লিখছি তখন আমি অদ্ভুত এক আঁধার সময় পার করছি। হ্যাঁ, কোভিড-১৯ এর কারণে পুরো পৃথিবীই এখন দুঃসময় পার করছে। কিন্তু আমার জন্য সময়টা তার চেয়ে কঠিন, তার চেয়েও নির্দয়।

লেখাটা যখন লিখছি তার ঠিক দুই মাস আগে একদিনের ব্যবধানে আমাকে হারাতে হয়েছে মা ও বাবাকে। যে শহরে আমার জন্ম, যেখানে আমার বেড়ে ওঠা, শৈশবের বর্ণিলতা, কৈশোরের দুরন্তপনা আর যৌবনের আনন্দ-বেদনা যে শহরের আলো-বাতাসে মিশে আছে, নিজের হাতের রেখার মত যে শহরটাকে চিনি, সেই শহরটা আজকাল আমার কাছে বড্ড অচেনা লাগে।

সবকিছু রুপালী পর্দার বিচ্ছেদ গল্পের চেয়েও করুণ মনে হয়। বাবার হাত ধরে প্রথম স্কুলে গিয়েছিলাম। সিলেটের স্বনামধন্য বিদ্যাপীঠ ব্লু বার্ড স্কুলেই আমার শিক্ষা জীবনের শুরু হয়েছিল। স্কুলের সময়টা আমার জীবনে সবচেয়ে মধুময় ছিল। আমার বাবা নিকুঞ্জ বিহারী দাস ছিলেন এই স্কুলের গণিতের শিক্ষক। সবার প্রিয় 'নিকুঞ্জ স্যার'। মা ও ছিলেন এই শহরের একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

করোনাভাইরাস মহামারী নানাভাবে ক্ষতিসাধন করেছে পৃথিবীজুড়ে। কিন্তু আমার মত ক্ষতিগ্রস্থ খুব কম মানুষই হয়তো হয়েছেন। আমি হারিয়েছি আমার মা ও বাবাকে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস – মাসটা ছিল অক্টোবর। আমার জন্মমাস। অক্টোবর তাই আমার কাছে বরাবরই প্রিয়, আলাদা, আহ্লাদের। কিন্তু আমি কি আর কখনও ভেবেছিলাম – এই অক্টোবরই হবে আমার সব সর্বনাশের নাম?

ঢাকায় সাংবাদিকতা করতাম। মা আর বাবা সিলেটে একা থাকতেন। চলতি বছরের মার্চে বাবার ক্যানসার ধরা পড়ে। চিকিৎসা শুরু হতে না হতেই করোনার বিস্তার ও দেশজুড়ে লকডাউন। মা একা একা সবদিক সামাল দেন। আমি তখন ঢাকায় আটকা পড়ি। পরিচয় ওয়ার্কিং ফ্রম হোম এর সাথে। কাজ করি, কিন্তু বাবা-মা'র জন্য দুশ্চিন্তা হয়। এভাবে কাটে সাড়ে ৩ মাস। ক্যানসার আক্রান্ত বাবাকে নিয়ে একা একা মা পেরে উঠছিলেন না। তাই জুলাই মাসে সিলেট চলে আসি। সিলেটেই 'ওয়ার্কিং ফ্রম হোম' করছিলাম। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে অফিস থেকে জানানো হলো আর হোম অফিস নয়, অফিসে কাজে যোগ দিতে হবে। কিন্তু বাবা-মাকে এ অবস্থায় রেখে যেতে মন কিছুতেই মানছিল না। অবশেষে চাকরি ছেড়ে দিলাম অনেকটা বাধ্য হয়ে।

৭ অক্টোবর ছিল 'দুষ্কাল প্রতিরোধে আমরা'র আয়োজনে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের প্রথম দিন। আমি আর গৌতমদা বেলা ৪টা নাগাদ সিলেট কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে যাই। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে দেখি মায়ের জ্বর। ৯ তারিখ আন্দোলনে যোগ দিতে আবারও শহিদ মিনারে যাই। সেদিন সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পর আমার জ্বর আসে। বাবার জ্বর কিংবা কাশি কিছুই ছিল না। ১২ তারিখ বাবা-মা ও আমি কোভিড টেস্টের জন্য স্যাম্পল জমা দিই বাসাতেই। তিনজনেরই রেজাল্ট পজিটিভ আসে। ১৬ তারিখ সকালে মার তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে তাঁকে শহিদ শামসুদ্দিন আহমেদ হাসপাতালের (সদর হাসপাতাল) আইসিইউতে ভর্তি করি। ক্যানসার আক্রান্ত বাবাকে দেখভালের জন্য কেউ নেই বাসায়। মিষ্টি মাসির (মায়ের ছোটবোন) পরামর্শে বাবাকেও হাসপাতালে ভর্তি করাই। গৌতমদা আর আমার মামাতো ভাই শুভম বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।

সিলেটে আত্মীয়, বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। কিন্তু কোভিডের এই সময়ে কাকে পাই! দুই-একজন বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষী যে ঝুঁকি নিয়ে পাশে দাঁড়াননি তেমন নয়। তাঁদের কথা আর আলাদা করে বলতে চাই না। নিজে করোনা আক্রান্ত হলেও রোগীর অ্যাটেন্ডেন্ট হিসেবে আমাকেই থাকতে হচ্ছে। বাবা হাসপাতালের এক জায়গায়, মা আরেক জায়গায় আইসিইউতে। একই সঙ্গে দুই জায়গায় রোগীর খেয়াল রাখা তখন আমার জন্য ভীষণ কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া চিকিৎসক বা নার্স বললেই ফার্মেসিতে ছুটে যাওয়া। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়েছি।

২৬ অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিন পরপারে পাড়ি জমান মা। মারা যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় মা'র ব্লাড প্রেশার লো হয়ে গেল, এত লো যে মেশিনও তা রিড করতে পারছিল না। আমাকে ছুটতে হলো মেডিসিন, স্যালাইন কিনতে। রাত সাড়ে ১২টায়ও মেডিসিন এনেছি। আমি তাই শোক করতে পারিনি, মার হাত ধরে একটু বসে থাকতে পারিনি। তখন মাঝরাত হবে। মনিটরে বিপি দেখাচ্ছিল নিচেরটা ২৭, উপরেরটা কিছুই দেখাচ্ছিল না। আমি আতঙ্কে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলাম অনেকটা নিরুপায় হয়ে। ক্লান্ত শরীরে একটু কি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম? হঠাৎ মনে হলো কেউ এসেছে, ধরমড় করে ওঠে বসলাম। দেখলাম একজন ডাক্তার ও নার্স। পরীক্ষা করে দেখছিলেন জীবিত না মৃত। ডাক্তার যখন নিশ্চিত হলেন, আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন আর মাথা নাড়লেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলাম। তখন ভোর সাড়ে চারটা থেকে পৌনে ৫টার মাঝামাঝি একটা সময়। মৃত্যুর খবর প্রথম জানিয়েছিলাম গৌতমদাকে মোবাইলে কল দিয়ে। বলেছিলাম মিষ্টি মাসিকে জানাতে। আমার সাহস হচ্ছিল না তাঁকে জানানোর। দাদা জানানোর পর মিষ্টিমাসি আমাকে কল দিয়েছিলেন। স্বান্তনা দিয়ে বলেছিলেন, 'অনেক চেষ্টা করেছিস মা, এর চেয়ে বেশি আর কিছু করার ছিল না।' কথা বলতে বলতে দুজনে কেঁদেছিলাম। ৫টার একটু পরে গৌতমদা এসে কল দিলেন। বের হয়ে দেখলাম দাদা আর কার্তিক কাকু। তখন আমরা ভাবছিলাম এত সকাল, দাহ কীভাবে হবে। আমার একমাত্র ভাই ভারতে থাকে। সে বলেছিল মাকে দেখবে। আইসিইউ থেকে বের করার পর করিডোরে যখন মাকে আনা হয় তখন তাকে ভিডিও কল দিই। মোবাইল স্ক্রিনেই মাকে শেষ দেখা দেখে নেয়। করোনার ভয়াবহতার মধ্যেও ঠিক ভাবেই শেষ হয় সৎকার কাজ। বেলা বাড়তে বাড়তে শ্মশানে পরিচিত মুখগুলোও জড়ো হতে থাকে। সৎকার কাজ শেষে শ্মশান থেকে ফিরলাম হাসপাতালে। বাবাকে ডিসচার্জ করিয়ে বাসায় নিয়ে এলাম। তখন কে জানত পরদিন সকালে বাবাও চিরদিনের মতো চলে যাবেন আমায় ছেড়ে।

যখন সিংগাপুর ছিলাম বা ঢাকায়, তখন পিছুটান বলতে ছিলেন বাবা-মা। সারাক্ষণ তাদের কাছে চলে আসতে মন চাইত। এই ডিসেম্বরেই চাকরি পেয়েছি নিজ শহর সিলেটে। অথচ এখন আর আমার কোনো পিছুটান নেই।

আজকাল শহরটাকে কেমন অন্যরকম লাগে। খুব মন চায়, মায়ের সঙ্গে সবকিছু শেয়ার করি-আগে যেমন করতাম। আমার কত গল্প জমে আছে-আর কখনও বলা হবে না মাকে। শরীর খারাপ হলে কেউ অস্থির হয়ে উঠবে না। জ্বর হলে কেউ মাথায় পানি ঢালবে না। যখন নিউজ লিখব বা অন্য কোনো লেখা, তখন ল্যাপটপের পাশে কেউ এক কাপ চা রেখে যাবে না। মা দুর্গা পূজায় দুর্গা বাড়িতে যেতে চেয়েছিলেন। অথচ দশমীর দিন দুর্গা মায়ের বিসর্জনের দিনেই মা চিরবিদায় নিলেন। আমার মনে শুধুই প্রশ্ন জাগে, কেন আমার জন্ম মাসে, কেন দুর্গা পূজাতেই বাবা-মা চলে গেলেন?

কোভিড আমাদেরকে নতুন করে দেখিয়ে দিল-মানুষ মাত্রই একা। বাসা থেকে অফিসে আসা-যাওয়ার পথে প্রতিদিনই সদর হাসপাতালের সামনে দিয়ে যেতে হয়। মনে পড়ে যায় হাসপাতালের ভয়ংকর দিনগুলোর কথা। করোনা আইসোলেশন ইউনিটে থাকা না লাগলে আইসোলেশন শব্দটার আসল অর্থ হয়তো বুঝতে পারতাম না।

ঢাকায় দেড় বছরের বেশি সময় থেকেও আবার সিলেটে চলে আসেন বাবা-মা। আমার ভাই ভারতে স্থায়ী হলেও তারা কখনও সিলেট ছাড়ার চিন্তাও করেননি।

এই লেখাটা হতে পারত সিলেটের ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, মানুষ, প্রকৃতি নিয়ে। কিন্তু এ বিরাট ধাক্কার পর আর অন্য কোন কিছু নিয়ে লিখতে ইচ্ছা করল না। এই সিলেট আমার যতটা প্রিয় তারচেয়ে ঢের বেশি প্রিয় বাবা-মায়ের।

Khadija Parvin / খাদিজা পারভীন, Jashore, Bangladesh

মানুষই একমাত্র সত্যের নিয়ামক, অন্যথায় সত্যের কোন মূল্য নেই। এই উপলব্ধি থেকেই আমার লেখা।

আমার বাস্তুভিটা

আমি জমিলা।

নিতান্ত দরিদ্র ঘরের মেয়ে একটা আমি। কোন বিশেষত্ব নেই। বড্ড সেকেলে। আমি আজ যুক্ত আছি একটি কারখানার সঙ্গে, সেখানে আমায় নিত্যদিন শ্রম বিনিয়োগ করে জীবন বাঁচাতে হয়। নিয়তি আমাকে নিতান্ত হাত ধরে, চোখে আঙ্গুল দিয়ে এই স্থানটি দেখিয়ে দিয়েছে। আর বলেছে, এই স্থানটি তোমার জন্য যথার্থ। শহর, নগর, সভ্যতা, ইট-পাথরের দালান-কোঠা সবকিছু ছেড়ে এক পড়ন্ত গ্রামের দেহের বুক চিড়ে মেঠোপথ ধরে, দিগন্তের কাছাকাছি একটি ছোট্ট বাড়ি আমার। গ্রামের নাম জীবনতলী। বড্ড ছোট গ্রাম আমার, পৃথিবীর কোন সভ্যতার ছিটেফোঁটাও লাগেনি সেখানে। না ইলেকট্রিসিটি, না টেলিগ্রাম, না লেখাপড়ার সুব্যবস্থা, না বড়-বড় দালানকোঠা। এই ছোট্ট গ্রামের এক ভেতো বাঙালি মেয়ে আমি। এই ইট-পাথরের শহরের চার দেয়ালের মাঝে মেশিনের সাথে নিত্যদিন ওঠাবসা করতে করতে, সেই ভেতো বাঙালি মেয়েটি কবে যে নিজেই মেশিনে পরিনত হয়েছে, সে খবর তার নিজেরই জানা নেই!

যখন সন্ধ্যার আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে আসে, সারা শহর ঘুটঘুটে কালো অন্ধকারে ঢেকে যায়, তখন চোখের কোণটা চকচকে হয়ে ওঠে, বাড়ির ভিটেটার জন্য। হু-হু করে মনে পড়ে যায়, অতীতের দিনগুলির কথা। মনের মধ্যে আঁকিবুঁকি কেটে যায় সেই স্মৃতিগুলো। ছোট্ট একটা বাড়ি ছিল আমাদের। থাকতাম তো আমি, বাবা আর মা। এর জন্য আর কতোটুকুন জায়গা লাগে? গাঁয়ে পথের ধারে বাঁশের খুটি দেওয়া পরচালা যুক্ত দিব্যি পরিপাটি একটা বাড়ি। অন্যের কাছে খুবই সামান্য হতে পারে কিন্তু আমার কাছে স্বর্গের মতো। বাড়ির সামনে কাঠা দু'য়েক জায়গা ঘিরে চারদিকে ভাঙা ফাটা প্রাচীর।

ঘরের মধ্যে নানা রকমের আসবাবপত্র ছিল, ঘরের দুই কোণে দুটি ভাঙা খাট, তাতে বেছানো খান দুই ছেঁড়া মাদুর, কানাভাঙা কলসি, দুটো টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাস, দুটো পায়া না থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের গায়ে সমবায় সমিতির মতো হেলান দেয়া চেয়ার কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের দু'দিকে গচ্ছিত দু'টো দামি সম্পদ ছিল, একটা বাবার অপরটি মায়ের। বাবার ছিল পুরাতন আমলের কয়েকটি বই। বাবা বড়ো কম পড়তে জানতো। তবে বইকটা ছিল বাবার বুকের এক-একটা পাঁজরের হাড়। বাবা বই পড়তো আর মাঝে মাঝে বইটা বুকে জড়িয়ে, দেয়ালে হেলান দিয়ে, দুচোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবতো। বলতাম, "বাবা কী ভাবছো?" বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে বলতো "জমিলা, লেখাপড়ার যে কত মূল্য মা! এই বইক'টা যে কতো দামি আমার কাছে!" বাবার এই অমূল্য সম্পদের কোনই মূল্য ছিল না, মায়ের কাছে!

আর মায়ের ছিল একটা ছোট্ট মাটির ব্যাংক। সবটুকুন দুঃখ–কষ্ট নিংড়ে যতটুকুন পয়সা পারে, সেখানে জমিয়ে রাখে। সেই ব্যাংকের মালিক, ম্যানেজার, সিকিউরিটি সবই আমার মা ছিলেন। আমিতো দূরের কথা, বাবারও এর ধারে-কাছে ঘেঁষতে মানা!

এই দুই সম্পদের মাঝে আর একটি দামি সম্পদ ছিলাম আমি তাদের। আমাকে যেন দু'জনে চোখে হারায়। দু'জনের চোখের মণি ছিলাম। শৈশবকালে বাবার সাথে এক বিছানায় ঘুমিয়ে, অর্ধেকরাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে, ছোট্ট হাত প্রসারিত করে যখন বাবাকে খুঁজতাম, তখন বাবা বলতো, "এইতো আমি এখানে!" তখন বাবার বুকে মুখটি গুঁজে গুমরে গুমরে কাঁদতাম। বাবা বলতো, "কী স্বপ্ন দেখেছিস? বল আমাকে?" বাবাকে বলতেই পারতামনা। এই ঘরে আমরা চারটি প্রাণী ছিলাম। ওহ! আর একটা প্রাণী, ওতো আমাদের কালু, মানে আমাদের পোষা কুকুর। কালু বড্ড ভালো ছিল। সারারাত জেগে আমাদের বাড়ি পাহারা দিত। আমি খেলতে গেলে কালুও আমার সাথে পিছুপিছু যেত। খেলা শেষে যখন বাড়ি ফিরতাম, দেখতাম কোথা থেকে সে ঠিক জুটে যেত। বাবা যখন হাট থেকে বাড়ি ফিরতো, দেখতাম বাবার পিছুপিছু আছে ও। কালুর কথা খুব মনে পড়ে এখন। কে জানে, কোথায় থাকে এখন!

আমাদের বাড়ির চারপাশ সবুজ গাছগাছালিতে ঘেরা। একজন আরেকজনকে জড়িয়ে

যেন আত্মীয়ের মতো বেঁচে আছে এরা। আমার বাড়িটাকে যেন আগলে রেখেছে। ঘরের পুবদিকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল। বসন্তে কী যে তার রূপের বাহার! যেন সারা বাড়িটাকে সাজিয়ে রাখতো। পাড়ার ছেলে–মেয়েরা কত আসতো আমাদের বাড়িতে। একসাথে খেলতাম, কৃষ্ণচূড়ার ফুল দিয়ে সাজতাম, কত হৈচৈ! মায়ের কান ঝালাপালা হয়ে যেত। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই দিনগুলো! এখন সবই অতীত।

বাড়ির সামনে একটু দূরে, গ্রামের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে গেছে। চৈত্র মাসে নদী যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। নদীকে দেখে অনেক বুড়ো লাগতো যেন! মনে হতো নদীর যেন অনেক বয়স হলো! কিন্তু, বর্ষাকালে নদী যেন ভরা যৌবন নিয়ে ফিরতো। চৈত্র মাসে নদীতে মধুমেলা বসতো। মা মেলায় যেতে দিত না! বলতো, "মুসলমানদের মেলায় যেতে নেই"।

বাবার জন্য প্রায় যাওয়া হয়ে যেত। বাবার স্বপ্ন ছিল আমাকে নিয়ে অনেক। বাবা বলতো, "জমিলা তোকে আমি লেখাপড়াটা শেখাবো, আইন নিয়ে পড়াবো তোকে"। ঠিক তখনই অপরদিক থেকে একটা তিরস্কার ভেসে আসতো – মা বলতো, "হুহ! চাষার বেটির আবার আইন নিয়ে পড়া! ওহ্, আমার যদি একটা ছেলে থাকত!" এটা বলে মা চুপ হয়ে যেত। বুঝতাম না মায়ের ছেলের ইচ্ছেটা কেন এত প্রবল ছিল। বাবা বলতো, "জানিস জমিলা, মানুষই একমাত্র সত্যের নিয়ামক। অন্যথায় সত্যের কোন মূল্য নেই"। বাবার কথা আমি কিছুই বুঝতাম না।

এত স্বপ্ন দেখা সত্য চোখগুলো একদিন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল! এক মহামারী কলেরায়, বাবা-মা দুজনেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। গ্রামের অনেকেই সেবার মহামারীতে মারা গেছিল। বাবা-মা দুজনেই খুব অসুস্থ ছিল। সেই রাতে বাবা একটু পানি চেয়েছিল আমার কাছে, পানি নিয়ে ফিরে এসে দেখি, বাবা-মা দুজনেই চুপ। বাবার কাছ থেকে শোনা "বায়েজিদ বোস্তামির" গল্পের মতো আমিও পানি হাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেই রাতে, বাবা-মার পাশে। হঠাৎ পাশের বাড়ির এক চাচি এসে বললো, "ও জমিলা! জমিলা রে? তোরা কই গেলি? ওদিকে ঝন্টুর মা নাকি মা...রা......"।

আমি বললাম চাচি, "চুপ করো, বাবা-মা ঘুমাচ্ছে"। চাচি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো,

"পোড়ামুখী! তোর মা-বাবা যে ম...রে...ছে..."। দমকা হাওয়ায় আলো নিভে গেলে, অন্ধকার যেমন প্রকট হয়ে উঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই সমস্ত ঘর সকল দিক গুম হয়ে উঠলো। কতদিনের চেনা মুখগুলো, আজ অচেনা লাগলো। ঘরের উপর দিয়ে একটা কাক, কা-কা করে চলে গেল। সমস্ত আকাশটা যেন ছেঁড়া চটের মতো চচ্চর করে ছিঁড়ে গেল! কয়টা কুকুর উঠানে থেকে-থেকে কেঁদে উঠছে। সেই রাতেই চাচি আমাকে নিয়ে পালিয়ে আসে এই শহরে। পরে জানতে পারলাম, আমি ওখানে থাকলে আমার ওয়ারিশগন আমাকে বাঁচতে দিত না!

সেই রাতে পিছু ফেলে এসেছিলাম আমার বাস্তুভিটা, আমার সবকিছু। পিছু ফিরে দেখেছিলাম আমার ঘরটা, দেখলাম কৃষ্ণচূড়া গাছটা থেকে ফুল ঝরছে। কিন্তু মনে হচ্ছিল ফুল নয়, ওর বুক থেকে রক্ত ঝরছে! তারপর আর পিছু তাকাইনি। কিছুদূর গিয়ে দেখি, কালু পিছুপিছু আসছে। রাতের আঁধারে দেখতে অসুবিধা হয়নি, দেখলাম আমার ভাঙা স্কুলটি। সব স্বপ্ন আজ ভেঙে গেছে। পৃথিবীর বুক থেকে আকাশের কোল পর্যন্ত কূলহীন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কালুকে আর দেখতে পেলাম না। তারপর চোখ মেলে প্রথম আলোয় এই শহর দেখা। এখন মনে হয়, আমার নাম নেই, স্থান নেই, আমার গল্পেরা মিথ্যে হয় প্রতিদিন। আমাকে প্রতিদিন লড়াই করে আমার প্রতিটা গল্প জিততে হয়। ভালোবেসে তবু নিজের ভিটে-বাড়ি খুঁজি, খুঁজি নিজের পরিচয়। দুঃখ-সুখে আমার স্থান চাই, আমার নাম চাই! আর চাই আমার গল্পেরা সত্যি হোক।

Nishita Das / নিশিতা দাশ, Moulvibaza, Bangladesh

Beauty of the historical lake Kamalarani in my region is my inspiration to write about it.

দীঘির নাম কমলারাণী

সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি। অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই সবুজ শ্যামল দেশের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই বারবার। আমাকে স্পর্শ করে যায় ঢাকার বুড়িগঙ্গা, কিংবা চট্টগ্রামের সুউচ্চ পাহাড়, দীর্ঘতম সমুদ্র বন্দর কক্সবাজার, রাজশাহীর আমের বাগান, খুলনার সুন্দরবন আরো কত কী। তবু যদি প্রশ্ন করা হয় সবথেকে প্রিয় বলতে কি কিছুই নেই? আমি বলব আছে। দুটি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ, উঁচু উঁচু পাহাড় টিলা, নদী, নালা, খাল, বিল, হাওড়, বাওড় ত্রিমাত্রিক জেলা মৌলভীবাজার। আমি শতবার সহস্রবার এই অঞ্চলের প্রেমে পড়ি।

কবি শামসুল হক তাঁর কবিতায় বলেছেন, আমি তো এসেছি কমলার দীঘি মহুয়ার পালা থেকে। কবির লেখনীতে উঠে আসা সেই কমলার দীঘিকে নিয়ে লোকমুখে শোনা সেই ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়েই এই লেখা।

এ দীঘিকে নিয়ে রয়েছে এক কিংবদন্তি। এ দীঘিটি রাজনগর উপজেলা সদর থেকে ১৪ কি.মি দূরে রাজনগর ইউনিয়নের ঘরগাঁও গ্রামে অবস্থিত।

ইটা রাজ্যের রাজা সুবিদ নারায়ণ ছিলেন খুবই প্রজাবৎসল, সাহসী ও সংস্কারপন্থী। তাঁর ছিল অপরূপ সুন্দরী রানী – নাম কমলারানী, যাঁর রূপে মুগ্ধ ছিলেন রাজা সুবিদ নারায়ণ। রাজার ছিল ৫ পুত্র ও ৩ কন্যা। সুখে-আনন্দে কেটে যাচ্ছিলো রাজা-রানীর সংসার। তবে একটা বিপত্তি ঘটলো। রাজ্যে দেখা দিল জলের অভাব। প্রজাবৎসল রাজা সুবিদ নারায়ণ পড়লেন মহা দুশ্চিন্তায়। কী করে বাঁচাবেন প্রজাদের?

এক রাতে রাজা স্বপ্নাদেশ পেলেন যে তাঁকে একটা দীঘি খনন করতে হবে, যাতে প্রজাগণ সুপেয় জল পান করতে পারেন।

রাজা তাঁর এই স্বপ্নের কথা প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে জানান। কমলারানী উৎসাহ যোগালেন। মহাধুমধামে শুরু হলে দীঘি খননের কাজ। কথিত আছ – দীঘি খননের প্রথম কোদালের কোপ-দাতাকে রানী তাঁর গলার হার উপহার দেন।

একসময় শেষ হলো প্রত্যাশিত দীঘি খননের কাজ। কিন্তু একি আশ্চর্য কান্ড! দীঘিতে একফোঁটা জলও নেই। চারদিকে ছড়িয়ে গেল এই খবর। অপমানে দুঃখে দিশেহারা রাজা সুবিদ নারায়ণ। কমলারানীও চিন্তায় পড়লেন। কী করবেন এবার?

আবারও স্বপ্নাদেশ এলো রাজার কাছে, "যতক্ষণ সুন্দরী প্রিয়তমা স্ত্রী কমলারানী দীঘিতে নেমে গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে পুজো না দিচ্ছেন, ততক্ষণ জলশূন্য থাকবে এ দীঘি"। রাজা তাঁর প্রাণের রানীকে জানালেন স্বপ্নাদেশের কথা। রাজার সম্মানার্থে, প্রজার প্রয়োজনে রানী রাজি হলেন। শোনা যায় রানীর কোলে তখন ৩ মাসের ফুটফুটে শিশু। রাজা রাজ্যের বিজ্ঞ পন্ডিতদের সাথে পরামর্শ করে দিনক্ষণ ঠিক করলেন।

অবশেষে এলে সেই দিন। ভোরের আলোয় আলোকিত দিন। লোকে লোকারণ্য চারদিক। ঢাক, ঢোল, কাঁসর বাজছে। কমলারানী চললেন দীঘিতে জল আনার উদ্দেশ্যে। স্তবস্তুতিতে আহ্বান করলেন মা গঙ্গার। রানীর প্রার্থনায় দীঘি পূর্ন হতে লাগলো জলে। এ'যেন এক স্বর্গীয় দৃশ্য। রানী যখন দীঘির মাঝখানে পৌঁছলেন, অমনি কলকল শব্দে ভরে উঠতে লাগলো দীঘি। জলের স্রোতে ভেসে গেলেন রাজা সুবিদ নারায়নের প্রাণপ্রিয় সহধর্মিণী অনিন্দ্য সুন্দরী কমলারানী।

শোকে মুহ্যমান হলো পুরো রাজ্য। রানীর শোকে কাতর হলেন পিতামাতা। পত্নীশোকে রাজা সুবিদ নারায়ণ নাওয়া খাওয়া ভুলে গেলেন। মনস্থির করলেন তিনি বনবাসী হবেন। রাগে ক্ষোভে নিজের বোন ধপাস রানীকে হত্যা করে বসলেন। রাজ্যে নেমে এলো মহা বিশৃঙ্খলা।

এমনই দিনে রাজার স্বপ্নে এলেন রানী। বললেন "আপনি আমাকে প্রতিদিন দেখতে পাবেন। দীঘির পাড়ে ছোট্ট কুড়েঁঘর নির্মাণ করে আমার ছোট্ট সন্তানটিকে সূর্য উদয়ের আগে রাখলে আমি তাকে দুধপান করিয়ে যাব। সাবধান, ১২ বছর আপনি আমায় স্পর্শ করতে পারবেন না। যদি অপেক্ষা করতে পারেন তবেই আমি আবার ফিরে

আসব। রানীর কথামত কুঁড়েঘর নির্মিত হলো। যথারীতি রানী এলেন। রাজা সুবিদ নারায়ণ দূর থেকে দেখলেন প্রিয় রানীকে। বুকটা হাহাকার করে উঠলো তার। এভাবে অতিবাহিত হলো কিছুদিন। রাজা অধৈর্য্য হয়ে উঠলেন। একদিন রানীর কথা অমান্য করে রাজা ছুঁয়ে দিলেন রানীকে। কিন্তু একি হলো। পলকেই রানী মিলিয়ে গেলেন।

দীঘিতে ভেসে উঠলো এক সোনার নৌকো। রানী সেই নৌকায় চড়ে মনের দুঃখে রাজাকে বললেন "আমি আর এই দীঘিতে থাকবনা। চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাচ্ছি। আর আমাকে পাবেন না।"

সোনার নৌকো মিলিয়ে গেল দীঘির জলে। রানীকে আর দেখা গেল না। কমলারানী মিলিয়ে গেলেন দীঘির জলে। দীঘির নাম হলো কমলারানীর দীঘি। আজও সেই দীঘি দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে।

(তথ্য সূত্রঃ জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২ উপলক্ষে প্রকাশিত "সঙ্কলন", মৌলভীবাজার জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রকাশকাল জুন ২০০১)

Ishmam Tasnim / **ইশমাম তসনিম,** Dhaka, Bangladesh

নানা দেশের নানা জনপদের মানুষের জীবনযাত্রার মিশ্রণে এই শহরের সাংস্কৃতিক পরিচয় গড়ে উঠেছে। সংস্কৃতি আসলে কী? যে গান শুনলে আপনা হতে ঠোঁট মিলিয়ে উঠি, যে খাবারের স্বাদ চিরচেনা হলেও পুরোনো হয়না, জীবনের এরকম টুকরো টুকরো ছবিগুলোই তো সংস্কৃতি। আমার জীবনযাত্রার এই টুকরো ছবিগুলোর পরিপূর্ণ রূপ দেয় আমার শহর। এই শহরে বর্ণিল মঙ্গল শোভাযাত্রায় যখন বরণ করে নেয়া হয় নতুন বাংলা বছরকে, তখন আমরা গলা মিলিয়ে বর্ষবরণের গান গেয়ে উঠি। এটিই সংস্কৃতি। ভাষাকে উদযাপন করার, বর্ষবরণকে উদযাপন করার, নানা উৎসবকে উদযাপন করার আনন্দের মধ্যে আমি আমার শহরকে খুঁজে পাই। একই রকম শাড়ি পরে মা-মেয়ের বিজয় দিবস উদযাপন, কিংবা একই ফুলের মালা খোঁপায় গুঁজে বর্ষবরণ - এই সব উদযাপনেও সম্পর্কের একটি গল্প থাকে - এই গল্পগুলোই আমার শহর। আমাদের চোখে এই শহরের গল্পগুলো আজ সুখকর - কারণ আমাদের জীবনযাত্রা ক্রমেই সুন্দর হয়ে উঠছে। এই সুন্দর আর আরামদায়ক জীবনযাত্রার জন্যে যে মানুষগুলোর কৃতিত্ব, সেই মানুষগুলোর চোখে তাদের শহরের গল্প কেমন? এটিই আমার লেখায় তুলে ধরতে চেয়েছি। আমার লেখার অনুপ্রেরণার চরিত্র বাস্তব। তৈরি পোশাকশিল্পের এক কর্মীর সাথে পথচলার আড্ডার টুকরো অংশই প্রতিফলিত হয়েছে লেখায়। ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করে না?" ওঁর চমৎকার উত্তর, "আপা, ঢাকাই তো আমাদের বাড়ি। যেইখানে শান্তিতে দুইবেলা খাওন পাওয়া যায়, নিজের আয়ে নিজের মত থাকা যায় - তার চেয়ে আরামের বাড়ি কি আর হয়?" ওঁর চোখের আলোর রোশনাই এ আমি সেদিন স্বাধীনতার স্বাদ দেখেছিলাম। এদেশের মানুষের আজন্ম যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা - সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে ওঁর মাঝে। নিজের অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধীনতার মাধ্যমে পুরো দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভিত গড়ে দিচ্ছেন এই মানুষগুলো - তাদের চোখে ঢাকার আলোর রোশনাইকে তুলে ধরেছি ।

আলোর রোশনাই

হুট করে একেকটা দিন গ্রামের কথা এত বেশি মনে পড়ে! আব্বা-আম্মা, মিনু, আরিফ, শরীফ, জমানো টাকা দিয়ে কেনা ছাগলটা - সবাই না জানি কেমন আছে। আব্বাকে এইবার একটা ফোন কিনে দিতে হবে, বাজারে ফোন করে আব্বাকে পাওয়া যায় না সময়মত - বারোদিন হলো কথা হয়নি।

না, এগুলো ভাবতে থাকলে দেরি হয়ে যাবে - তাড়াতাড়ি টিফিন নিয়ে দৌড়াতে হবে কাজে। দেরি হলেই কিছু টাকা কম - স্যান্ডেলটা পায়ে গলিয়ে বের হয়ে যেতে যেতে ভাবে রিনা। গ্রাম থেকে বেশ কয়েকবছর হয় ঢাকায় আসা, এখন ঢাকাকেই আপন মনে হয়, নিজের শহর মনে হয়।

ঢাকায় এসে দিনরাত সেলাই মেশিন চালিয়ে যেতে হচ্ছে - রাতে এইটুকু ঘরে সোমা, শারমিন, আমিনার সাথে থাকতে হয় - গ্রামের মত খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নেয়া যায় না। তবু যেন মনে হয় এখানেই বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়া যায় - এখানে নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায়। মনে হবে নাই বা কেন? এই ঢাকায় কাজ পাবার পরেই তো আব্বার ওষুধ কেনা যাচ্ছে, নিজের একটা মোবাইল হয়েছে, মিনুর জন্য জামা আর আরিফ-শরীফের জন্য নতুন খেলনা কিনে দু'বছরে একবার বাড়ি যাওয়া যায়।

আম্মা প্রত্যেকবার কিছু নিতে নিষেধ করেন – কিন্তু এইবার গেলে আম্মাকে একটা শাড়ি কিনে দেয়া যাবে – কী খুশিই না হবেন! এই ঢাকা শহরে এসেই তো মনে হয়, রিনা নামের ১৮ বছরের একটি মেয়ের অস্তিত্ব আছে এই দুনিয়ায় – যে নিজের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েছে।

আর ঢাকা শহরটাও কী যে সুন্দর! মাঝে মধ্যে রুমের সবাই মিলে ওরা ঘুরতে যায়। একবার গিয়েছিল – একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে। এত মানুষ, আর এত ফুল! আর শহিদ মিনারটা কী লম্বা! ফুল কেনার টাকা ছিলনা, তাই একেবারে বেদির সামনে থেকে চারটা ফুল তুলে ওরা চারজন বেণিতে গুঁজে নিয়েছিল - এক ক্যামেরাওয়ালা ভাই ছবি নিয়েছিলেন ওদের। এইদিন নাকি সবাই যাতে বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে – এইজন্য কয়েকজন মারা গিয়েছিল। কী জানি, সবাই তো বাংলাতেই কথা বলে – এইজন্য কাউকে মরতে হয় কীভাবে, রিনার বুদ্ধিতে এঁটে ওঠে না।

আর একদিন দেখতে গিয়েছিল মার্কেট – এত বড় দালান – আর কত রকম যে জিনিস। ওরা অবশ্য ঘুরতেই গিয়েছিল – এত দামি জিনিস কেনার সামর্থ্য কী ওদের আছে! একটা আপা ওদের সামনে আট হাজার টাকার গোলাপি পুঁতি পুঁতি একটা জামা কিনলেন। আ-ট হা-জা-র টাকা! ওর এক মাসের বেতন। আল্লাহ এই শহরে মানুষকে টাকাও দিয়েছেন – একদিন কি সে'ও এই মার্কেট থেকে কিছু কিনতে পারবে? ওই দিন অনেক জায়গায় ঘোরা হয়েছিল –

শিশুপার্কে প্লেনে উঠে কী যে ভালো লেগেছিল! ঢাকার রাস্তার মসজিদগুলো সবচেয়ে সুন্দর – গ্রামের মসজিদের চেয়ে কত্ত বড়!

সব মিলিয়ে ঢাকার জীবন ভালোই লাগে - খারাপের মধ্যে শুধু বাড়ি যাওয়ার সময় বাসে উঠতে ভালো লাগে না। খারাপ লোকজন এমন বদনজরে তাকায়, সুযোগ পেলে গায়ে হাত দিতে চায় – ভয়ে গা কুঁকড়ে ওঠে। কিন্তু একবার এক ছোট আপা – রিনার থেকেও ছোট হবে – বাসে এরকম এক লোককে ওর দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে এমন ঠাস ঠাস কথা শুনিয়ে দিয়েছিল, ব্যাটা পরে বাস থামতে নারায়ণগঞ্জ আসার আগেই নেমে গেছিল। এইরকম পড়াশোনা জানা আপারা কী সাহসী – দেখলেই ভালো লাগে। ওইদিনের পর রিনার মনে কেমন কেমন সাহস এসে গেছে – আর শারমিন বলে দিয়েছে সবসময় বাসে সেফটিপিন নিয়ে যেতে। আর সাহস তো করাই লাগে, সাহস করেছে বলেই না একা একা ঢাকায় পা দিয়েছিল!

এতকিছু আজকে মাথায় আসার কারণ – আজকে রিনার মন ভালো। গত এক সপ্তাহ ধরে ওরা চারজন ওভারটাইম করেছে – আজকের দিনটা যাতে ছুটি নেয়া যায়, এইজন্য। আজকে পহেলা বৈশাখ। এইদিন রাস্তায় কী সুন্দর সুন্দর আপাদের দেখা যায়। আর এইদিন নিজেদের গরীব লাগেনা বেশি – সব আপারা ভাইরা ওদের মতই পান্তা খায়! এইদিনেই মাত্র ঢাকায় মেলা বসে – ওদের বাড়িতে তো প্রত্যেক হাটবারে মেলা বসতো! আপাদের সবার রঙিন রঙিন শাড়ি আর ফুলের মালা মাথায়। সেইদিন এই শহরটাকে এত রঙিন আর সুন্দর লাগে। এই রঙিন শহরের এক কোণায় যে রিনাও আছে – এইটা ভেবে নিজেকেও রঙিন লাগে।

আজকের জন্য রহিমাবুর কাছে থেকে শাড়ি ধার নিয়েছে রিনা – রহিমাবু যে বাসায় কাজ করে – সেই বাসার আপা খুব ভালো – প্রায়ই ওকে শাড়ি দেন। মাঝেমধ্যে এইজন্য মন চায় বাসাবাড়িতে কাজ নিতে – একটু কম চাপ পড়তো। কিন্তু আর কারো অধীনে থাকতে মন চায় না; নিজের স্বাধীনতায় একটা চাকরিই ভালো, যেখানে নিজের মত ছুটি নেয়া যাবে। হোক না একটু কম টাকার – ক্ষতি কী!

সে শাড়িটা পরে নিজেকে সামনের দোকানের কাচে দেখে অবাকই হয়ে যায়,কী সুন্দর লাগছে – ঐ আপাদের মতই তো। সোমা ,শারমিন ,আমিনাকে অপূর্ব লাগছে – সোমার একটা ক্যামেরাওয়ালা ফোন আছে – আজকে ছবি তুলতে হবে অনেক! ওরা ভোরবেলায় বের হয়েছে মিছিল দেখতে। বিশাল বিশাল পুতুল, হাতি আরো কী কী জানি

নিয়ে মিছিল। দেখলেই কেমন মন ভালো হয়ে যায়! আর অনেক বড় বড় মুখোশ। আজকে ওরা রমনা পার্কেও যাবে। ঐখানে প্রত্যেকবার গান হয় – মিনুর বইতে লেখা। মিনুটা পড়াশোনা করছে; ও বড় হয়ে ঐ শিক্ষিত আপাদের মত হবে নিশ্চয়ই।

এই গানগুলোর কথা অনেক কঠিন। কতগুলো শব্দ বোঝাই যায়না – তাও সবাই গলা মিলিয়ে গান করছে দেখে ওরাও সুর শুনে গলা মেলায়। 'আবর্জনা দূর হয়ে যাক' কথাটা বেশ মনে ধরে রিনার। আসলেই তো, শহরের আবর্জনাগুলো চলে গেলেই এই শহরটা যেন বেহেশত। ময়লা-আবর্জনা আর ওদের দিকে আবর্জনার মত তাকিয়ে থাকা লোকগুলো। আজকেও একজন আছে, ওদের পিছন পিছন আসছে – সোমা এখন বাড়ি চলে যেতে চাইছে এই ব্যাটার জন্য। আজকে রিনার মনে হয়, আমিও শিক্ষিত আপা হয়ে যাই, ঘুরে দাঁড়াই – একটু প্রতিবাদ করি।

লোকটার অবশ্য একেবারেই সাহস নেই, শিয়ালের মত স্বভাব। পেছনে ফিরে, 'কী লাগবো আপনার ভাই, ধোলাই খাইবেন নি?' বলার সাথে সাথে উলটো ঘুরে হাঁটা দিল! শারমিনের কী খিলখিল হাসি! আজকে নিজেকে অন্যরকম লাগছে; মনে হচ্ছে, একটা আবর্জনা যেন ওদের আশেপাশে থেকে দূরে সরে গেল। বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে নিতে রিনার মনে হয়, এই শহরই তো আমার।

এই শহরের বাতাস, জ্যাম,গার্মেন্টসের খুটখুট শব্দ, সবাই মিলে গুড়-মুড়ি খাওয়া, মাসের শেষে দোকানে গিয়ে আব্বাকে টাকা পাঠানো, ওভারটাইম করতে পারলে রাস্তার পাশের দোকানে চুড়ি কেনা – সবই তো আমার! এই ভালো লাগার রেশ থেকে সবাই মিলে একটা গোলাপি হাওয়াই-মিঠাই নেয়। আহা !

এই রিনা, শারমিনের, সোমার শ্রমে, ঘামে, ত্যাগে গড়ে উঠছে স্বপ্নের ঢাকা, উন্নত বাংলাদেশ। দূরের কোন গ্রামে ঘর ফেলে আসা মেয়েগুলোর বাড়ি, পরিচয় আজ ঢাকাই। এই শহরের সব অন্ধকার, সব বাধা পেরিয়ে আলোর রোশনাই যারা ছড়ায় সবার জীবনে – সেই মানুষগুলোর বাড়ি হিসেবে ঢাকার না-শোনা গল্পগুলো তাই ফিরে ফিরে আসে। আজ বিশ্বের বুকে ক্রমশ উন্নয়নশীল দেশে হিসেবে বাংলাদেশের যে পরিচয়, ঢাকার যে ঝাঁ-চকচকে আকাশ ছাড়ানো দালান – এই গার্মেন্টস-কর্মী মেয়েদের তাতে এক বড় অবদান। ঢাকার পরিচয়ে যেমন তাদের নাম, তেমনি তাদেরও নিজের পরিচয়, নিজের নির্ভরশীলতার জায়গা কোটি মানুষের এই ঢাকা।

Tasben Mahmud / তাসবেন মাহমুদ, Dhaka, Bangladesh

লেখালেখি আমার শখ। বাংলা ভাষার মাধুর্য আমাকে লেখায় আকৃষ্ট করে। 'আমার শহর আমার বাড়ি' বিষয়টি আমাকে আমার শহরের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শহরের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ভাবনা কাগজে কলমে ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা দিয়েছে।

শহরের গল্প

আকাশ ছোঁয়া অট্টালিকার ভিড়ে,
আজকাল আকাশের দেখা পাওয়া বড্ড কঠিন।
মোটরের শব্দের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছে পাখির ডাক,
ধুলোয় মাখামাখি এক ধূসর শহর ঢাকা
রাতের নিয়নের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠে আপন রঙে।

মসজিদের শহর কিংবা রিকশার শহর
কেউ কেউ বলে জাদুর শহর,
নীরবে বহন করে চলেছে চারশো বছরের ইতিহাস।
তারা মসজিদ, আর্মেনিয়া গির্জা কিংবা ঢাকেশ্বরী মন্দির
হঠাৎ পথ রোধ করে পথিকের
অবাক চোখে থমকে দাঁড়ালো,
ইট পাথরের দালানের নিচে পিষ্ট হয়েছে কত ইতিহাস
বেশি ভাবার সময় নেই,
ছুটছে সকলে জীবনের তাগিদে।

বুড়িগঙ্গাও আজকাল বুড়ি হয়েছে,
রুপালি জল আজ ধূসর অতীত।

শহরের বুকে প্রাণ দিয়েছে
মাতৃভাষা, মাতৃভূমির তরে
শহিদ মিনার, বধ্যভূমি
কত শহিদের আত্মদান।

ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজহা কিংবা মহরম
দুর্গাপূজা, জন্মাষ্টমী, বুদ্ধ-পূর্ণিমা কিংবা বড়দিন
যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক জীবন্ত প্রতিমা।

পহেলা বৈশাখে রমনার বটমূলে রমনীর উচ্ছ্বাস।
মঙ্গল শোভাযাত্রায় শিশু, তরুণ, প্রবীণের
মঙ্গলময় বার্তা, এ যেন প্রাণের মিলনমেলা।

ছুটে চলেছে এই ব্যস্ত শহর,
ছুটে চলেছে বাসিন্দারা,
জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত ভীষণ
থেমে যাওয়া যেন আত্মসমর্পণ।
শহরের বুকে ছোট্ট নীড়,
যেন সকল শান্তির খোরাক।

দেওয়াল লিখনে মুক্তির বার্তা
তুলির আঁচড়ে প্রতিবাদ,
পথের ধারে গানের সুরে
পথ হারায় একলা পথিক।

নারী আজ ছুটছে শহরের বুকে
স্বপ্নিল নয়নে, জীবন সংগ্রামে
পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শেকল ভেঙ্গে
দুর্বলতাকে পেছনে ফেলে,
অনুপ্রেরণায় বলীয়ান।

স্বপ্নিল চোখে হাঁটে তরুণ, তরুণী
শহরটা যে তাদের প্রাণ
চঞ্চল চোখে স্বপ্ন বুনে,
বদলে দেওয়ার অঙ্গীকার।

Tasben Mahmud / তাসবেন মাহমুদ, Dhaka, Bangladesh

অনুভূতি প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম লেখালেখি। শখের বসে নিজের মনের কথা কাগজে কলমে ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছে আমার লেখালেখির অনুপ্রেরণা। 'আমার শহর আমার বাড়ি' বিষয়টি আমাকে শহর নিয়ে গভীরভাবে ভাবিয়েছে। শহরের প্রতি ভালোবাসা এবং শহরের গৃহহীন, পথশিশুদের নিয়ে ভাবনা এই লেখাটি লেখার প্রেরণা।

জাদুর শহর

রাত ৯.৩০ মিনিটে তূর্ণা নিশিতা এক্সপ্রেস কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছাড়লো। ট্রেনের জানালার ধারে বসে কান্না চেপে সবাইকে বিদায় দিলাম। পিছনে ফেলে আসা মানুষগুলো আর এই শহরটার কথা ভেবে বুক মুচড়ে উঠছে। পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, “খুব শীত পড়েছে এবার”। বুঝলাম, জানলা বন্ধ করতে বলছে। জানলার কাচ নামিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, এই শহরে এইবার শীতের পিঠা খেতে খেতে রাস্তার ধারে গান শোনা হবে না। শহরে শীত গিয়ে বসন্ত আসবে, অলস দুপুরে রাস্তার ধারের শিমুল গাছটায় বসে কোকিল ডাকবে, বর্ষায় কদম হাতে ফুল হাতে শিশুরা ছুটে যাবে, কৃষ্ণচূড়া ফুলে পুরো শহর ছেয়ে যাবে। শুধু আমিই থাকবো না। খুব মন খরাপ হয়েছিল যখন শুনেছিলাম চাকরির পোস্টিং ঢাকার বাইরে। বন্ধুরা বলছিল, “এই যান্ত্রিক শহরটা ছেড়ে তো যেতে পারছিস এতেই খুশি হওয়া উচিত, আর সারাজীবনের জন্য তো যাচ্ছিস না।” সারাজীবনের জন্য যাচ্ছি না ঠিক, তবে আমার কাছে শহরটা কখনোই যান্ত্রিক মনে হয়নি বরং মনে হতো যুগের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে মানুষগুলো যান্ত্রিক হয়ে গিয়েছে।

আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা ঢাকাতেই। আমাদের বাড়ি ছিল পদ্মার পাড়ে। নদী- ভাঙনে এক রাতে সব গিলে নিয়েছে পদ্মা। তখন নিরুপায় হয়েই বাবা ঢাকা আসে, আশ্রয়ের খোঁজে। এই শহর এখন আমাদের শেষ ঠিকানা। বাবা বলে, “এই শহর কাউকে ফিরিয়ে দেয় না। সবাইকে আপন করে নেয়। যখন আর কোথাও ঠাঁই হয় নাই তখন এই শহরই ঠাঁই দেয়।” ছোট থাকতে বাবার এই কথাগুলোর অর্থ বুঝতাম না। রেশমার সাথে দেখা হওয়ার পর কথাগুলোর মানে বুঝেছিলাম।

এই শহরের এক পথের ধারে একদিন আমার দেখা হয় রেশমার সাথে। বন্ধুরা মিলে আড্ডা দিচ্ছিলাম। হঠাৎ ফুটফুটে এক ছোট্ট মেয়ে এসে বললো, "আপা ফুল নিবা?" ধুলো মাখা শরীর, তবে চোখের তারার উজ্জ্বলতায় চোখ আটকে গেল। এর পর থেকেই রেশমার সাথে আমার সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রায়ই দেখা হতো। অভিমানের সুরে বলতো, "কালকে আসলা না কেন আপা? আমি তোমারে কত খুঁজছি"। তারপর শুরু হতো গল্প। রাস্তার ধারে মা, ভাই-বোন নিয়ে রেশমার সংসার। কত টাকার ফুল বিক্রি হলো, কত টাকা জমলো সব হিসেব আমাকে শোনাতো। বন্ধুরা মিলে যখন গান গাইতাম, রেশমাও আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে গাইতো। " এই শহর জাদুর শহর, প্রাণের শহর ঢাকারে......।" গান শেষে একদিন রেশমা বললো, "এই শহরটাতে আসলেই জাদু আছে আপা। কত বড় বড় দালান। রাত হইলে কত সুন্দর সুন্দর বাতি জ্বলে। তখন মনে হয় এই পুরা শহরটা আমার। বাপে আমগোরে বাড়ি থেইকা বাহির কইরা দিছে, আবার বিয়া করছে। মা নিরুপায় হইয়া আমগোরে নিয়া এই শহরে আসছে। যখন কোথাও থাকার জায়গা হয় নাই তখন এই শহরের রাস্তা আমগোরে আপন কইরা নিসে।" অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলাম রেশমা কেমন বাবার মতো করে বলছে। হেসে বললাম, "খুব তো কথা শিখেছিস রে, এই শহরটা তো তোরই রেশমা।" শুধুই গানেই না একুশে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারে ফুল দিতে অথবা বই মেলার সময় মেলায় ঘোরাঘুরির সঙ্গী হত রেশমা।

গত বছর পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রার ভিড়ে আচমকা কে যেন হাত চেপে ধরলো। চমকে উঠে ফিরে তাকিয়ে দেখি অন্য হাতে ফুল নিয়ে রেশমা আমার হাত ধরে টানছে। একপাশে এসে বললাম, "কী রে, আজকে কত টাকার ফুল বিক্রি হলো?" উজ্জ্বল চোখে হাসতে হাসতে বললো, "অনেক আপা।" রমনা পার্কে এসে বসলাম বন্ধুদের সঙ্গে। পেছন পেছন রেশমাও এলো। বুঝলাম তার অনেক গল্প জমেছে। হঠাৎ বলে উঠলো, "আপা আজকে এত মানুষ কেন রাস্তায়?" বললাম, "আজকে তো পহেলা বৈশাখ তাই সব মানুষ বের হয়েছে আনন্দ করতে, নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে।" রেশমা অবাক হয়ে বললো, "এই মানুষগুলা অন্য সময় কই থাকে?" হেসে বললাম, "এই বড় বড় দালানগুলোতে থাকে।" খুশিতে ঝলমল করে উঠলো রেশমার মুখ। বললো "মা কইছে,

কিছু টাকা জমলে আমরা গ্রামে যামু গা। গ্রামে গিয়া দালান দেওয়ার লাইগা আমি টাকা জমাইতেছি আপা। রাস্তার ধারে থাকতে অনেক কষ্ট আপা। ” রেশমার মন খারাপ ভাব দূর করতে হেসে বললাম, “গ্রামে না যেয়ে ঢাকায় বাড়ি করে থাকিছ।” খিলখিল করে হেসে উঠে বললো, “এই শহরটায় তুমি একটা ছোট্ট বাড়ি কইরো আপা। শহরে বেড়াইতে আসলে তোমার কাছে থাকমু আর যে সব পোলাপাইন আমার মতো রাস্তার ধারে থাকে তাগোরে তোমার বাড়িত থাকতে দিও।”

এরপর অনেক দিন পেরিয়ে গেছে। রেশমার সাথে আমার আর দেখা হয়নি। হয়তো রেশমা তার স্বপ্নের দালানে ভালোই আছে। আজ ট্রেনে বসে রেশমার কথা ভেবে চোখে পানি আর ঠোঁটের কোনে হাসি দুটোই অনুভব করলাম। একটা ছোট্ট বাড়ি তবে করতেই হবে । রেশমার মতো পথের বাসিন্দাদের জন্য একটা ঠিকানা যে করতে হবে। এই শহরে ফিরে আমাকে আসতেই হবে।

Tahmina Rahman / **তাহমিনা রহমান,** Mymensingh, Bangladesh

আমাদের বাড়িতে প্রথম আলো পত্রিকা পড়া হয়। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ে নারীদের জন্য লেখালেখির প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে যুক্তরাজ্যের শিল্পকলা উন্নয়ন সংস্থা 'সম্পদ সাউথ এশিয়ান আর্টস এন্ড হেরিটেজ'। বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ 'আমার বাড়ি, আমার শহর'। তৎক্ষণাৎ বিষয়টি আমার মনকে স্পর্শ করে, কারণ আমার জীবনের সাথে মিশে থাকা কষ্ট, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সিদ্ধান্তহীনতা, আবেগ-উচ্ছ্বাস সব কিছু উজাড় করে প্রকাশ করার সুযোগ যেন হাতে পেয়ে গেছি। তাৎক্ষণিকভাবে এমনটাই মনে হয়েছে আমার। একই সাথে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং প্রতিযোগিতার বিষয় 'আমার বাড়ি, আমার শহর' দুটোই আমাকে এ লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছে। শুধু তাই না, এর মাধ্যমে আমাদের দেশে সমাজে প্রচলিত নানা অসঙ্গতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রথা ভাঙার বিষয়টিও এখন সময়ের দাবী, এ-ব্যাপারে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছি।

আমি মনে করি কিছু ধর্মীয় বিধান বা সামাজিক প্রথা দ্বারা নারীরা নিগৃহীত হয়, কিন্তু এই বিশ্বাস আঁকড়ে থাকলে এর থেকে মুক্তি মিলবে না। বরং নারীকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। যে কোনো বিধি নিষেধ, কর্ম দ্বারা অতিক্রম করা যায়, সে কর্ম যদি হয় যথাযথ। তেমনি দায়িত্বে অবহেলা, ইচ্ছে করে পিছিয়ে থাকা, সস্তা প্রশংসা পাওয়ার লোভে নিজেকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, প্রয়োজনীয় কথাটা প্রয়োজনের সময় না বলে নিজেকে গুটিয়ে রাখার কারণে নারীরা তাদের প্রাপ্য মর্যাদার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

কৃষ্ণ গহ্বর

একটা ফাঁদ থেকে বের হতে চাই
তাই ভীষণ একটা অনুশীলনে আছি;
রাতদিন; এমনকি আমার বয়সের চেয়ে কোটি কোটি দীর্ঘ
একটা কৃষ্ণগহ্বর গিলে ফেলেছে আমাদের মস্তিষ্ক
একটা ফাঁদ; নিঃসন্দেহে এই ফাঁদ একটাই
তাই চাই একটা বুলডজার আর একটা খনন যন্ত্র

গুড়িয়ে দিতে চাই সনাতন মুখস্থ বিদ্যা
মুখস্থ ভাষণ; মুখস্থ চোখ; চোখের বিভ্রম।
একটা উদাহরণ দিতে চাই তাই
মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীলিঙ্গ বুঝি বীরাঙ্গনা?
হতে পারে না; যোদ্ধার কোনো লিঙ্গান্তর নাই।
একটা অশুদ্ধ জীবনের তিলক যদি হতে পারে
গল্পের শিরোনাম; তবে তো ভাঙতেই হবে এ-দেয়াল
মাটিতো খুঁড়তেই হবে অবিরাম।
যতদিন ফিরে না আসে শুদ্ধ চিন্তন
যতদিন খেলা না করে বিশুদ্ধ মনন
ততদিন তো চাইবোই।
একটা বুলডজার আর একটা খনন যন্ত্র
খুঁজবোই।

Nahida Akter / নাহিদা আক্তার, Dhaka, Bangladesh

I was really inspired by this programme. Through this writing, I have been able to write about myself and my city. Thanks to all.

আমার শহর, আমার বাড়ি

আমার শহরে জীবনের শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি হওয়ার মাধ্যমে। প্রথম দিনটা শুরু হয়েছিল ভয়, কান্না, অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। ২রা জানুয়ারি ২০১৮ সাল, সেদিন ছিল মঙ্গলবার। আমার ভাইয়া আমাকে ঢাকার আজিমপুরে একটি হোস্টেলে দিয়ে এসেছিল। যখন রুমে যাচ্ছিলাম এক একটা সিঁড়ি ধাপ পার হওয়ার সময় মনে হচ্ছিল, এই পৃথিবীতে আমার চেয়ে একা, অসহায় আর কেউ নেই, চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছিল। আমি আর আমার সৃষ্টিকর্তা ছাড়া আর কিছু নেই গোটা এই শহরে।

ব্যাগগুলো নিয়ে রুমে যাওয়ার পর একজন আপু পেলাম, তিনি আমাকে যথাসম্ভব অভয় দিলেন এবং সেদিন আমি অনেকটাই শান্ত হয়ে গেলাম। এ যেন নতুন জীবনের সূচনা ঘটলো। নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছানো, রুমমেটদের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাও ভালোই জমে উঠেছিল। প্রতিদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাওয়ার সময় একা পথ চলা রাস্তায় ভয় করত খুবই। দূর থেকে যখন মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ দেখতে পেতাম, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম, এই তো ক্লাসের জন্য চলে এসেছি। তবে ধীরে ধীরে রাস্তা, রাস্তার ধারে নিয়মিত দেখতে পাওয়া কিছু অসহায় মানুষ যেন আপন হয়ে উঠছে। হোস্টেলের খাবার মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ তখন নিত্যদিনের ব্যাপার। তার সাথে সাথে যেন হিসেব করাও শিখে গেছি, কখন কোথায় কত টাকা খরচ করতে হবে, নিজের সীমাবদ্ধতাও যেন আরও আঁকড়ে ধরেছে। এবার যেন আমার দায়িত্ব পুরোপুরি আমার উপরই এসে পড়েছে। আজিমপুর হোস্টেলে জীর্ণ শীর্ণ ভবনের পুরনো সেই সবুজ শেওলা জমে থাকা ছাদ, পাশাপাশি হোস্টেলের সবার সাথে যেন একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল। বিশেষ করে হোস্টেলের খালা যিনি রান্না করে আমাদের খাবার দিতেন তিনি, তার মধ্যে যেন মাতৃত্বের পরশ পাওয়া যেত। স্কুলে বা কলেজে বা অন্য কোথাও যাবার সময় প্রতিদিন বাড়ি থেকে বের হতে হতে আম্মুকে যেমন বলে যেতাম যাচ্ছি, তেমন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া সময় খালাকেও বলে যেতাম, 'খালা যাচ্ছি'।

ক্যাম্পাসে গিয়ে দিনগুলো যেন আরও সুন্দর হতে লাগলো, ক্লাসে সবার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করতে না পারলেও আস্তে আস্তে ভালোই চলছিল, ক্যাম্পাসে হাঁটাহাঁটি এবং বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি আমার খুব পছন্দের জায়গা হয়ে ওঠে। সেই সাথে বিভিন্ন ইভেন্টে যোগ দেয়া, টিএসসির বিভিন্ন ধাঁচের প্রোগ্রামগুলো খুব মনে লাগতে শুরু করে। এভাবেই চলছিল সবকিছু। হঠাৎ ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ চলে এলো, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে গেস্ট হিসেবে থাকার সুযোগ হলো। এর আগের রাত অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর রাতেই জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে সারারাত আর ঘুমাতেই পারি নি। পরদিন এগুলো কীভাবে নিয়ে যাবো তা নিয়ে চিন্তা করছিলাম। আমার রুমমেট ঝুমু এগিয়ে এলো। ও আমার ব্যাচমেট, ইডেন কলেজে পড়ে। সে রাজি হলো আমার জিনিসগুলো নেওয়াতে আমাকে সাহায্য করবে। পরদিন ক্লাস করে দুপুর ২টার দিকে খালাকে সালাম করে জিনিসপত্র নিয়ে আমি আর ঝুমু রওনা দিলাম।

অবশেষে আমরা ভালোভাবেই হলে পৌঁছে যাই। আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গণরুম "মোহনায়"। রুমের দরজাটা আস্তে করে খুলে প্রবেশ করলাম, এত ভয় করেছিল যে কী বলবো! একটু কথা বলেই জানতে পারলাম সবাই আমার ব্যাচমেট। এ যেন আর একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। নিচে গিয়ে ঝুমুকে ধন্যবাদ দিয়ে ওকে বিদায় দিলাম। সেদিন মনে হচ্ছিল জীবনের আর একটা ধাপ পেরিয়ে হঠাৎ করে বড় হয়ে গেছি। লনের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিকর্তাকে বারবার ধন্যবাদ দিয়েছি এই কারণে যে, এই তো একা বাঁচাতে শিখে গেছি। এরপর থেকে হলের গাছ, ফুল, পাখি, বিশেষ করে হলের উপরের ছাদে বসে থাকা একঝাঁক কাক যেন আমার পরম বন্ধু হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে হলে অনেক বান্ধবী, বড় আপু হতে থাকলো। তাদের সাথে মাঠে বসে গল্প করা, লনে বসে চা খাওয়া, রিডিং রুমে না গিয়ে অডিটোরিয়াম রুমে বসে চিৎকার করে পড়া, হাসাহাসি, মজা, ডাইনিংয়ে একসাথে খেতে যাওয়া, নামাজ রুমে নামাজ পড়তে যাওয়া। এ যেন আমার সেই প্রত্যাশিত জীবনটি। এ যেন আমার শহর। আমি, আমার বান্ধবীরা, আমার আপুরা, হল, সবকিছুই ক্রমশ আমার হয়ে ওঠতে থাকে। হলের হাউজ টিউটর ম্যামদের দেখলেই অন্যরকম ভালো লাগে।

এতগুলো মেয়ের মাঝে ম্যামদের মধ্যে যেন আম্মু আম্মু একটা পরশ পাওয়া যায়। সেই

সাথে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে থাকি, ক্যাম্পাস যেন আরও আপন হতে থাকে। প্রত্যেকটা ঋতু যেন আসে নতুন পরশ নিয়ে। এর আগে এত ঋতু বৈচিত্র্য চোখে পড়েনি। প্রকৃতি যেন আপন সৌন্দর্যে আমার মনে এসে হাতছানি দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম আমার অনেক বান্ধবীর মাঝে আবিদার সাথে আমার মনের মিল অনেক বেশি। তার সাথে প্রথম থেকেই ক্যাম্পাসে, হলে অনেক ভালো সম্পর্ক। তাকে ভালো লাগার কারণ হলো সে ধর্মভীরু, পর্দাশীল। তার সাথে কথা বলে যেন নিশ্চয়তাটুকু পাই। আমাদের হলে অনেক আপু যাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বা বিয়ে করবে তাদের গায়ে হলুদ করা হয় তখন শাড়ি পরে, আপুদের সাথে এত মজা হয়, হলে বিভিন্ন দিবস, পূজা পার্বণ সবকিছুতে মাতোয়ারা হয়ে যাওয়া, যেন মনে হয় এইতো এত সুখ, খুশি অফুরান। আবার হল থেকে বাড়িতে আসার জন্য পাগল হয়ে যেতাম, যখন বাড়ির পথে রওনা দিতাম তখন হল, ক্যাম্পাস রেখে যাওয়ায় এত মন খারাপ হতো, তখন মনে মনে স্নেহের সুরে বলে ওঠতাম এই তো কিছুদিনের জন্যে বাড়িতে যাচ্ছি আবার তোমাদের কাছে ফিরে আসবো! তখন মনে হতো ইট পাথরের শহরটাকে আমি এত ভালোবাসি!

আবার ক্যাম্পাসে যখন একা থাকতাম, একাকিত্ব নিজেকে ঘিরে ধরতো চারদিক থেকে। তখন মনে হতো কংক্রিটের এই শহরটা বড় নিষ্ঠুর, চারপাশে এত মানুষ কিন্তু কেউ কারোর নয়। একদিন ক্যাম্পাস থেকে আসার সময় খুব মন খারাপ হচ্ছিল চোখ থেকে কয়েক ফোঁটা পানিও ঝরে গেল। তখন চোখ পড়লো একজন বৃদ্ধার প্রতি যিনি রাস্তার ধারে বসে রোজ বকুল ফুলের মালা বানাতেন। তার কাছ থেকে একটা মালা কিনে মন খুশিতে ভরে গেল; যেন মনের আকাশে এই মেঘ জমে বৃষ্টি, আবার মেঘও জমে থাকে কিছুক্ষণ, আবার পরক্ষণেই এত রোদেলা, আনন্দ, এত খুশি! এই তো আমার শহর আর আমি। এখানে রক্তের সম্পর্কের ছিটেফোঁটা নেই কিন্তু আছে কিছু আত্মিক সম্পর্ক।

কারোর অসুস্থতা, মন খারাপ, কারোর প্রেমে ব্যর্থতা দেখে ওদের সাথে সাথে আমারও ঠিক ততোটাই মন খারাপ হতো! এদের সাথে পারিবারিক সম্পর্কের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় আবার কোনো কোনো সময় এদের সাথে সম্পর্কটা আরও জোরালো।

সারাদিনের ক্লাস, ক্লান্তি, ব্যস্ততা, দৌড়াদৌড়ির পর যখন নিস্তব্ধ রাতে আকাশের চাঁদ, তারার দিকে তাকাতাম তখন মনে হতো নিজের জন্যই বেঁচে আছি, এবার নিজেকে একটু সময় দিচ্ছি। এই তো জীবন! ধীরে ধীরে চারপাশের সবকিছুই নিজের হয়ে গেছে।

Suraiya Islam / **সুরাইয়া ইসলাম,** Dhaka, Bangladesh

When I write, people and my surroundings inspire me. In my city there are many people. In this pandemic situation, I saw some people who left this city and their lovely home where they lived for long. But why should we leave? Why are we scared of this situation? This is my city and this is my home. These people are also mine. We should care about them. These feelings inspire me and 'My City My Home' gave me a chance to write about some. It inspired me to prove myself, that I can also create a story. And I think our life is a story itself, there is no need to create any. One needs to explore, and stories can be found in every step of life.

বাড়ির নাম সেঁজুতি

খুব সকাল থেকেই মিসেস সেলিনা রান্নাঘরে কাজ করে যাচ্ছেন। আজ তাঁর ভীষণ তাড়া। অফিসে যেতে হবে, সেই সাথে বীমার খোঁজটাও নিতে হবে। স্বামী রহমান সাহেবের মৃত্যুর পর দীর্ঘদিন সিটি ব্যাংকে চাকুরী করেছিলেন। এরপর অবসর নিয়ে নিজ উদ্যোগে একটা ডে-কেয়ার সেন্টার খুলে বসেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে তাঁর সময় কেটে যায়। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে ছিল তার ছোট্ট সংসার। এক সময় পুরো ঘর জুড়ে কত আনন্দ ছিল, কত শোরগোল। ধীরে ধীরে সময়ের চাকায় তা আজ শূন্য কেবল। ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকে দেশের বাইরে। সময়ের অভাবে কেউই আসতে পারেনা। তা নিয়ে মিসেস সেলিনার মাথা ব্যাথা নেই। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়ে একা থাকার জীবনে তিনি বেশ অভ্যস্তই বলা চলে। দীর্ঘদিন ধরেই ঘরের কাজের সঙ্গী ছিলেন আসমার মা। আসমার মাও আজ ঠিক সময়ে কাজে আসেনি। তিনি একা সব সামলাচ্ছেন। ঘরে কথা বলার একমাত্র সঙ্গী তার মিনি বিড়াল আর যে কত সময় ধরে আসমার মা থাকেন অতটুকু। তিনি খাবার টেবিল গোছাচ্ছেন আর মিনির সাথে কথা বলে যাচ্ছেন।

- জানিস বুড়ি, আজকাল আসমার মা-টা না ভীষন ফাঁকি দিচ্ছে। যেই আমার ছেলেমেয়েরা আমায় রেখে চলে গেল তারপর থেকেই তিনি এমন করছে। ভাবছে

একা বুড়ো মানুষ আমি! কী করে ফাঁকি দেয়া যায়। বুড়োদের সবাই ফাঁকি দেয় জানিস! ঠিক একটা ছোট্ট বাচ্চাকে যেমন চকলেটের লোভ দেখিয়ে ফাঁকি দেয়া হয়। তুই ও কি ফাঁকি দিবি?

বিড়াল ছানাটি ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে। কথা শেষে কেবল মিউ শব্দ করে জানান দেয় সে সমর্থন দিচ্ছে না। মিসেস সালেহা বিড়ালের বাটিতে খাবার রাখতেই মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। অফিস কলিগ মিসেস জাহানারা। তারা শুধু অফিস কলিগই না পরম বন্ধুও বলা যায়। দুজন দুই দিকে থাকলেও অফিস যাত্রা পথ এক হওয়াতে একই সাথে যায়।

- হ্যালো জাহানারা, আমি আর পাঁচ মিনিট পরেই বেরুচ্ছি। তুমি বাস স্ট্যান্ডে কি অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে?

- না গো। গতকাল রাতে তোমাকে ফোনে চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু বন্ধ বলছিল।

- ওহ চার্জ ছিল না, দিতে খেয়াল নেই, ছেলে-নাতির সাথে কথা বলতে বলতেই ফুরিয়ে গেছে। তা অফিস কেন যাবে না? শরীর খারাপ!

- এমা তুমি জানো না? পুরো শহর জুড়ে লকডাউন, আজ কোনো অফিস হবে না।

- কী করে জানবো, দু'দিন ধরে ডিশ লাইনটা ঠিক নেই। এই যে বলছি ঠিক করে দিয়ে যাও, কেউ শুনছেই না! বিল নেবার সময় ঠিকই নিয়ে যায়। বুড়ো মানুষ, একা থাকি, তাই এমন করার সাহস করে। তা কতদিন চলবে?

- তা জানি না, অনির্দিষ্টকালের জন্য। বলা যায় না কী হয়। আমেরিকা, ইতালির অবস্থা নাকি অনেক খারাপ।

- হ্যাঁ, ছেলে তো তাই বলল। তবে ওরা তো নেদারল্যান্ড-এ থাকে, ওখানে আপাতত সব ঠিকই আছে। আচ্ছা রাখছি, দরজায় কলিং বেল বাজছে, কে যেন এলো।

- সাবধানে থেকো, কোন সমস্যা হলে ফোন দিও।

- আচ্ছা।

আসমার মা অনেকক্ষণ ধরে কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে। তার একটাই সমস্যা, যতক্ষণ না কেউ দরজা খুলছে, বেল চাপতেই থাকে। মিসেস সেলিনা দরজা খুলেই রেগে গেলেন।

– এতক্ষণে এলি! এই আসার সময়। আমার তো কাজই শেষ।

– হ্যাঁ, আর কী করমু কন, আগে যে বাসায় গেছিলাম তারা না করে দিছে। বলছে আর না আসতে, পরিস্থিতি যতক্ষণ না ঠিক হয়।

– হ্যাঁ, কী এক ভাইরাস, সব মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে একেবারে। যা যা আলাদা কাপড় রাখা আছে পরিষ্কার হয়ে নে। আমাকে তো আমার মেয়ে আগে থেকে সাবধান করেছে, তাই সব ব্যবস্থা আগেই নিয়েছি।

– খালাম্মা, আপনি কি আমারে বাহির কইরা দিবেন? আমি অহন কাজ না করলে খামু কী? বাজারে সব জিনিসের দাম বাড়তি!

– একাত্তরে যখন কারফিউ লেগেছিল আমার আবছা খেয়াল আছে, আমাদের মিনির মা কিন্তু আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় নেয়। আর এটাতো সামান্য জীবাণু। এর জন্য তোকে ছেড়ে দিবো কেন? দুজনে সাবধানে থাকলেই হবে।

– জানি না খালাম্মা, কী হইবো! মানুষ নাকি দুই তিন মাসের বাজার একদিনে করতাসে। সবাই যদি এমন মজুদ করে পরে তো আমরা কিছুই পামু না। খালাম্মা টাকা দেন আমিও গিয়া কিছু নিয়া আসি আপনার জন্য!

– দরকার নেই, আমাদের যা আছে তাতেই হবে। বরং তুই তোর মেয়েকে নিয়ে আমার বাসায় এসে থাক। বিশাল বাড়ি, ঘর তো খালি। তোরও সুবিধা হলো আমিও স্বস্তিতে থাকলাম।

– আইচ্ছা আম্মা, তয় মাইনসে কয় এইটা বড়লোকের রোগ।

– ধুর, এইটা কাউকেই ছাড়ছে না। এতদিন কি আমরা ছেড়ে কথা বলেছি? প্রকৃতির উপর কী অন্যায়টা করেছি। যাই হোক, আল্লাহ ভরসা দেখা যাক কী হয়। তুই এখন কাজে নেমে পড়।

মিসেস সেলিনা কথা শেষে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন, দোতালার বারান্দায় দখিনা হাওয়া তিনি দারুণ উপভোগ করেন। কিন্তু আজ তাঁর মনের মাঝে সংশয়, এই হাওয়াতে কেন জানি তিনি স্বস্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। কেমন করুণ, শোকাবহ আবহাওয়া চারদিক। তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। হয়ত ঝুম বৃষ্টি নামবে; কিন্তু পৃথিবী কি পরিশুদ্ধ হবে?

লকডাউনের তিন মাস হতে চললো, কোন কিছুই ঠিক হচ্ছে না। মিসেস সেলিনা বই পড়ছেন। রাতে খাবারের পর তিনি বই পড়েন। এদিকে আসমার মা কেঁদেই চলেছে। তাদের বস্তিতে একজন মারা গেছে। হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে নি। মিসেস সেলিনা তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারছেন না।

– ওহ! আর কাঁদিস না তো! অনেক তো হলো। এখন আমাদের শক্ত থাকতে হবে। জানি তোর খারাপ লাগছে।

– আমার বড় আপন আছিল, এক সাথে আছিলাম সুখে দুঃখে। এ কেমন দিন আইলো?

– জানি না রে, শেষ বয়সে এসে এই দিন দেখবো ভাবিনি। পুরো শহর মৃত্যুর ভয়ে কাতর। ঠিক যেন নতুন একাত্তর। এই সেঁজুতিতে সেদিন অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল। অথচ আজ দেখ, কেউ কারো বাসায় যেতেই ভয় পায়। একাত্তরের পর এই বাড়িটা আর ভাঙা হয়নি, শুধু রঙ করেছিলেন আমার বাবা। এরপর স্বামীর মৃত্যুর পর আমারও ঠাঁই হলো।

জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলতেই তার চোখ কেমন ছলছল করে উঠলো। পুরোনো স্মৃতি মনের কোণে প্রায়ই ভেসে উঠে। হঠাৎ চোখ পড়লো রাস্তায় কাঁদতে থাকা এক দম্পতি ও তার সন্তানদের উপর। পাশের লেনের রহমান সাহেব, কিন্তু এত রাতে এইভাবে কোথায় যাচ্ছেন! মিসেস সেলিনা ডাক দিলেন, তাদের উপরে আসতে বললেন। আসমার মা গিয়ে নিয়ে এলো।

- কী ব্যাপার এত রাতে এইভাবে কই যাচ্ছেন?

– চলে যাচ্ছি আপা, কয়েক মাসের ভাড়া বাকি। দেবার ক্ষমতা নেই। তাই চুপ করে চলে যাচ্ছি।

রহমান সাহেবের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন।

–আপা বুকটা ফেটে যাচ্ছে। দশ বছর এই পাড়ায়, আমার দুই মেয়ে এইখানে হয়েছে। আমার সাজানো সংসার, প্রতিটা দেয়ালে আমার স্পর্শ, কত–শত গল্প এই ঘর জুড়ে; আজ বাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছি।

মিসেস সেলিনা কিছুক্ষন চুপ রইলেন। পরে বললেন,

– আমার সেঁজুতিতে আপনারা থাকবেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারপর না–হয় চলে যাবেন। এই শহর আমার, এই নগর, রাস্তা সব আমার, এদের ছেড়ে কেন পালাবেন। না হয় দু'মুঠো কম খাবো। কিন্তু এক সাথেই রবো। ঠিক একাত্তরের মতো, যেখানে ভালোবাসা আছে, শ্রদ্ধা আছে, সেখানে তো ভয় কখনোই তার জায়গা করে নিতে পারবে না। দেখবেন একদিন সাইরেন বাজবে, পৃথিবী সুস্থ হয়ে গেছে ঘোষণা আসবে। রয়ে যান আমার সেঁজুতিতে।

রহমান সাহেব রাজি হলেন। রাত তখন অনেক, আকাশে তারার ছিটেফোঁটাও নেই। কিন্তু বাড়িটিতে এখন আলো জ্বলছে, গল্প চলছে। যেন পৃথিবী ভীষণ শান্ত এবং স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

Shaheen Samad / **শাহীন সামাদ,** Dhaka, Bangladesh

My writing was inspired by all the working women I am surrounded by in my life. As a former working woman myself, I have experienced the hardships that working women face on a daily basis, and later in life, witnessed my daughters go through the same battles.

আমার ভালোবাসার শহর

কুয়াশায় মোড়া শহরটা এখনো পুরোপুরি জেগে উঠেনি। নাহিদ ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়, সকালের এ সময়টা তার খুব প্রিয়। ব্যালকিনতে রাখা গাছগুলিতে সে পানি দেয়। গোলাপের গাছে কুঁড়ি এসেছে। স্বামী, সন্তান ও শাশুড়িকে নিয়ে তার ছোট সংসার। সে নিজে একটা বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত। স্বামী সরকারি চাকুরিজীবি। দুই বেডরুমের আট'শ স্কয়ার ফুটের ফ্ল্যাটে সে তার সুখী সংসার জীবন পেতেছে। অবশ্য শুরুটা এতো সহজ ছিল না। স্বামীর একা আয়ে রাজধানী ঢাকা শহরে সংসার চালানো কষ্টসাধ্য। ঢাকা শহরে বাড়ি ভাড়া সহ সবকিছুর দাম বেশি, ছেলে জয়কে দু'বছর পর স্কুলে দিতে হবে। সব কিছু ভেবেই সে চাকরিটা নেয়। প্রথম থেকেই সে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চাইছিল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীটা সে কাজে লাগাতে চাইছিল। প্রথম দিকে দুই পরিবারের পক্ষ থেকেই বাধা এসেছিল। কিন্তু সে তার যুক্তিতে ছিল অটল।

শাশুড়ি আর বুয়ার ভরসাতেই চাকুরিটা করতে পারছে। এখনো শহরে সে রকম ভাবে ডে কেয়ার সেন্টার গড়ে উঠেনি, যে কয়েকটা আছে তাও হাতে গোনা। সকাল আটটার মধ্যেই ওদের দু'জনকে বেরিয়ে পড়তে হয়। রিক্সায় বাসষ্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে দেখা মেলে প্রচুর বিভিন্ন পেশার মেয়েদের। কেউ ছাত্রী কেউ বা চাকুরিজীবি, তবে বেশির ভাগই পোষাক কর্মী। বাস এলে ওরা দু'জন ভিড় ঠেলে বাসে উঠে পড়ে। নাহিদ যাবে মতিঝিলে আর ওর স্বামী মহাখালীতে নেমে যাবে। রাস্তায় প্রচন্ড ট্রাফিক জ্যাম, বাসে বসে নাহিদ ভাবতে থাকে আজকের ঢাকার সাথে ওর ছোট বেলার দেখা ঢাকা শহরের কত তফাৎ। তখন রাস্তাঘাট ছিল

ফাঁকা। এ লোকজনের ভিড় ছিল না। এত উঁচু উঁচু দালান কোঠা, শপিং মল, এগুলো ছিল না। এখন পুরো শহরটা যেন একটা কংক্রিটের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। ছোটো বেলায় ওরা প্রায়ই রমনা পার্কে বেড়াতে যেত। এখন খেলার মাঠ আর পার্কগুলো যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ঢাকা এখন কসমোপলিটান শহর হওয়াতে প্রচুর দেশি বিদেশি লোকজন আনাগোনা বেড়েছে। সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু এখন ঢাকা। আসলে ঢাকা শহরের প্রাণ হচ্ছে এই শহরের মানুষেরা। ঢাকা শহরের লোকজনই এই শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এত কর্মব্যস্ততা, প্রাণ–চাঞ্চল্য সব থেমে যাবে এরা না থাকলে। এ শহরটা তার বুকে সবাইকে আশ্রয় দিয়েছে। বাসে বসে থাকতে থাকতে একটু ঢুলুনির মতো আসে নাহিদের। মনে মনে ভাবে মেট্রোরেল আর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটা হয়ে গেলে শহরের যানজটটা অনেক খানি কমে যাবে। তখন জীবনটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। মুহূর্তে বিরক্তি কেটে গিয়ে তার মনটা ভাল হয়ে গেল, এই শহরটার প্রতি তার মায়া ভালবাসা বেড়ে গেল। এই শহরটার প্রতি তার অনেক কর্তব্য রয়েছে। এই শহরটা অনেক সমস্যায় জর্জরিত, তারপরও সে এই শহরটাকে ভালোবাসে, এই শহরের সুখে সে সুখি, দুঃখে দুঃখি। আজকে অফিসে একটু তাড়াতাড়ি যাবার কথা, একজন মহিলা উদ্যোক্তা আসবেন তার হস্তশিল্পের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটি বড় পরিসরে বাড়ানোর জন্য ঋণের আবেদন নিয়ে। সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে মহিলাকে সাহায্য করতে। এসব ভাবতে ভাবতেই বাস তার অফিসের কাছে এসে থামল। বাস থেকে নেমে দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে চলে আপন গন্তব্যস্থলে।

Aysha Siddika Mimi / আইশা সিদ্দিকা মিমি, Savar, Bangladesh

'My City, My Home' project gives me such an enormous opportunity to expose my inner writing talent and creativity. This project helps me to think once again about 'How precious I am to be a girl'! And I can assure, that feeling of amusement would be for every girl like me. Obviously, various kind of stories may have been submitted into your inbox by various women. Huge thanks to you for giving us this opportunity. Women of my country possess various norms, rules, values, customs and rituals. A family, a home and a city, all these are constructed by women in a civilized way. The context of my story is built by a woman's real life story which consists of struggling, hardship, a bit of happiness, a journey of all these things. It will let every woman think that this is not only character's story, it is every woman's story. The difference might be the environment, family background and financial position. But, the context is the same for all women. The project 'My City, My Home' plays a great role to collect all great stories of woman from different age-group and different background.

নারী

“এই সোহেল ভাই, ক্যামেরাটা এদিক করে ধরেন। সব রেডি, অল সেট, উনি কোথায়”, বললো তানিয়া। তানিয়া পেশায় সাংবাদিক ও উপস্থাপক। তার কাজ সব অচেনা গল্পকে বের করা। আজ গল্পের প্রধান চরিত্র হচ্ছেন রেহনুমা। "তো চলুন, শুরু করা যাক", সব বুঝিয়ে দেওয়া হলো রাহনুমাকে। আপনার পরিচয়টা দিয়ে শুরু করুন।

আমার নাম রেহনুমা। আমি একজন গার্মেন্টস কর্মী ছিলাম। এক বছর আগে এক accident এ আমি আমার এক পা হারাই। আমার জন্ম ঢাকার এক বস্তিতে।

আমার মায়ে মাইসের বাড়িত কাম করতো আর বাপে মার কামাইয়ের টাকা উড়াইতো। তাই, মা বাপেরে ছাইড়া আমারে আর ভাইরে নিয়া আলাদা হইয়া যায়।আমার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করার কিন্তু ক্লাস 5 পর্যন্ত পইড়া আর পড়তে পারি নাই। প্রথমে আমি চা বিক্রি করতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আবার সংসদ ভবনের সামনে আবার মাঝে মাঝে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে"। তানিয়া জিজ্ঞেস করলো, "এতদূর যেতেন?"

- হ্যাঁ, কী করুম বলেন, ছোট ছিলাম, ভাবতাম কেনাবেচা না হলে কী খামু। তাই বাসে কইরা যাইতাম।

- হারিয়ে যাননি?

- একবার গেছিলাম কিন্তু মাইসোরের জিগাইয়া আবার ফিরতে পারছিলাম। আবার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে খেলনা বিক্রি করছি।"

- কত বছর চাকরি করেছেন?

- ১২ বছর।

- আপনার বর্তমান বয়স কত?

- ২৭ বছর"

- তারপর...?

- আমার এক লোকের সাথে পরিচয় হয় গার্মেন্টসে। তার সাথে আমার বিয়ে হয়। 15 বছর বয়সে ঢুকে গার্মেন্টসে আর ১৬ বছর বয়সে বিয়ে হয়। ১৭ বছর বয়সে বাচ্চা হয়।

- Oh My God! মাত্র ১৭ বছর বয়সে আপনার বাচ্চা হয়!

বিস্ময়ের সাথে বলল তানিয়া।

- হ, আমার পিঠাপিঠি দুই বাচ্চা হয়। বিয়ার ৫ বছরের মাথায় আমার সাথে তার

ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। ২১ বছর বয়সে দুই বাচ্চা নিয়া আমার খুব কষ্ট হইতো। একা ছিলাম ,মাও মারা গেছে, এর মাঝখানে ভাই এখানে সেখানে থাকে।

- পুরো ঢাকা চিনেন আপনি?

- পুরা না চিনলেও, অর্ধেক চিনি।

– যেসব যেসব স্থানে গিয়েছেন সেসব স্থানের জায়গা দেখতে কেমন লাগতো?

– ভালো লাগতো, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজু ভাস্কর্য, টিএসসি চত্বর আবার বিভিন্ন ভবন, কার্জন হল। এগুলো দেখতে ভালো লাগতো। আবার সংসদ ভবন দূর থেকে এত সুন্দর ভেতরে মনে হয় আরো সুন্দর।

– কখনো মনে হয়নি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি পড়তে পারতেন?

– মন চাইলেও তা পারা যায় না। যা আমি পারি নাই আমি চেষ্টা করি তা আমার বাচ্চাকে করে দিতে আর চেষ্টা করমু ওদেরকে যেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারি।

এটাই হচ্ছে নারীর মাতৃত্ববোধ। তাইতো নারীকে মায়ের জাতি বলা হয়।

– এরপর...?

– তারপর আমি চিন্তা করি টুকিটাকি ব্যবসা করার। বাসায় কাঁথা সেলাই করতাম অর্ডারে, সংসার ভালই চলত। বাচ্চাগুলারে স্কুলে ভর্তি করি।

– ওদেরকে কখনো ওইসব জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন?

– হ, আমার ছোট বাচ্চা তো দোয়েল চত্বর দেইখা বলে, না এত বড় পাখি। বন্ধ পেলে ওদেরকে চিড়িয়াখানায় ও জাদুঘরে অভিনয় ঘুরতে নিয়ে যাই । নববর্ষ আইলে মেলায় নিয়া যাই, চেষ্টা করি নতুন জামা কিনে দিতে। না পারলে মেলায় ঘুরাই এতেই খুশি। নাগরদোলায় উঠে, গালে আঁকাই, বাতাসা, মুড়ি মুড়কি কিন্না দেই। ওরা সব চেয়ে পছন্দ করে পুতুল নাচ। একবার সাপের খেলা দেইখা ওরা

ভয় পাইছিল। Accident এ সব উল্টাপাল্টা হইয়া যায়।

– বর্তমানে কি করছেন?

– বর্তমানে বাসায় কাঁথা সেলাই আর হাত মেশিন এর অর্ডারে জামা সেলাই করি।

– আপনার নিজস্ব বাসা আছে?

– হ্যাঁ, আমার মনে কষ্ট করে একটা টিনের ঘর করছে। আমি আবার আরো মেরামত কইরা আরো ভালো করছি। আমি চাই এ বাসায় আমার যা স্মৃতি আছে সুখদুঃখের তার সাথে আরো স্মৃতি জমা হোক। চেষ্টা করমু আরও ভালো করতে পারি বাসাডারে যেন বাচ্চাদের ভালো একটা শৈশব কাটে। ওদের ভালো ভালো স্মৃতি জমা হয়। ওদের নিয়েই তো আমার সংসার।

– কেমন লাগে একজন নারী হিসেবে যখন আপনার ঘর বা শহর নিয়ে চিন্তা করেন?

– যখন বলে নারীরা শহরকে উন্নত করছে, গার্মেন্টস কর্মী বিশেষ করে নারীরা যারা পোশাক শিল্পরে সমৃদ্ধ করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতেছে তখন খুব ভালো লাগে। মনে হয় নারী হইয়া আমি সার্থক।

– তা ঠিক। সভ্যতা গড়ে উঠেছে অর্ধেক নারীর বলেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারীর অবদান সর্বক্ষেত্রেই রয়েছে। সন্তানকে গড়ে তোলা থেকে শহরকে গড়া পর্যন্ত সব জায়গাতেই নারী। 'নারী' এই শব্দটা ছোট, খুব ছোট! কিন্তু এর অর্থ খুব শক্তিশালী। আপনাকে খুব ধন্যবাদ আপনার গল্পটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য।

"Cut!", সোহেল বলল। "আপু আপনার গল্পটা বলবেন না ?" তানিয়া বললো, "আমার গল্প আর নারীদের মতই। কারণ তাদের ঘর বা শহর ভিন্ন, গল্পও আলাদা, কিন্তু তবুও আমরা এক। কারণ আমরা নারী"।

Fabiha Tonika / ফাবিহা তনিকা, Dhaka, Bangladesh

I was inspired by the concept of belongingness. Because in most of the cases, we cannot predetermine where we will be born, what will be our environment; but I have had a realization, a home can be a feeling, a moment. Something intangible. It is not always a place, or any group of people. Even a calm and fulfilled soul can be a home for some people. It is the peace within ourselves can help us to find the right place. Thus, I intended to write on this topic.

মহল

তীব্র শীতেও মগ ভর্তি ঠাণ্ডা পানি মাথায় ঢালে নাজমা। অহেতুক ঝগড়ায় জড়াতে চায় না সে। সারাদিন খাটুনির পর শরীর আর মন, দুটোই শান্তি চায়। শুকনো কাপড় গায়ে জড়ানোর পরও কাঁপুনি লাগে শরীরে। বল সাবানে শাড়ি কেচে, শেষ বারের মত ময়লা আয়নায় মুখ তুলে তাকায় সে। কি আশ্চর্য! এই চোখ। আগে দেখিনি সে। কেমন শান্ত, স্থির। দরজায় কড়া নাড়ে কে যেন; নাজমা সম্বিৎ ফিরে পায়। এক হাতে ধোয়া শাড়ি, সাবান আর অন্য হাতে মোবাইলটা ব্লাউজের ভাঁজে জায়গা করে নেয়।

ঘরের পাশেই শাড়িটা মেলে দেয় সে। ভেজা চুলে তোয়ালে জড়িয়ে এদিক ওদিকে চোখ বুলায়। না! এখনো রাত ফুরোয়নি এইখানে। তার মতই অনেকে সবে কাজ শেষে ঘরে ফিরেছে। বাচ্চার কান্নার শব্দে মনে পড়ে, জুলেখার একটা মেয়ে হয়েছে। দেখতে যাওয়া হয়নি। কিন্তু খিদেও পেয়েছে বেশ, এদিকে আকাশের অবস্থা ভালো না; এই শীতে যদি বৃষ্টি হয় তবে মরণ!

নাজমা চাবি দিয়ে ঘরের তালা খোলে, জুলেখার মেয়েকে সকালে দেখবে না হয়, কিন্তু আগে নিজ পেটে কিছু চালান করা চাই।

গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করে নাজমা। ব্লাউজের ভাজ থেকে মোবাইলটা বের করে সময় দেখে। বাড়ি থেকে আর ফোন আসবে না! অন্তত কয়েকদিন। তারপর? নাজমা আর ভাবতে চায় না। কেউ আর খোঁজ না নিলেই বা কী? কে সে আসলে?

"আমি কইলাম, তুই বাইর হ এই ঘর থেইকা!" নাজমা বুঝতে পারে ফারুক এসেছে, জুলেখার স্বামী। মেয়ে হওয়াতে খুশি নয় সে। তার উপর অসুস্থ শরীরে জুলেখা কাজে যেতে পারে না, তাই রোজগারও কম। নাজমার হাসি পায়, ঘেন্না হয়, কিন্তু কী করবে? তার কী করার আছে? নাজমা শুয়ে পড়ে, কাল তার অনেক কাজ। যে বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, সে পরিবার চলে যাচ্ছে বিদেশ। কাল গেলে কিছু বকশিশ নিশ্চয়ই পাবে।

আল্লাহ গো! – ধড়ফড়িয়ে ঘুম থেকে উঠে পড়ে নাজমা। না! না! তার কিছু হয়নি, জুলেখা কাঁদছে। অন্যান্য দিনের চেয়ে প্রকট চিৎকার করছে জুলেখা, তারপরও নাজমা ঘুমাতে চেষ্টা করে। কাল তার কাজ আছে।

নাজমা ঘুমিয়েও পড়ে। কিন্তু শেষ রাতে আবারও ঘুম ভেঙে যায় তার। গায়ের মাঝে উম লাগে, কে এটা? অন্ধকারে ভালো করে দেখার চেষ্টা করে সে। ছোট্ট একটা মানুষের বাচ্চা তার গা ঘেঁষে আসছে। চোর না তো? নাজমা পাশ ফেরে, কী শান্ত একটা মুখ। ভরাট চোখের পাপড়ি। নাজমা অবাক হয়ে দেখে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে চায়। পাতলা গায়ের কম্বলটা ছোট্ট মেয়েটার গায়ে টেনে দেয়। টিনের ফুটো দিয়ে আলো ঢুকেছে ঘরে। পরিষ্কার চাঁদের আলোয় নাজমার চোখ আটকে আছে ছোট এক জোড়া চোখে। কী আশ্চর্য পরিচিত গায়ের গন্ধ। নাজমার তন্দ্রাচ্ছন্ন শরীর মনে করতে চায়, বাচ্চাটি কে? কী করে এলো তার ঘরে? খুব চেনা কেউ একজন। কিন্তু মনে পড়ছে না কেন? ক্লান্ত শরীরে নাজমা বুকে টেনে নিতে চায় মেয়েটিকে। ইস! কী ঠাণ্ডাই না পড়েছে, আর মেয়েটা কিনা দূরে শুয়ে আছে! আবছা হয়ে আসে আশ্চর্য সুন্দর চোখ জোড়া।

এত আদরেও দূরে সরে আছে কেন মেয়েটি? সে কি ঘুমোচ্ছে আসলে, নাকি ঘুমের ভান করছে? নাজমা হাতড়াতে শুরু করে। কোথায় গেল মেয়েটা? ঘুম কেটে যায় নাজমার। উঠে বসে সে, মনে পড়েছে তার। মেয়েটা বকুল! তার বকুল। কিন্তু সে কোথায় এখন?

বাইরে ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। বিছানায় বসে হাপুস হয়ে কাঁদছে

নাজমা, আজ কত দিন পড়ে মেয়েটা তার কাছে এসেছে। শেষ বারও তার পাশেই ঘুমাচ্ছিলো সে; কে জানতো চুরি হয়ে যাবে মেয়েটা? হু হু করে কেঁদে উঠে নাজমা। নিশ্চিত বাপের কাজ, নাহয় শাশুড়ির। নাহয় কপাল!

ও নাজমা! দরজা খোল।– বিছানা থেকে নেমে নাজমা দরজা খোলে। পাশের ঘরের সুফিয়া এসেছে তার কাছে।

জুলেখার মাইয়াডা মইরা গেসে।

কেমনে?

রাইতে ফারুক মিয়া মাইরা ফেলতে চাইসিলো। পরে ধস্তাধস্তি কইরা ভাগসে। পরে শেষ রাতে চোখ উলটাইয়া মরসে। মনে হয় ঠাণ্ডায়।

আহারে। জুলেখা কই?

বইসা আছে মাইয়া লইয়া। দেখবি না?

নাজমা কিছুক্ষণ চুপ থেকে উত্তর দেয়, না। আমি রাতে ফিইরা দেখমুনে।

মাইয়াডারে তো কবর দিয়া ফালাইবো।

দিক। বাইচা থাকতে দেখলাম না, এখন আর – সুফিয়াও সায় দেয়। যে মেয়েমানুষ বেঁচে থেকে দাম পায় না, তার আবার মরণের পর কী এমন মূল্য?

সকালের জন্য নাজমা ভাত তুলেই রেখেছিল, কিন্তু আজ মুখে তুলতে পারলো না। হাত মুখ ধুয়ে জুলেখার ঘরে উঁকি দিল। গতরাতে মারও খেয়েছে মেয়েটা। চোখ-মুখ ফুলে কালো হয়ে আছে। নাজমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল জুলেখা। নাজমা আর দাঁড়ালো না। বস্তির শেষ সীমানায় থাকা ছোট্ট খুপরির বাসিন্দা সে, ভাড়া থাকে তাও সই। ঘরে তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। আজ কিছু বকশিশ পেলে তুলে রাখবে। আরও কিছু টাকা জমলে ভাইদের কাছ থেকে নগদে কিনবে ভিটার জমি। তখন আর কেউ বের করতে পারবে না তাকে।

আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, গতকালের সব মন খারাপও এখন আর জেঁকে বসে নেই। নাজমা দ্রুত পা চালায়, আজ নিশ্চয়ই অনেক কাজ থাকবে।

কি গো নাজমা! আইজকা এত সকালে?- দারোয়ানের বাঁকা হাসি নাজমার ভালো লাগে না।

সব সময় তো এমন সময়েই আসি – দেখেও না দেখার ভান করে নাজমা হেঁটে যায়। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কলিং বেল চাপতেই ব্যস্ত হয়ে ম্যাডাম দরজা খুলে দিলেন।

ভালো হয়েছে জলদি এসেছ। আজকে বেশি কাজ নেই জাস্ট ঘরটা ঝাট দিয়ে দাও।

বাধ্য বালিকার মত নাজমা ঘর ঝাট দেয়। বকুলের চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটা মেয়ে আছে এই দম্পতির। পুষ্প। নাজমাকে প্রতিদিন নতুন আর মজার সব প্রশ্ন করে সে। আজকেও করবে।

- আচ্ছা, বুয়া তোমার বাসার নাম কি?

- নাজমা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ই ছিল।

- আমার বাসার নাম? নাজমা মহল!

- আচ্ছা! তোমার নামে তাই না?

- জ্বি।

- জানো? আমরা যে নতুন বাসায় যাচ্ছি ওখানে আমার রুমের একটা নাম থাকবে। তারপর যখন বড় হবো তখন আমার নামে একটা বাসা হবে।

- জ্বি। নাজমার মেয়েটাকে বড় ভালো লাগে কিন্তু কেন যেন কথা এগোলো না।

সত্যিই এই বাড়িতে আর কাজ নেই। শুধু আজ নয়, আর কখনো এই বাড়িতে কাজ করা হবে না। হলেও মালিক হবে অন্য কেউ। বের হওয়ার আগে হাজার পাঁচেক টাকাও পেয়েছে বকশিশ। নাজমার খুব একটা আনন্দ হলো না। কেন যেন মনটা মিইয়ে গেল। বেরিয়েই সিদ্ধান্ত নিল আজ আর অন্য কোন বাসায় কাজে যাবে না। ৫০০০ টাকা থেকে

দুটো ৫০০ টাকার নোট বের করে আলাদা রাখলো। ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে একটা চিকেন বান কিনলো। পুষ্প আপাকে অনেকবার খেতে দেখেছে সে। নাজমা ফাস্ট ফুডের দোকানে বসতে পারেনি। পার্কের একটি বেঞ্চে বসে খেলো। ঘুরে ঘুরে ঘরের জন্য নতুন চাদর, পাতিল, চামচ, কিনলো। বিরিয়ানির দোকানে বসে বিরিয়ানি খেল, এরপর সন্ধ্যা হওয়া পর্যন্ত শুধুই হেঁটে বেড়ালো। হাতির ঝিলের পাশে থাকা বেঞ্চে বসে মানুষ দেখলো। সন্ধ্যা শেষে ঘরে ফিরে ময়লা আয়নায় আবার নিজেকে দেখে। ভাবে, বস্তির এই নোংরা ঘরটিই তার নাজমা মহল। এ ঘর ছেড়ে আর কোথাও যেতে চায় না সে। আসলেই তো! অধিকার যখন নেই, তবে ফিরবে কেন?

Parisha Maheshareen / পরিশা মহেশারিন, Dhaka, Bangladesh

শহর কিংবা বাড়ি, সবটাই আমার, কিন্তু এই 'আমার' শব্দতেও রয়ে যায় কিছু না বলা 'কিন্তু'! সেই 'কিন্তু' নিয়েই আমার এই গল্পের ভাবনা। আমার কিংবা আমার আশেপাশে ঘটে যাওয়া কিছু সত্য, কিছু অসত্য, কিছু কল্পনা আর কিছু বাস্তবতাকে কেন্দ্র করে এই গল্পে আমার হেঁটেচলা। কোটি প্রাণের এই শহরে সম-অধিকার কিংবা সম-মর্যাদা নিয়ে আলোচনা হয় অনেক, সেই আলোচনায় কখনই ফোটে না আলো। আলো হয়তো আসবে না ততদিন, যতদিন না আমরা নিজেরা নিজেদের আলোকিত করবো। আজ আমি লিখছি খুব উদার মনে, খুব বড় গলায় নিজের জন্যে বলছি কিন্তু এই আমিই হয়তো একটু পর রাতের আঁধারে কিংবা দিনের আলোতে আমার নিজ ঘরে কিংবা আমার শহরের কোনো জায়গায় পীড়িত হবো। তখন হয়তো এই আমিই বলবো..., থাক, বাদ দিই! এই বাদ দেয়াটাই না বলা কথা হয়ে মিশে যায় আমার মতন হাজারো নারীর সাথে মাটির গহ্বরে কিংবা আগুনের লেলিহান শিখার গুঁড়ো হওয়া ছাইয়ে। এই শহরের যান্ত্রিকতার ভিড়ে নিজেকে নিয়ে দেখা দু:স্বপ্নগুলোই আমার এই লেখার অনুপ্রেরণা। আর প্রত্যয় শুধু এই একটাই, দু:স্বপ্নগুলো যেন কখনোই হানা না দেয় নিষ্ঠুর বাস্তবতা হয়ে আমার জীবনে কিংবা আমার মতন অন্য কোনো নারীর জীবনে। ভালোবাসার শহর এই ঢাকায় সত্যিকারের ভালোবাসার প্রতিষ্ঠা হোক, নারী কিংবা পুরুষের আগে এই শহরের প্রাণগুলো হয়ে উঠুক সত্যিকারের মানুষ।

মায়া

সন্ধ্যে হবে হবে। গোধুলির আলো প্রায় নিভে গেছে। আমি হাঁটছি ঢাকার সড়ক দিয়ে। একে ঠিক সড়ক বলা চলে না, গলি। বাহান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির এই শহরের এক গলি দিয়ে হাঁটছি এই আমি। যত দূর পর্যন্ত চোখ যাচ্ছে কারও দেখা পাচ্ছি না, তবু বার বার মনে হচ্ছে পেছন থেকে আমার সাথে হাঁটছে আরও কতক পা। পেছন ফিরে তাকালে কিন্তু পা গুলোকে দেখা যায়না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস থেকে নেমে বাসা পর্যন্ত যেতে রোজ এই গলিটা পার হতে হয়, আর রোজই মনে হয় আমার সাথে হাঁটছে আরও কতক পা। কিন্তু পেছনে তাকালেই কোথাও কেউ নেই। তাই সেটিকে নিছক নিজের ভ্রম মনে করে ভয়কে বিদায় দিয়েছি। নির্ভয়ে হেঁটে চলেছি গলি ধরে। হঠাৎ পেছন থেকে অতর্কিত হামলা। একটা হাত চেপে ধরলো আমার মুখ, আরেক হাত খুলে নিল চোখের

চশমা। হ্যাঁচকা টানে কোথায় যেন চলে গেলাম আমি। মুহূর্তেই আমার রক্ষিত শরীরের আবরণগুলো খুলে গেল এক এক করে। কতগুলো নরপিশাচ ঝাঁপিয়ে পরলো আমার উপরে। আমার নরম হাত-পা গুলো নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পরতে শুরু করলো।

ভাঙ্গা ইটের স্তূপের পাশে পরে আছে আমার সদ্য কেনা হলুদ পাজামা। কিছুটা ছেড়া, কিছুটা নোংরা। প্রিন্টের কামিজটা গায়ে,তবে সাথে যুক্ত হয়েছে কিছু নতুন ডিজাইন। কিছুটা লাল ছোপ আর কিছুটা থকথকে সাদার মিশ্রণে হয়েছে নতুন রঙের বাটিক।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো আওয়াজ হলো। রাত দু'টো বাজে। ঘুম যখন ভাঙ্গলো দেখতে পেলাম সামনের আলনায় ঝুলছে আমার সদ্য কেনা হলুদ পাজামা আর প্রিন্টের কামিজটা। সুন্দর আর সুরক্ষিত। বিছানার পাশে সাইড টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে দু'চুমুক পানি খেয়ে পাশ ফিরলাম আবারও।

ঘুমিয়ে ছিলাম। পাশের ঘরের চিৎকারে ঘুম ভাঙ্গলো। চোখ মেলে দেখি আমার ছোট্ট ঘরটা কেমন ধূসর ধোঁয়ায় আবৃত। পাশে থাকা চশমাটা চোখে দিতেই দেখলাম ঘরের অন্য পাশটায় হালকা লাল কিছুটা নীল ফুল ফুটে আবার নিভে যাচ্ছে। কেমন একটা ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসছে। হঠাৎ ঘরের এক পাশ কমলা আভায় আলোকিত হলো। দেখলাম আমার শখের বইগুলো পুড়ে ছাই হচ্ছে একটা একটা করে। আমি ছুটে বের হতে চাইলাম। কিন্তু কোথাও দরজা খুঁজে পাচ্ছি না। পাশের ঘরের চিৎকার থেমে গেছে। ঘরের জানালা ভাঙ্গা কাচ গলে ছুটে আসলো একটা নামি কোম্পানির সুগন্ধি বোতল। বিকট শব্দে সেটি আগুনের শিখা ঢেলে দিল আমার গায়ে জড়ানো ওড়নায়। সুন্দর মিষ্টি গন্ধ তীব্র হয়ে আটকে দিচ্ছে আমার জমে থাকা শেষ নি:শ্বাস। আমি দরজা খুঁজছি, কোথাও দরজা নাই।

আমি ছটফট করে অস্ফুট চিৎকার করে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসলাম। বালিশের পাশে থাকা মোবাইলের আলো জ্বেলে দেখলাম খুব বেশি সময় পার হয় নি। মোবাইলের ঘড়িতে দু'টা ছাব্বিশ বাজে। গায়ের ওড়নাটাও ঠিক গায়েই আছে। পুড়ে ছাই হয়নি। বইগুলো এখনো শেলফে সাজানো আছে সারি সারি। আবারও পাশ ফিরে শুয়ে পরলাম।

বাড়ির মূল দরজায় খটখট শব্দ হচ্ছে। বেল ছেড়ে সবসময় বাবা অমন খটখট শব্দ করে। বিরক্তিকর স্বভাব। গেট খুলে হতভম্ব। আমাকে অবাক করে দিয়ে সে দাঁড়িয়ে

আছে। কতগুলো দিন পার হয়ে গেছে প্রিয় এই মানুষটিকে না দেখে, আজ হাসি মুখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে! অন্তরের লজ্জা ভুলে ঝাঁপিয়ে পরলাম উষ্ণ আলিঙ্গনে। দরজা আটকাতে আটকাতে জমে থাকা কত কথা। কত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। একসাথে বসে দু'কাপ চা আর না বলা কত অপেক্ষা। হঠাৎ কী করে যেন তার শক্ত হাতে পেঁচিয়ে গেল আমার কোমর অবধি লম্বা চুল। কিছু বুঝবার আগেই সেই মুঠি থেকে মুক্তি পেলাম পুরোনো দেয়ালে হুড়মুড়িয়ে আছড়ে পড়ে।

ঘুম ভেঙে গেল। নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিছানা থেকে নিচে। হুড়মুড়িয়ে দেয়ালে আছড়ে পড়িনি, পড়েছি বিছানা থেকে গড়িয়ে নিচে! বিছানায় উঠে মোবাইল খুলে দেখি রাত তিনটা বিশ। আবারও ঘুমিয়ে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সকালে ক্লাস। বাসা থেকে বের হয়েছি। দেরি হয়ে গেছে। দ্রুত পায়ে হাঁটছি। হঠাৎ পেছন থেকে সজোরে ধাক্কায় ছিটকে পরলাম গলির মুখে। গলির শেষ প্রান্তে চেনা একটা মুখ দেখলাম থমকে দাঁড়িয়েছে। ততক্ষণে কিছু অচেনা শক্ত হাতে রুপোলি ছুড়ি শোভা পাচ্ছে আমার কন্ঠনালীর মধ্যখানে। আমার আকুল চোখের আকুতি চেনা মুখটা অন্তত কাওকে ডেকে এনে আমাকে বাঁচাক। কিন্তু চেনা সেই মুখ পালিয়ে গেল তার বাড়ির শক্ত কাঠের দরজার আড়ালে আমাকে মৃত্যু মুখে একা ফেলে। অচেনা শক্ত হাতগুলো বার বার উঠে নেমে যাচ্ছে আমার কন্ঠনালীতে, আমার ডান হাতের কব্জিতে। আর তাদের চিৎকার করে বলা "এই হাত দিয়েই না লিখতি? এই গলা দিয়েই না বের হতো আমাদের বিরুদ্ধে কথা? সব বন্ধ! সব শেষ!" শব্দগুলো আস্তে আস্তে অপরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে আমার কানে। পিচঢালা এই ধূসর গলিতে রুপোলি ছুড়ি হাতে কতগুলো অচেনা হাত ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে। রুপোলি ছুড়ি থেকে টপটপ করে পরছে টাটকা লাল রঙ, আর গলির মুখে আমার অর্ধকাটা গলার লালগুলো গড়িয়ে পরছে নোংরা ড্রেনটায়। কী সুন্দর জীবন্ত ক্যানভাসে আমি পরে আছি নিস্তেজ নিথর।

ঘুম ভাঙ্গলো। মোবাইলের অ্যালার্ম বাজছে, সেই সাথে আমার বাবার চিৎকার। দুই আওয়াজ একসাথে মিশে নতুন কোনো সুর তৈরি হচ্ছে বোধহয়।

বিছানা থেকে নেমে লম্বা চুল পেঁচিয়ে খোঁপা করতে করতে ভাবছি কি অদ্ভুত দু:স্বপ্নের রাত শেষ হলো। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে ন'টা বাজে। দরজা খুলে বের হতেই বাবার নতুন কিন্তু পুরাতন চেনা কিন্তু কিছুটা অচেনা সুর, "নবাবজাদির ঘুম ভাঙ্গসে! এত টাকা খরচ কইরা লেখাপড়া শিখাইসি, সে এখন চাকরি করবে না। কী করবে? ব্যবসা করবে। আরে ব্যবসা যে করবি টাকা পাবি কই? আবার কী সব ঢঙ্গের লেখা লিখে, রাস্তা ঘাটে বাইর হইতে পারি না। মানুষ আমারে হুমকি দেয়। আরে তুই মরবি মর। চৌদ্দ গুষ্ঠি নিয়ে মরতে হবে কেন তোর!"

ভাঙা রেডিও'র মতন চলতে থাকা একঘেয়েমি সুর উপেক্ষা করে ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে গেলাম সাড়ে তিন তলার চিলেকোঠার ছাদে। রোদ উঠে গেছে। হালকা শীতের সকালে রোদ পোহাতে পোহাতে সিমেন্টের ছাদের এক কোনায় বসে চুমুক দিলাম গরম চায়ের কাপে। পাশের ছাদের কৌতূহলী কিন্ত নোংরা চোখগুলো তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমার আবৃত শরীর আর অনাবৃত পায়ের পাতাই তাদের আনন্দের খোড়াক। নিচে নেমে এলাম। আড়াল করে নিলাম আমার আবৃত শরীর আর অনাবৃত পায়ের পাতা আমার ঘরের চলটা ওঠা পুরনো ড্যাম খাওয়া স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধের চার দেয়ালের ভিড়ে।

কোটি প্রাণের এ শহরে অনেক জায়গা, কিন্তু আমার জায়গাটা কোথাও নেই। বাড়ির ছাদ, গলির সরু রাস্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলা উদ্যান, রাস্তার মোড় কিংবা ঘরের দেয়াল এসব কিছুই আমার হয়েও হয় না আমার। মায়াময় এই নগরীতে আমি কিংবা আমার মতন অন্য আমি'রা সবসময়তেই একলা। একলা আমার এই আমি, এই আমার শহর আর এই আমার বাড়ি।

Parisha Maheshareen / পরিশা মহেশারিন, Dhaka, Bangladesh

চারশো বছরের পুরনো এই শহর ঢাকার চিরাচরিত রূপ আমার এই প্রবন্ধের অনুপ্রেরণা। এই শহরের প্রতিটি চার দেয়ালে জন্ম নেয় নতুন নতুন গল্পের। সেই গল্পগুলো তৈরি হয় কিছু সুখ কিছু বিষন্নতা, কিংবা কিছু পাওয়া কিছু না পাওয়ার গল্প নিয়ে। ক্লান্ত তরুণ মনের নিজস্ব কিছু বিষন্নতা আর তা থেকে নিজেই উত্তরণের পথ খুঁজে বের করার গল্পের ফসল আমার এই শব্দগুলো। শহরের রূপ আর তার সাথে মিশে যাওয়া নিজের অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধন করে দিয়েছে কিছু কাল্পনিক অধ্যায়। নাগরিক জীবন, শেষ না হওয়া ছুটে চলা পথ, স্বপ্ন আর অস্বপ্নের দোলাচাল এই সবকিছু কে কেন্দ্র করে নিজেকে হারিয়ে যেতে না দেয়ার জরুরী খবর প্রকাশই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য।

আত্মকথার উপাখ্যান

দেয়ালের পিঠে দেয়াল। তার পিঠে দেয়াল। পুরোনো, অপুরোনো আর আধা পুরোনো ইট-কাঠের এই ঢাকাকে মায়া নগরী বললে হয়তো ভুল হবে না। কালো কার্বনের মায়ায় আটকা পড়েছে নগরের কোটি মানুষ। গভীর রাতে এখানে কিছু দোকানে ওঠে কয়লা পোড়া কাবাবের ধোঁয়া, আবার কোথাও রঙ মেখে খদ্দেরের আশায় ঘুরে বেড়ায় পাথুরে মায়াপরী। যান্ত্রিক ভোরের আলো ফোটে "আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম" শব্দে। আবার গোধুলি বেলায় হয়তো কোথাও শোনা যায় ঢাক আর শঙ্খের মধুর ধ্বনি। দুপুরগুলো কখনো নিয়ে আসে ঝকঝকে রোদে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত শরীর, হয়তো কখনো আবার রিকশা কিংবা মোটরযান গুলো আটকা পড়ে অলি-গলির জলাবদ্ধতায়। আপাদমস্তক নোংরা নির্বাসযোগ্য শহরের তালিকায় ওপর দিকে থাকা এই ঢাকাই আমার মতো কোটি প্রাণের ভালোবাসার শহর। অযত্নে অবহেলায় থাকা এই ঢাকার নিদর্শনগুলোও শিখে গেছে নিজেকে নিজে ভালোবাসবার মন্ত্র। চারদিকে ময়লা-জীবাণু-ক্ষুধার তাড়না সব মিলেমিশে প্রতিদিন এখানে জন্ম নেয় কোটি নতুন গল্পের অধ্যায়, আর সমাপ্তি হয় কত শত সমাপ্ত না হওয়া স্বপ্নের। প্রতি চার দেয়ালে জন্ম নেয় নতুন কোনো অভিনয়। রাস্তার পাশে পলিথিনে গড়ে ওঠা সংসার গুলোও দিনশেষের

ভালোবাসায় মত্ত হয়। অপরাধে ভরপুর নোংরা এই শহরের মায়ায় অন্য দশ তরুণ তুর্কীর মতন আটকা পরেছি আমিও। প্রতিদিনের সূর্য গুলো নতুন করে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে, 'পালিয়ে যাও!' কিন্তু পালাবো পালাবো করে জীবনের বাইশটি বসন্ত পারি দিয়ে ফেললাম আমার এই মায়ার শহরের ইটের চারটে দেয়ালে। আমার এই চার দেয়াল রোজ আমাকে স্বপ্ন দেখায়। কিছু সুখের স্বপ্ন। কিছু ভুলে ভরা ভুল স্বপ্ন। এই শহরের কোনো এক কাক ডাকা ভোরে ধরণীর বুকে আমার প্রথম আগমন। এই শহরেই আমি হেঁটেছিলাম প্রথম। প্রথম গিয়েছিলাম স্কুল, প্রথম কৈশোর, প্রথম ভালোবাসা, প্রথম রাগ, প্রথম অভিমান, প্রথম তারুণ্য। শত শত প্রথমের ভিড়ে আটকে পড়ে প্রথম বাস্তবতাগুলোও। এই শহরে এই চার দেয়ালেই প্রথম অনুভূত হয়েছে স্বপ্ন ও অস্বপ্নের বাস্তবতা। এখানেই প্রথম জেনেছি সম্ভব ও অসম্ভবের মাঝের ফোঁকরটা কোথায় গলে। জেনেছি এর মাঝের অপেক্ষার গল্পটাও। কিছু বিষন্নতা, কিছু অবাস্তবতাকে ঘিরেই যে এই শহর আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আরও কিছু নতুন কার্বনে মাখা ভোরের সূর্য দেখবার অপেক্ষায়, এও এখন আর অজানা নয়। বিষণ্ণতাগুলো কখনো নিয়ে যায় গভীর কুয়াশায় ঢাকা আচ্ছন্নতায়, আবার এই বিষণ্ণতাই শক্তি যোগায় সামনে এগিয়ে যাবার। তবুও ভয় হয়। এই বুঝি হারিয়ে গেলাম। এই বুঝি মিলিয়ে গেলাম কোটি মানুষের এই শহরের ভিড়ে। দেয়াল থেকে ভেসে আসে নি:শব্দ চিৎকারের প্রতিধ্বনি 'পালিয়ে যাও! হারিয়ে যাও!' পরক্ষণেই অন্ধকার ঘরে তীব্র চিৎকার করে জেগে উঠে দেখি দু:স্বপ্ন হাতছানি দিয়ে ডাকছে অদূরে। কিন্তু না। কোথাও যাবো না আমি। আমি আছি, আমি থাকবো। হাজারো নোংরা পুরুষের চাহনি, ঘরে ও বাহিরে নির্যাতন ও অনির্যাতনের গল্পগুলোর শেষেও আমি থাকবো। এই শহরের কালোর মায়ায় হারিয়ে গিয়েও ফিরে আসবো বার বার। হয়তো এই ফিরে আসাই আমার মতন আমি ও আমাদের গল্প। কার্বনের কালোর মায়ায় ঢাকা এই 'ঢাকায়' সকল অশুভ'র ঊর্ধ্বে শেষ হয়ে যাবে না আমার মতন এই আমি'দের গল্প।

Fahmida Afroz KanokSrabon / ফাহমিদা আফরোজ কনক শ্রাবণ, Dhaka, Bangladesh

Thanks to Sampad for allowing such an incredible opportunity where we could be encouraged to write about our city, our home and bring out the unenlightened stories of this city life. This is a chance for me to highlight the hidden faces of the women, how they fall back every time and lack to embrace the best options of their lives.

মনিরাদের ঘর থাকেনা, ওরা ঘর জুড়ে দেয়

যাদিও বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায়, আমার শহর আমার ঘরবাড়ি। আর এই মুহূর্তে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন নারী হিসেবে আমার কাছে এর মানে এই, আমার শহর কি আমার ঘর? হতে পারে এই ঘর তাকে বলে দেয়, কী চাও এই শহরের কাছে? অথবা ঘরকে ঘিরে যে মানুষের সম্পর্কের পারিপার্শ্বিকতায় তোমার বাস, তা থেকে তুমি কেমন করে তোমার শহরে নিজেকে পরিচিত করবে? কী হলে তোমার ঘর তোমার কাছে ততটাই গুরুত্বপূর্ণ, শান্তির, সুখের, আশীর্বাদের?

ঘুম ভাঙে প্রায় ষাটোর্ধ মনিরার, তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য প্রতি রাতেই। ইদানিং হাঁটুসহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যাথাটাও জানান দেয় বিগত ৫০ বছরের পরিশ্রমে ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শরীর। কিন্তু মনের কাছে বিন্দুমাত্র হারেনি, বেঁচে থাকতে ক্লান্তির কাছে নয় পরাজয়। আবারও মনে পড়লো লুবনা আপার কথাগুলো! 'নারী', তার নাকি আবার নিজের শহর বা ঘর, এমনও হয় নাকি?

মাত্র ১৫ বছর বয়সে গিয়েছিল স্বামীর বাড়িতে, অনেকগুলা ভাইবোনের ঘরে জন্ম নেয়া মনিরার খুব আদরযত্ন না হলেও অনাদর ছিল না মোটেও। যদিও পড়াশুনার প্রতি প্রচুর আগ্রহ ছিল মনিরার, কিছুটা আফসোস সেখানে রয়েই গেল স্কুলটা পার হওয়া হলো না বলে। তবুও সে আজ অন্যের ঘরকে নিজের ঘর বানাবার স্বপ্নেই বিভোর। সে সন্তানসম্ভবা।

ঝঞ্ঝাট বাঁধলো তখন, যখন সে পুত্র সন্তান কোলে নিয়ে দু'মাস পর বাপের বাড়ি থেকে ফিরলো স্বামীর ঘরে! তখনই সে প্রথম জানলো তার স্বামী কতটা চরিত্রহীন! পরনারীর

প্রতি আসক্ত স্বামীর অসৎ চরিত্রের নমুনার সাক্ষী হয়েই একমাত্র সন্তানের হাত ধরেই বাপেরবাড়ি ফিরে আসে। সে সময় ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না মোটেও! বাবার অনুমতি নিয়ে নিজেকে নতুন পথের দিশার সন্ধানে যাবার ইচ্ছায় নামলো সন্তানকে কোলে নিয়েই। বুঝে গেল বাঁচতে হলে তাকে যুদ্ধে নামতেই হবে, এই প্রতিজ্ঞা নিয়েই বদলে যায় শহর-ও-ঘর বদলানোর গল্প।

হারিয়ে গেল তার সংসার, ঘর, পড়াশোনা হয়তো হবেই না। কিন্তু এত ছোট বাচ্চাসহ কী কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব? সে তো স্কুলের গন্ডিই অতিক্রম করেনি।

অতঃপর রাজধানী! ছেলেকে নিচে গ্যারেজে খেলতে দিয়ে অন্যের সন্তানের সেবাযত্নের দায়িত্বপালন করে মা গভর্নেস। মাঝেমাঝে শুধু খাবার খাইয়ে আসে, সারাদিনের ক্লান্তির পর মা ও ছেলের দেখা হয় রাত নয়টায়। তখন পড়তে বসলে ছেলেটি প্রচন্ড কান্নাকাটি জুড়ে বসে, মাকে আর বইখাতা ধরতেই দেয় না। অগ্যতা মা সারাদিনের সোহাগ অনাদরে ফেলে রাখা সন্তানের বরাদ্দ নিয়ে ছেলেটিকে খাইয়ে দিয়ে ঘুমপাড়াতে গিয়ে নিজেও ঘুমিয়ে পড়ে। তবে কি আর তার পড়াশোনা হবে না?

বাড়ির গৃহকর্তা অমায়িক মানুষ, তাঁর বিশাল সংসারের ঐশ্বর্যের ভিড়ে তিনি আবিষ্কার করেন নির্লিপ্ত, নির্লোভ, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ এক ধার্মিক নারীকে! একদিন তাকে ডেকে নিভৃতে প্রশ্ন রাখলেন, তোমার সন্তানের সাথে আরও বেশ কিছু শিশুর দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হলে, তুমি কি পারবে তাদের দায়িত্ব নিতে?

নির্বোধ চাহনি, একসমুদ্র জিজ্ঞাসা! এর মানে কী? আবার কোথায়, কোন শহরে, কোন ঘরে তার ঠিকানা হবে! তার ভাগ্যে কি শুধুই ঘর বদলের এই খেলা চলতে থাকবে? কিছুই করার নেই, সন্তান-সহ কেই বা ঠাঁই দেবে? বাঁচতে হলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ন হতেই হবে তাকে! সেই শুরু। ৮১ সালে খুলনা জেলার অজ পাড়া-গাঁয়ের থেকে বেরিয়ে আসা বছর বিশের এক লাবণ্যময়ী কন্যা হঠাৎ করেই নারীতে রুপান্তরিত!

রাজধানীর একপাশে বর্ধিত নগরীর এক অংশে চারিদিকে জঙ্গল, ঝোপঝাড়, ঝিলের জলে ঘেরা একটি জমিতে টিন শেডের একটি ঘরে আবারও ঘর বাধে!

''এই শহরের একটি ঘরে সে বসত করে যার কেউ নেই, আছে হয়তো অনেক শতেক তারাই এখন তার সব হয়”

শুরু হলো নুতন ঘরের নুতন সদস্যদেরে সাথে নুতন পথচলা, আর যাদের নিয়ে শুরু তাদের বলা এই হলো- তোমাদের অভিভাবক, 'বাবা-মা'! যে সমাজে প্রায়শই পিতা মানে জন্মদাতা, আর মা মানে? দিন রাত্রি এক করে পরের- সন্তানকেও আপন করে এক লহমায় বুঝিয়ে দেয়া, একথালা ভাত দশ জনকে ভাগ করে খাইয়ে দেয়া, একটি হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দশটি বাচ্চাকে পড়াশোনা করানো এবং এদের মা হয়ে ওঠার জন্য যতরকম ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরিশ্রম, একাগ্রতার প্রয়োজন। লোকের কাছে এদের জন্য বিনয়ের সাথে অনুনয় উপস্থাপন করে প্রতিষ্ঠানের প্রতি অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একসময় তিনশো সন্তানের 'মা' হয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় নিজেকে এতটাই ইতিবাচক উদাহরণ তৈরি করলো, যা হয়ে মা মনিরা ব্যক্তি মনিরাকে হারিয়ে ফেলে। মুছে যায় তার একমাত্র সন্তানের বেড়ে ওঠায় তার কত কী স্বপ্ন ছিল। নিজেকে শিক্ষিত নামের একটি দুটো কাগজে বন্দী করার অভিলাষের গল্প, বিধাতার ইচ্ছায় তার চেয়ে শতগুন তাদের প্রাপ্তি হয়ে যায়, যা হয়তো তপস্যা থাকে অনেকের।

এই মনিরাকে কোন শহর তৈরি করেছে এই জাহ্নবী রূপে? আজও এই শহরেই সে নিজের একটি ঘরের প্রতীক্ষায়, তার এই আত্মপ্রত্যয়, নিজেকে প্রবঞ্চনা, আত্মসমর্পন সব কি ছিল ইচ্ছাকৃত, কে জানতে চেয়েছে? যে মা নিজের একটি গৃহকোণের আশায় এই অবধি শুধু আপন মহিমায় তার মাতৃত্বের মাধুরি ঢালছে যে অনাথ এতিম সন্তানদের জন্য। গত চল্লিশেরও বেশি সময়ে কেউ কি জানতে চেয়েছে পরিবর্তনের এই শহরে তার মন কী চায়? তার নিজের ঘর, সে ঘর কেমন হবে, সেখানে কি তার সন্তানকে নিয়েই থাকতে চান? নাকি অন্য কোন চাওয়ায় তার নিজস্ব ভাবনাগুলো লুকানো?

এ শহর তাকে নিয়ে কী ভাবেছ, সে কি তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে এতদিন কোন আবহে কী ঘর তার জন্য বরাদ্দ ছিল? মুনিরাদের শহর বা ঘর কখনোই বুঝি থাকে না, তারা মানুষের ভালোবাসা আর বিশ্বাসের ঘরে বসত করে। তাদের শহর তাদের কাছে ফাল্গুনে জন্মানো নতুন পাতার মতো যার ছায়ায় কিছুক্ষন দাঁড়ায়, কিন্তু ঘরই তার বৃক্ষের শিকড়! তাই যে ঘরেই তার অস্তিত্বের বসত, সেখানেই সে তার শ্রম ভালোবাসা বিশ্বাসের সবটুকু দিয়েই তার যত্ন নেয়, পানি ঢালে, পরিচর্যা করে। নিজের বিনোদনের সততার পাখা মেলে ওড়ে! নারী

মুনিরার ঘর বাঁধার স্বপ্ন-শখ কখনোই মেটে না, তার সামাজিক সংসার নামক খাঁচায় থাকার স্বপ্ন পূরন না হলেও সে যত্ন করে গড়ে তোলে একটি করে স্বপ্নের ভীত, অন্য কন্যার মনের গভীরে।

আমার শহর আমার ঘর আমাকে কতটা দেবে বা আমি কতটা নেব, বোধ করি তা ব্যক্তির সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন ঘটে তার কর্ম বা মানসিক ইচ্ছার উপর। নারী জন্মগত ভাবেই শক্তির আধার, তার কর্মক্ষমতা সর্বকালেই তুলনাহীন, যার জঠরে মানব সন্তান ধারণ করে তার স্নায়ু প্রসব যন্ত্রনা সহ্য করে তাকে কর্মে ও দক্ষতায় প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার সুযোগ যদি তার ঘর দেয়, তা থেকে এমন হাজার মুনিরার পক্ষে তার নিজেকে চেনার পরিধি তৈরি হয়। আমাদের শহর পারে শিক্ষার বিস্তার লাভে প্রগতিশীল মুক্তির উন্মোচন হয় এমন কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভার বিকাশ ঘটে এমন নারীকে শিক্ষায় সংস্কৃতির উন্নয়নের নুতন দিগন্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে।

রাষ্ট্রের উন্নয়নে দেশের অর্ধেক নারীর শহর যদি তার চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটাতে সুবিধা-বঞ্চিত নারীর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায় তবে বাংলাদেশের মানচিত্র এতটাই আলোকিত হবে, আগামীতে বার্মিংহামে নয় আগামীর নারী বাঙালি রমনীয় গুণে, জ্ঞানে, কর্মদক্ষতায়, শিক্ষায়, প্রজ্ঞায় ছড়াবে আলো, বিশ্বের যে কোন প্রতিযোগিতার শীর্ষে।

চাইলে যে কোনো শহরেই ঘর গড়ে তোলা যায়, কিন্তু সে ঘর আমার কতটা, তা শুধু মনিরাই ভালো বলতে পারবে। তবুও নারী দিয়ে যায় নিঃশব্দে, নিঃশেষে। তবুও এই শহরে আমার একটা ঘর তো ছিল, যেখানে দিন শেষে আমার অবসন্নতার অবসান ঘটে।

Sania -E- Aferin / সানিয়া-ই-আফেরিন, Noakhali, Bangladesh

এই প্রজেক্টে নিজের স্বপ্নের কথা বলার সুযোগ পেয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছি। নিজের মনের কথা বলার এমন পরিসর সহজে মেলে না। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই এমন আয়োজনের জন্য।
নারীদের জন্য নতুন দিগন্তের দেখা দিল এই আয়োজন।

আমার শহর আমার বাড়ি

ছোটবেলা থেকে দেখছি আমার মায়ের কোনো বাড়ি নেই! শ্বশুরবাড়ি কিংবা বাবার বাড়ি কোনটাই তো তাঁর নিজস্ব নয়। একবার মাকে প্রশ্ন করলে দেখি খুব মন খারাপ হলো তাঁর। বললেন, তুই পড়াশোনা করে বড় হয়ে মাকে একটা বাড়ি করে দিস! আমিও তখন থেকে স্বপ্ন দেখি মায়ের একটা বাড়ি হবে। আমার নিজেরও একটা বাড়ি হবে! বয়স আমার তিরিশের কোঠা পেরিয়েছে, এখনও স্বপ্নপূরণ হয়নি। তবু স্বপ্ন দেখে যাচ্ছি। গ্রামে আমার বয়সী একটা অবিবাহিত মেয়ে থাকাটাই সমাজের বোঝা, সকলের মাথাব্যথার কারণ। প্রতিনিয়ত নিত্যনতুন আঘাত আসে। তবুও আমি বিচলিত নই, আমার সময় একদিন আসবেই। স্বপ্ন আমার পূরণ হবেই। আমার বাড়ি হবে আমার নিরাপদ আশ্রয়, যেখানে কোনো উৎকন্ঠা থাকবে না। আমার বাড়ির সাথে সাথে আমার গ্রামটাও হয়ে উঠবে নারীদের অভয়ারণ্য ,যেখানে নারী শুধু নারী নয়, মানুষ হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতিটি নারী নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বাস্তবেই নিজের বাড়ি গড়তে পারবে।

বহুবছর আগে আমাদের গ্রামে বেসরকারি উদ্যোগে নারীদের জন্য একটা মার্কেট হয়। কিন্তু সাহস করে নারীরা না আসায় পুরুষরাই চালাচ্ছে এটা। আমি চাই একদিন নারীরা সব বাঁকা চোখ উপেক্ষা করে নিজেদের অধিকার বুঝে নেবে।

আশার কথা এখন বেশ কয়েকজন নারী এই অজপাড়া গ্রামে থেকেই অনলাইনে পণ্য বিক্রি করছে!

তাই স্বপ্ন আজ পাখা মেলে আরো অনেক দূরে। আমরাই গড়ব আমাদের বাড়ি, গ্রাম, শহর, আমাদের দেশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হবে আমাদের বিচরণক্ষেত্র।

Sania -E- Aferin / **সানিয়া-ই-আফেরিন**, Noakhali, Bangladesh

আমি নারী হিসেবে নিজের অবস্থান নিয়ে সর্বদা যে বিড়ম্বনা নিয়ে থাকি,আর স্বপ্ন যেমন দেখি তা ভেবেই এই আয়োজনে সাড়া দিয়ে এমন লেখা।

নিরাপদ নগরে স্বপ্ন-বাড়ি

আমার হাসিটা আজকাল কান্নার মত হয়ে গেছে,
কিংবা হাসতেই ভুলে গেছি।
প্রতিদিন নতুন পত্রিকায় পুরাতন খবর আসছে,
অথবা একই খবর দেখছি।
প্রতিটি দিন তাই আর আলাদা মনে হয় না।
নারী হবার আজন্ম পাপ যেন পিছু ছাড়েনা।

এ শহরটা আমার হয়েও যেন আমার নয়,
মায়ায় জড়ানো বাড়িটাও অচিন মনে হয়।
নারীদের যেন নিজের কিছু থাকতে নেই!
অথচ, মিশে আছে এসব আমার অস্তিত্বেই।
কে রাখে এই অস্তিত্বের খবর?
কে দাম দেয় সাহসী স্বপ্নের?
জীবনের মূল্য দিয়েও তাই স্বপ্ন ফেরি করে যাই,
দুঃসাহস নিয়ে অনুচিত স্বপ্ন দেখে অপবাদ কুড়াই।
স্বপ্ন দেখি ভয়হীন পদচারণার,
স্বপ্ন দেখি আকাশ ছোঁয়ার!
সময় এখন সব শেকল ভাঙার,
সব বাধা পেরিয়ে নিজের অস্তিত্ব গড়ার।

আমার স্বপ্নে সাজাব নিরাপদ শহরে আমার বাড়ি,
বিশ্বকে জানিয়ে দেবো, 'আমি নারী, আমিও পারি'।
আমি ভালবাসি আমার অস্তিত্ব,আমার দেশ।
নতুন দিনে হারিয়ে যাক সকল না পাওয়ার রেশ।
আগামীর পৃথিবী নারীর হাসিতে ভরে উঠুক,
নিরাপদ নগর সাহসী পদচারণায় মুখরিত হোক।

Sujana Afrin Oishee / সুজানা আফরিন ঐশী, Dhaka, Bangladesh

First of all, my mother inspires me to write in this event. Then the title 'My City My Home' inspires me to think about my own city, to think about my own home, to think about that if I am really happy and safe in this city or not.

পরের জন্মে তুমি আমাদের হবে তো শহর?

ছোটো থেকে বড় হয়ে ওঠা যেখানে তা হচ্ছে এই ঢাকা শহর। আমার প্রিয় আর সবচেয়ে পরিচিত ঢাকা শহর।

আমার জন্ম এখানে নয় যদিও। জন্ম আমার শরীয়তপুরে। সেখানে নানুবাড়িতে এক ছোট্টো ঘরে আমার জন্ম হয়। কাছেই দাদুবাড়ি। এই দুই বাড়ি মিলিয়ে আমার জীবনের প্রথম দেড়টা বছর কেটে যায়। এরপর ১.৫ বছর বয়সে আমার প্রথম শহরে আসা চাচ্চুর হাত ধরে। এবং যখন আমার বয়স ২.৫ বছর তখন একেবারে শহরে চলে আসি।

এ শহরে এসেই আমার সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল যখন আমার বয়স ৪ এর মতো। প্রচুর দুষ্ট ছিলাম আমি। সারাদিনই প্রায় একটা ডানপিটে বাচ্চার মতো বাইরে খেলতাম, না হয় অন্যদের ঘরে পরে থাকতাম। ওই ৪ বছরের আমার যেন কোনো ক্লান্তিই ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় এক আংকেল এর রুমে যাই আমি। খেলতে গিয়েছিলাম! কিন্তু সে আমার সাথে এমন এক খেলাই খেললো যে আমি ওই রুমে আর কোনোদিন যাইনি। ঐ বয়সের সেই ছোট্টো জুলিয়া কিছুই বুঝতো না। কিন্তু সে এতটুকু বুঝেছিল যে সেই খেলাটা ভালো ছিল না। যেই খেলাতে মায়ের সামনে ছাড়াও অন্য কারো সামনে নগ্ন হতে হয়, এ আবার কেমন খেলা? যে খেলা খেলার পর আম্মুকে বলা যাবেনা এমন শর্ত জুড়ে দেয়া হয় এ আবার কেমন খেলা?

নাহ, এ খেলা জুলিয়া আর খেলবে না। না না, একদম ই না।

আর কোনদিন জুলিয়া সেই দুষ্ট আংকেল এর ঘরে যায়নি।

এরপরও আমি নিয়মিত এ রাস্তায় সে রাস্তায় খেলতে যেতাম, এ মহল্লা থেকে সেই মহল্লায় সে ছুটে চলে যেতাম। আর এদিকে মা প্রতিদিনি আমাকে খুঁজে হয়রান হতো। আর আমি প্রতিদিন মাকে চিন্তায় ফেলে দিয়ে শৈশবের আনন্দটাকে উপভোগ করতে ছুটে যেতাম যেখানে আমার ইচ্ছা হতো।

কিছুদিন পর আমি অন্য আরেকটা আংকেল এর রুমে যাই। কিন্তু একি! আশ্চর্য! সেই আংকেলও আমাকে কেমন অদ্ভুত এক খেলা দেখালো। আর মাকে বলতে না করলো। না না, এ খেলা তো ছোট্টো জুলিয়া খেলতে চাইত না। সে তো পুতুল খেলবে।

এমনি করে বয়স যখন ৫ এর কাছাকাছি তখন নতুন এক বাসায় যাই, নতুন বাসা ভীষণ বড়ো৷ খুব খুশি হয়েছিলাম ছোট্টো সেই আমি। কিছুদিন পর স্কুলে ভর্তি হই। জীবন যেন এক গাদা গোলাপের চেয়েও বেশি সুন্দর তখন৷ তবে সেই গোলাপের কিছু কাঁটা যেন জীবনকে মাঝে মাঝেই অতিষ্ঠ করে দিচ্ছিল৷ সেই কাঁটার এতই বিষ যে আজ ১৬ বছর বয়সেও তা যেন ভুলতে পারি না। কী করেই বা ভুলবো? জীবনের প্রতিটা ধাপই যে সেই একই, সেই দুষ্ট আংকেলদের মতো আরো এমন হাজারো দুষ্ট আংকেলের দেখা পেয়েছি। কখনো সেই দুষ্ট লোক ছিল নেহাতই অপরিচিত। কখনো বা খুব কাছের কেউ। এ তো ছিল বাইরের কথা। আমার ঘরেই কি আমি নিরাপদ ছিলাম? নিরাপদ ছিল সেই ছোট্টো জুলিয়া? সে কি স্বাচ্ছন্দ্যে তার বাসায় বেড়াতে আসা আংকেলগুলোর কোলে বসতে পারতো? উত্তরটা হলো– নাহ! জুলিয়া পারতো না।

আমার বাসা থেকে অন্য মেয়েদের বাসার মতো এত বাধা ছিল না। আমার সকল শখ পূরণ করতে দেয়া হতো৷ চাহিদা ছিল না। তবু মনের কথা বুঝে নিয়েই সব কিছু পূরণ করতো আমার বাবা-মা। একটু যখন বড় হলাম তখন আর এসব দুষ্ট লোকেরা খুব বেশি কাছে ভিড়তে পারতো না৷ তবে অষ্টম শ্রেনীর সেই বিভীষিকাময় ঘটনা আমি আজও ভুলতে পারি না। যা শুধু আমিই জানি। কোনোদিন কাউকে বলতে পারিনি। আজ এই গল্পেই তার প্রথম আভাস প্রকাশ পেলো।

কিন্তু যখন একটু বড় হচ্ছিলাম তখন থেকেই শুরু হলো ভিন্ন এক ধরনের কাঁটার অত্যাচার। কারণ তখন যে আমি একটা ফুটন্ত গোলাপ। তাই চারপাশের কাঁটাগুলোও আর আগের মতো মসৃণ ছিলনা। এখনো সেই সময়টাই চলছে। এখন আর আগের মতো পরিবারের কাছ থেকে সেই স্বাধীনতা পাইনা। কারণ আমি যে এখন ১৬ বছর বয়সী এক ফুটন্ত গোলাপ। আমাকে যে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হবে। বাইরের কাঁটার আঁচড় থেকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আমি যে অবাধে উড়তে চাই। সারা দুনিয়াটা ঘুরতে চাই। তবে কেন আমার গন্ডি এত ছোট করে দেয়া হচ্ছে? সারা দুনিয়া তো নয়, বরং কেন আমাকে আমার শহরটাও ঘুরতে দেয়া হচ্ছে না? কেন?

ঘুরতে দেয়া হলেও আমি তো এই শহরে আর নিরপদ বোধ করিনা। কেন? তবে কি এই শহর আমার নয়?

তবে কি আমি এই শহরের এক আগন্তুক মাত্র? নাহ! এ তো হয় না। এই শহরেই যে আমার বেড়ে ওঠা। আমার কথা বলতে শেখা। আমার চলতে শেখা। তবে কেন এত বাধা সেই শহরেই। কেন এত কাঁটার আঁচড়?

আমি এখনো স্বাধীন নই কেন? একা একা মুক্ত পাখির মতো চাইলেই ডানা মেলে উড়তে কেন পারি না আমি? তবে কি ঘর বন্দী হয়ে থাকার জন্যই আমার জন্ম হলো? আর আমার মতো আরো শত শত জুলিয়া যারা নিজেদের কথা গুলো আমাকে মতোই প্রকাশ করতে পারছে না। যারা আমার মতোই মুক্ত পাখির মতো ডানা মেলে উড়তে চায়। কিন্তু বাইরের কাঁটার আঁচড়ের ভয়ে তাদের ডানাগুলোকে অপরিপক্ক অবস্থাতেই কেটে দেয়া হয়। আচ্ছা, তবে কি তাদের বেড়ে ওঠার জায়গা সেই প্রিয় শহর তাদের নিজের না? কেন আমরা আমাদের চির চেনা–পরিচিত জায়গাতেই এতটা অনিরাপদ? কেন পদে পদে দুষ্ট আংকেলের হাতে ধরা পড়তে হয়? কেনই বা কাঁটার আঁচড়ের ভয়ে লুকিয়ে বাঁচতে হয়? কেন একটু বড় হলেই নতুন এক শহরকে আপন করে নিতে হয় নিজের চিরচেনা এই শহরকে ছেড়ে?

প্রিয় শহর তুমি কেন আমাকে চিরদিন তোমার বুকে আগলে রাখতে পারো না? আমি কেন মুক্তমনে চিন্তাবিহীন তোমার বুকে ঘুরে বেড়াতে পারি না? কী দোষ

আমার? আমিও যে তোমার সৌন্দর্য উপভোগ করতে চাই। আমিও যে দুপুরের রোদে তোমার অলিতে-গলিতে ঘুরে ঘুরে তোমাকে চিনতে চাই, দেখতে চাই। আমি যে সেই ছোট্টো জুলিয়ার মতো সবখানে দৌড়ে বেড়াতে চাই। তবে সেই ভয়ংকর খেলার ভয়ে কেন আমাকে লুকিয়ে থাকতে হয়? সেই কাঁটার আঁচড়ের ভয়ে কেন আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হয়? তুমি কি আমাকে নিরাপদ রাখতে পারো না? আমার মতো এই শহরের আরো হাজারো ফুটন্ত গোলাপের রক্ষাকারিনী তুমি কি হতে পারো না?

যে শহরে জুলিয়ারা ছোট থেকে বড় আমৃত্যু নিজের মতো করে বাঁচতে পারে, যেখানে আমার মতো ফুটন্ত গোলাপেরা প্রাণ খুলে হাসতে পারে, গাইতে পারে আর এই শহরের অলিগলির মায়ায় পড়ে সারাটা জীবন নির্ভয়ে কাটাতে পারে৷

তবে কি এই শহর আমাদের নয়? আমার মতো ফুটন্ত গোলাপ আর জুলিয়ার মতো ছোট্টো শিশুদের জন্য কি এই শহর নয়?

নাকি আমরাই এই শহরের নই?

তবুও শত বাধা আর আমাকে আপন করে না নেয়ার পরও এই শহরটা আমার। আমার বেড়ে ওঠার এই জায়গাটা আমার। হে শহর, তুমি আমাকে আপন করে না নিলেও তুমি আমার। আমি তোমার বুকেই শান্তি খুঁজে পাই।

এই জীবনে তোমার বুকে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরে বেড়াতে পারিনি। যদি আর কখনো পৃথিবীতে আসি তবে নিশ্চই তখন তুমিও আমাদের হবে। সেই আশা নিয়েই আমি শান্তিতে মরতে চাই, তোমার বুকেই শেষ নিশ্বাস নিতে চাই পরজন্মে তোমাকে আরও আপন করে পাওয়ার আশা নিয়ে।

আমায় তোমার বুকে আমৃত্যু থাকতে দেবে তো প্রিয় শহর, প্রিয় ভালোবাসার জায়গা– আমার ঢাকা?

Tanjila Taraiyan / তানযীলা তারাইয়্যান, Sylhet, Bangladesh

আমি আমার শহরকে নিজে লিখতে পারবো যেখানে আমি বড় হয়েছি বেড়ে উঠেছি, আমার শহর যাকে আমি ভালোবাসি, আমি যাকে নিয়ে গর্বিত এটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

তারার শহর

আমি তারা। না আসমানের তারা নই। আমার শহরের সবুজ ঘাসের উপর, পাহাড়ের ঢালের উপর, চা-বাগানের মেঠো পথের উপর আর সুরমা নদীর তটে হাসন রাজার গান গাইতে গাইতে বেড়ে উঠা মেয়ে তারা। দুটি পাতা একটি কুড়ি, শাহজালাল-শাহপরান, ৩৬০ আউলিয়ার শহর যেখানে, সেখানেই আমার বাড়ি। অর্থাৎ সিলেটে।

সিলেটের আবরণ পাহাড়। পাহাড় দিয়ে ঘেরা শিলং আর সিলেটের সীমান্ত। সেই আবরণের স্নিগ্ধ বাতাসে দোল খায় চায়ের ঘ্রাণ। কারণ সিলেটে রয়েছে অজস্র চায়ের বাগান।

আমার শহরে মণিপুরী সম্প্রদায় এবং বাঙালিরা মিলে মিশে তৈরি করেছে আত্মার বন্ধন। বাঙালিরা ভালোবেসে গায়ে তুলে নিয়েছে মণিপুরী শাড়ি। সেই শাড়ি দাপটের সাথে সারা বাংলাদেশ দাপিয়ে চলেছে। এখানকার মাটিতে শায়িত আছে ওলি আউলিয়া শাহজালাল-শাহপরান থেকে শুরু করে গানের রাজা হাসন রাজা। বঙ্গবীর এম এ জি ওসমানীও সিলেটের সন্তান।

মন ভালো থাকলে সিলেটের মানুষ গান ধরে। বাউল গান, হাসন রাজার গান। আর মন খারাপ থাকলে? সিলেটে থাকলে মন খারাপ থাকতেই পারে না। পাহাড়ের কোল ঘেষে ঝনঝন শব্দে বয়ে চলা হামহাম বা মাধপকুন্ডু জলপ্রপাত মন খারাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের একমাত্র মিঠাপানির সোয়াম্প ফরেস্টও বৃহত্তর সিলেটে। আছে হাকালুকি, টাংগুয়ার মতো হাওর এবং হাওরের তাজা মাছ। আছে জাফলং, বিছানাকান্দি এবং সাদা পাথরের মতো পাথর নির্ভর দর্শনীয় স্থান। যেইসব জায়গায় বাংলার রূপ খুঁজে

পাওয়া যায়। বাংলাদেশকে সৌন্দর্যের রাণী বলা হয়ে তার মাথায় শোভিত তাজের অনেকাংশ জুড়ে আছে সিলেট।

আমার বাড়ির পাশেই রয়েছে টিলা। তাই জায়গাটার নাম টিলাগড়। চা-বাগান যেতে লাগে মিনিট দশেক। ছেলেবেলায় মন খারাপ হলেই আমি টিলায় চলে যেতাম। তারপর চেঁচিয়ে বলতাম "আমি একদিন আকাশের তারা হবো, মুক্ত বিহঙ্গ হবো"। তা প্রতিধ্বনি হতো অন্তত পাঁচবার। আর আমার মন ভালো হয়ে যেত। একটু বড় হতেই যখন চা পাতার মর্ম বুঝতে শিখেছি তখন চা বাগানে গিয়ে তাকিয়ে থাকতাম বিস্তৃত সবুজ বিছানা সদৃশ চা বাগানের দিকে। গল্প করেছি চা বাগানের শ্রমিকদের সাথে। শুনেছি তাদের দুঃখের কথা, কষ্টের কথা। যা মিশে আছে চা পাতায়।

টিলায় বসে বসে পড়েছি জীবনানন্দ। পড়েছি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে ভেবেছি বড় হয়ে ফেরিওয়ালা হবো। চুড়ি চাই.. চুড়ি চাই হেঁকে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুড়ে বেড়াবো। চীনা পুতুলও থাকবে সেই ঝুলিতে। বাচ্চারা এসে এসে ঘিরে ধরবে আর আমি পুতুল দিয়ে তাদের মুখের হাসি আরো প্রসারিত করবো। বড় হতে হতে সেই ঝুলি ভরে উঠেছে গল্পে। এখন মনে হয় গল্প ফেরি করলে মন্দ হয় না। আমার গল্প, আমার শহরের গল্প, শহরের মানুষগুলোর গল্প, তাদের খাবারের স্বাদের গল্প। ওহ খাবারের কথা বলতে তো ভুলেই গেলাম।

আমার শহরের আছে নিজস্ব খাবারের স্বাদ। সিলেটিদের প্রিয় খাবারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শুটকি ভর্তা আর সাতকড়া দিয়ে গরুর গোস্তের ঝোল। সাথে হাওরের তাজা তাজা মাছের তরকারি। ভোজন রসিকদের হাত চেটে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট। ভালো কিছু রান্না হলে তা পাশের বাড়ির লোকদের না দিয়ে খাওয়া যায় নাকি? সিলেটিরা এই কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। হোক তা সাতকড়া বা শুটকি, পাশের বাড়ির মানুষদের পাতে তা উঠবেই। আমার শহরের মানুষ একে অন্যের সাথে দেখা হলেই হাসি দিয়ে বলে "বালা নি"। অর্থাৎ সিলেটি ভাষায় জিজ্ঞেস করে ভালো আছেন তো। ঈদ, পূজা, বড়দিন, নববর্ষ সবাই মিলেমিশে একসাথে উদযাপন করে।

কোন দেশের খনিজ সম্পদ সে দেশকে অনেকটা এগিয়ে রাখে। বাংলাদেশের বিপুল খনিজ সম্পদের অনেকটা সিলেট থেকে। সিলেটে আছে বিভিন্ন গ্যাস ক্ষেত্র, যা বাংলাদেশের মানুষের গ্যাসের চাহিদা অনেকাংশে মেটায়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হোক বা মানুষের আতিথেয়তা, আমার শহরকে নিয়ে আমি গর্বিত। বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল নগরী হলো সিলেট, মানে আমার শহর। যেখানে রয়েছে আমার বাড়ি। যদিও বাড়িটা আমার নিজের নয়, শহরটাও হয়তো নয়। কারণ আমার পৈত্রিক নিবাস নোয়াখালী। কিন্তু বাবার চাকরি সূত্রে জন্ম থেকেই আমি সিলেটে থাকি। তাই নোয়াখালীকে যতটা না আমার বলে মনে হয় তারচেয়ে অনেক গুন বেশি আপন বলে মনে হয় সিলেটকে। সিলেটের বাতাসে মিশে আছে আমার নিশ্বাস। সিলেটের আকাশে প্রতিদিন জমা হচ্ছে আমার গল্প, যা জানান দিচ্ছে, হ্যাঁ সিলেট আমার শহর। তাই একটুখানি পাহাড়ের সাথে গল্প করে বা চা পাতার সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলে তৃপ্তির সাথে বাঁচতে চাই এই শহরে।

খারাপ লাগে তখন, যখন দেখি পাহাড়গুলো ধীরে ধীরে কেটে ফেলা হচ্ছে। নদীগুলো ভরাট করা হচ্ছে। সেদিন একটা টিলা কাটার শব্দে দৌড়ে যেতেই শুনতে পেলাম আর্তনাদ। সিলেট আমায় বলছে “জানো আমার সব রঙ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আমি হচ্ছি নিস্প্রভ, মলিন। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমাকে বাঁচাও, তারা।“

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারিনি আমি তোমায় রক্ষা করবো। আমিই বাঁচাবো তোমায়। বলতে পারিনি আমি ফিরিয়ে আনবো তোমার রঙ। শুধু স্বার্থপরের মতো বলেছি, আমার শহর আমার দিনগুলো রঙিন করার জন্য আমি তোমায় ভালোবাসি।

Rahela Khurshid Zahan / রাহিলা খুরশিদ জাহান, Dhaka, Bangladesh

I am 70 years old and have many experiences in this city in gaining my independence and identity in this city. The two terms made me think that this is an opportunity to share my untold story - my struggle after I lost my life partner, my struggle in raising my 3 children and creating a life of my own, with a new identity. It took me 20 years to find peace. Which is unfortunate but brought a deep learning at the same time.

মাধবীলতার গান

বিকেলে চায়ের টেবিলে নিগার খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে। এমন সময় দুই নাতনি দৌড়ে এসে সরবে তাকে বলল,

- দাদুমনি, দেখ তোমার মাধবীলতা ফুল কেমন দুলছে!

- নানুমনি, ফুলগুলো বাতাসে ব্যালকনি সব ঝরে ঝরে পড়ছে!

পঁচিশ বছর আগে ফুলের চারাটা আমি নিজের হাতে লাগিয়েছিলাম। আজ সে গভীর ভালবাসায় বাড়ির তিন তলায় আমার শোবার ঘরের ব্যালকনিতে দুলছে। এর পিছনের গল্প আজ নাতনিদের না বলে পারলাম না।

সেদিন ছিল ৮ই মার্চ ১৯৯৯ সাল। ঢাকা শহরের একটি হাসপাতালে আমি ট্রেনিং ইভালুয়েশানের কাজ করছি। দাদুমনি, সকাল দশটায় তোমার বাবা হসপিটালে ফোন করল, "আম্মু বাসায় আস, আব্বুকে হাসপাতালে নিতে হবে"। "তোমার আব্বুকে এক্ষুনি গাড়িতে ওঠাও"। বলেই আমি রিকশা নিয়ে উদভ্রান্তের মত বাসায় এসে দেখলাম তোমার দাদু গাড়ীর পেছনে বসা, আর তোমার বাবা গাড়ী স্টার্ট দিচ্ছে। দিশাহারা হয়ে আমি গাড়ীর সামনের সিটে বসলাম।

"তুমি পেছনে বস, I am dying"। তোমার দাদুর কথা শুনে তখনি তার পাশে গিয়ে বসলাম। তিন মিনিট পর আমার কাঁধে মাথা রেখে চলন্ত গাড়ীতে তিনি মৃত্যু বরণ করলেন।

সেই ১৯৭৩ সালে আমার বিবাহ হয়, যখন আমি রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী। তোমার দাদু তখন সেনাবাহিনীতে ক্যাপ্টেন। পোস্টিং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে। থাকেন আর্টিলারি মেসে। ঢাকায় বেড়াতে এসে আমি মেসেই থাকতাম। ঢাকা শহরের সাথে আমি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়লাম।

ডাক্তারি পাশ করে আমিও সেনাবাহিনীতে চাকরি করতাম। একসময় স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে লিবিয়াতে চাকরি নিয়ে গেলাম। কয়েক বছর পর দেশে ফিরলাম, তখন এই প্লটটা আমরা কিনেছিলাম। বাড়ি বানানোর জন্য তোমার দাদু ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছিলেন। বাড়িটা তখন নির্মীয়মান ছিল। সে সময় তোমার দাদুর ব্যবসায় বেশ ক্ষতি হওয়ায় লোনের কিস্তি দিতে পারছিলাম না আমরা, তার কারণে ব্যাংক থেকে ঘন ঘন চিঠি আসতে থাকল।

তোমার বড় চাচু মাত্র দু'মাস আগে সেনাবাহিনীর অফিসার হয়ে বের হয়েছেন। তোমার বাবা আমেরিকায় কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে যাবে বলে ভিসার জন্য অপেক্ষা করছে। তোমার ফুপি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে স্ট্যান্ডার্ড সিক্সে ভর্তি হয়েছে। তাই সামনের বিশাল দায়িত্বভার নিয়ে মহাকাশটা যেন আমার মাথায় ভেঙে পড়ল।

ঢাকা শহরের মানুষগুলো যারা আমাদের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, বিপদ দেখে সবাই যার যার মত সরে পড়লেন। আমি একটা আন্তর্জাতিক সংস্থায় ন্যাশানাল কনসালট্যান্ট হিসাবে কাজ করছিলাম। শোকে মুহ্যমান হয়ে সেই মুল্যবান চাকরিটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সংসারের জন্য জীবন যুদ্ধে নেমে পড়লাম।

চোখের জলে ভেসে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলাম। তোমার ফুপির স্কুল বাসের জন্য দরখাস্ত করলাম। প্রিন্সিপাল বললেন,"আমার মেয়ে বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া আসা করবে, এই মর্মে দরখাস্ত করলে আমি এটা বরাদ্দ করতে পারব। কারণ বাসে কোন সিট নেই"। এটা লিখতে গিয়ে আমার বুক কেঁপে উঠল।

চলার শুরুতে বাসে সিট খালি থাকলেও তোমার ফুপি বসতে পারত না। তিনজন নিষ্ঠুর মহিলা টিচার তাকে ধমক দিয়ে সিট থেকে তুলে দিতেন। দাঁড়ালেই পড়ে যায় বলে নিরুপায় হয়ে বাসের পিছনে গিয়ে সে লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাতায়াত করত। তার

সালোয়ারের হাঁটুতে একদিন কাদা দেখে ব্যাপারটা জানতে পেরে কান্নায় আমার বুক ভেসে গিয়েছিল।

তোমার বাবা তখনই আমেরিকার ভিসা পেল। তাকে আমেরিকায় পাঠানোর জন্য তোমার দাদু দুই লাখ টাকা মতিঝিলে একটা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। সেই একাউন্টের কোন নমিনি ছিল না বলে দুঃখজনকভাবে টাকাটা সেখানে আটকে গেল।

আইন অনুসারে কোর্টের মাধ্যমে টাকা তোলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সেটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার বলে তোমার বাবা সেশন ধরতে পারবেন না। তাই সেই ব্যাংকের এমডির সঙ্গে দেখা করে আমি সব ঘটনা তাকে খুলে বললাম। তিনি ব্যাপারটা অনুধাবন করে অফিসারকে ডেকে বললেন,"আমি চাই, সাত দিনের মধ্যে উনি যেন দুই লাখ টাকা তুলতে পারেন"।

মাত্র তিনদিনের মধ্যে এই অসাধ্য সাধন করে তারা বললেন, ব্যাংকের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে এমন ঘটনা এই প্রথম। তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি টিকেট করা থেকে শুরু করে তোমার বাবার সব কাজ সম্পন্ন করলাম। তাকে মে, ১৯৯৯ সালে আমেরিকায় পাঠালাম।

নানুমণি তুমি এবার শোন, বাড়িতে শুধু আমি এবং তোমার কিশোরী মা। প্রায় প্রতিদিনই গভীর রাতে ফোন আসত, "আমরা আপনার মেয়েকে অপহরণ করব"। শুনে তখন সারারাত ঘুমাতে পারিনি নানু।

বাড়ির বিভিন্ন প্রকার বিল, ট্যাক্স, পরচা, সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। একসময় সেটার বিশেষ প্রয়োজন হলো, তাই তোমার মাকে নিয়ে সেগুলো বোঝার জন্য তোমার নানার বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। কিন্তু তার স্ত্রী সেটা পছন্দ করলেন না, কারণ আমি তখন বিধবা। তোমার মা আড়াল থেকে তাদের কথোপকথন শুনে আমাকে সেখানে যেতে নিষেধ করল।

তাই ফাইল নিয়ে অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। সেখানে বন্ধুর মেয়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে আমি তাদের দুয়ার থেকে ফিরে এলাম।

বাসায় এসে দেখি আমার প্রিয় মাধবী লতা গাছটাকে গোড়া থেকে কেটে ফেলেছেন নিচতলার স্কুলের প্রিন্সিপাল। কারণ গাছে অনেক কীটপতঙ্গ হয়েছিল। চারিদিকের নিষ্ঠুর আচরণে আমি তখন কান্নায় আকুল হয়ে পড়লাম।

নানুমণি, একদিন বিধবাদের জন্য আমার মমত্ববোধের সীমা ছিল না। তার পরিবর্তে বিধাতা আমায় কেন মানুষের এই মন ও মানসিকতার পরিচয় দিলেন তা বুঝে পেলাম না!

লোন পরিশোধের জন্য ব্যাংকের চিঠি আসতে থাকল। তাই ভাল বেতনে আমার একটা চাকরি দরকার। তার জন্য পোস্ট গ্রাজুয়েশান করতে হবে। পাবলিক হেলথ এ মাস্টার্স করার জন্য ভর্তি হয় গেলাম। সেখানে স্কলারশিপ পেলাম।

বাসে হামাগুড়ি দিয়ে যাতায়াত অসহনীয় বলে তোমার মাকে অন্য স্কুলে ভর্তি করলাম। গাড়িতে তোমার মাকে স্কুলে আনা-নেয়ার পাশাপাশি নিজের মাস্টার্সের ক্লাস করতে শুরু করলাম।

পাস করার পর আশানুরুপ চাকরি না পাওয়ায় তোমার মা'র স্কুল যাওয়া বন্ধ করে কোচিং ক্লাসে ভর্তি করলাম। আমার অফিসের পাশাপাশি তাকে রাত পর্যন্ত কোচিং করিয়ে প্রাইভেটে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শেষ করলে তাকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করা হলো। শহরে প্রতিটা স্থান এতই দূর যে আমার কাছে সবকিছু বিভীষিকাময় হয়ে উঠল।

কিছু কিছু ব্যাংকের লোন শোধ করেও নানু, শেষ রক্ষা আর হলো না। এই বাড়িটা ২০০৩ সালে নিলাম হলো। হন্যে হয়ে বেশি বেতনের চাকরি খুঁজতে খুঁজতে দৈবক্রমে একটা প্রজেক্টে কনসালটেন্টের চাকরি পেলাম। সেদিন মনটা ভাল লাগল বলে অনেকদিন পর মাধবীলতা গাছটাকে পরখ করে দেখলাম। কী অবাক! গাছটা মরেনি। দুইটা নুতন পাতা আমার চরম হতাশার মাঝে আশার আলো জাগাল।

বেতনের সম্পূর্ণ টাকাই প্রতিমাসে লোন অ্যাকাউন্টে দিতে থাকলাম। তবুও বাড়িটা আরও দুইবার নিলাম হলো। আমি তখন এতটাই বিমর্ষ হয়ে পড়লাম যে কিছুদিন ভয়ে চুলা জ্বালাতে পারিনি। শুধু চিরা, মুড়ি, খেয়ে জীবনধারণ করেছি। ব্যাংক বাড়ি বিক্রয় করার পরামর্শ দিল।

নানু, আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। ঢাকার একটা জমি বিক্রয় করে, আর দীর্ঘ ৮ বছর প্রজেক্টে কাজ করে ব্যাংকের লোন পরিশোধ করলাম। এছাড়া বাড়িতে আরও চারটি ফ্ল্যাট তৈরি করলাম।

অসীম সাহস আর আত্মবিশ্বাসের বলে প্রাণপ্রিয় ঢাকা নগরীতে আমার বাড়িটি আজ সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমাদের বাবা, মা, চাচুকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার পর তোমাদেরকে পেয়ে আজ আমি গর্বিত এবং ধন্য। এই মাধবীলতা ফুল তারই বহিঃপ্রকাশ।

এবার হঠাৎ ছোট্ট নানুমণিটা একগোছা মাধবীলতা নিয়ে দৌড়ে এসে দুজনেই আমাকে জড়িয়ে ধরল। দাদুমণি সেই ফুলের গোছাটা নিজের হাতে আমাকে দিয়ে বলল "দাদু, তুমি তোমার মাধবীলতার মতই অপরাজেয়"।

Ishrar Habib / ইশরার হাবিব, Dhaka, Bangladesh

I have always thought of this city quite as romantic. But my first heartbreak showed me this city has its own way of governing us. Its tough as realities are beyond our grip. Yet, it holds our home, a home, perhaps not so much rooted.

আমার কাছে এ শহর মানে তুমিই ছিলে

আমার কাছে এ শহর মানে তুমিই ছিলে।
আমায় বলেছিলে পুরান ঢাকার আর্মেনিয়ান চার্চে নিয়ে যাবে,
শাঁখারি বাজারের সিঁদুর-শাঁখা পরিয়ে দেবে,
প্রাচীন বুড়িগঙ্গার রহস্য বাতলে দেবে।
আমিও কত বড় পাগল! এ কথা শুনে কেউ কারো প্রেমে পড়ে!

ঠিক কতটা ভালবাসলে তোমাকে আমি এ শহর দেখার সঙ্গী বানাতে পারি, হয়তো তুমি বুঝবে না।
তুমি ছাড়া এ শহরে আমার ফিরবার, কিংবা আবাস গড়বার আর কোনো কারণ নেই।
আমি এ শহরের কেউ নই।
কটা মানুষ চিনি আমি এখানে?
তাইতো এ দালানকোঠার অরণ্যে তুমিই আমার আবাস ছিলে।

খুব সামর্থ্য ছিল না তোমার; তাতে কী? তোমার আদরের কাঙাল ছিলাম।
এই জন–অরণ্যে আমায় তুমি একটু আশ্রয় দেবে, এটুকুই চেয়েছিলাম।
আমি বাঁধন ছাড়াই তোমার ছিলাম, থাকতাম।
কিন্তু তখনো বুঝিনি, কোথাও চক্রান্ত চলছে।

আমার বেদুঈন-সংসার, এ শহর চায় না।
টালমাটাল সময়, নগরীর খুব উন্নয়ন হচ্ছে।
পুরনো ভেঙে নতুন দালান উঠছে।
বাস্তবতার করাত খুব নির্মমভাবে সম্পর্ক ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে।
ক্ষমতা ছাড়া সামান্য নাগরিক সুবিধা যেখানে দুর্লভ, সেখানে ভালবাসা
ডানা মেলতে পারে?
বন্দী যারা, তারা কি কখনো ভালবাসার উন্মুক্ত আকাশে ওড়ার স্বাদ পায়?

আজ তোমার নিজের পরিচয় আছে, ক্ষমতা আছে।
ঢাকা শহরে খুব ভাল করে বেঁচে থাকবার রশদ তুমি পেয়ে গেছো।
তা নিয়ে আমি খুশি।
তবে এর বিনিময়ে আমি আমার শহর দেখার সঙ্গী হারিয়েছি।
আমার লাপাত্তা হওয়ার প্রয়োজন আজ শেষ।
রাস্তার মোড়ে মোড়ে পড়ে আছে আমাদের নষ্টনীড়,
তাদের জায়গায় আজ নতুন ঝকঝকে দালানকোঠা।

Husne Ara Joly / **হুসনে আরা জলি,** Sirajganj, Bangladesh

I got my writing encouragement from my father as I was inspired by him. My writing is also inspired by my surroundings, social system, and various forms of violence against women. When I see the violence against women I can't stop myself and I always try to protest against this in my writing. I myself have endured various hostile environments, various family and social persecution.

Special thanks to My City and My Home for such a creative competition. It also inspired me to write because it's a big initiative, introducing us to a big global platform and giving us (coming from a small town of Bangladesh) the opportunity to show our skills in writing. I think it's a huge inspiration to write.

এ শুধু আমারই সুখ

চোখ বুজলেই সামনে দাঁড়ায়
আমার শৈশব, উচ্ছল কিশোর বেলা
খালি পায়ে শিশিরের সুখ
রঙের খোঁজে শেফালী তলায়
এক আঁচল ফুলে মালা গাঁথা।
এ সবই আমার সুখ
রেডিও বাংলায় ভোরের খবর শোনা
চুলোর লাল আঁচে স্বপ্নিল মায়ের মুখ
ঘিয়ে ভাজা পরোটা সুগন্ধে
টেবিল, কাপ পিরিচ, চায়ের ধোঁয়া
এ সবই আমার সুখ।
পাকুরের নিক্কন, দক্ষিনা বাতাস
নদীর ভাঙন, যুদ্ধের কামান বারুদ

ভারী বুট, লুটিয়ে পরা দেহ
আমার স্বাধীনতা, আমার লজ্জা
বিবস্ত্র বোনের লাশ, পচা দুর্গন্ধ
কুকুরের সাথে গলাগলি শব
সে তো আমার দুঃখের দিন।
বুকের মধ্যে শূন্যতা
লেখার সরঞ্জাম, আশা প্রত্যাশা
ধান ক্ষেতের দোলানো ঢেউ
নীলাকাশে সফেদ মেঘরাশি
নিঝুম রাতের বিষণ্ণতা
হারানো দিনের গানে গানে
কাঁদিয়ে যায় আমার বুক।
চোখ খুলতেই লোনা জল
নদী হয়ে যায় আমার বুকে
ঘুমপাড়ানি গানে গানে
ঘুমের অরণ্যে হারিয়ে যাওয়া
শুধু আমারই দুঃখ-সুখ।
মধ্য দুপুরে রান্না ঘরে
আনমনা মন ছুটে যায় দূরে
যেখানে মধ্য বয়স বাঁধনহারা
ঘাস ফড়িং এর খেলায় মাতে
তখন আমি এমন ছিলাম
কোন একদিন কাজের শেষে
অফিস থেকে ফেরার পথে
দেখা হয়েছিল এক পলক

বাসের নির্দয় শাব্দিক অত্যাচারে
নামতে গিয়ে দেখা হয়ে যায়
পলকহীন চোখের চাওয়ায়।
হঠাৎ করে দেখা, কিছু কথা
ভালো লাগা-প্রেম বোলো না একে
কত কাল দুঃখ পুষে রাখা
নিজের কথা থাকনা এখন
সে তো জানে সময় নেই
মারাত্মক এক ঘুন পোকা
কামড়ে আছে দেহ তার
কথা দিলাম লিখবো আমি।
বলেছিল হাসনাহেনা ফুটলে
জোছনা ঝরবেই ঝরবে
আমি হাসনাহেনার গন্ধে
জোছনা দেখবো বলে বসে থাকি
বলেছিলে ফাগুন বেলায়
ফুল ফুটবেই ফুটবে
আমি ফুলের আসন পেতে
তোমায় পাবো বলে বসে ছিলাম
এ সবই আমার কষ্ট গাঁথা
কিশোরী মেয়ে কয়ে উঠে কথা
মা, এই গল্পটা পড়ো-
ঠিক তোমার জীবন গাঁথা
কী বোঝে ও এই তো বয়স!
সে কি বোঝে জীবনের মানে?

কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা শেষে
আমি আজ অভয়া-
ও কি সেই কথা কইলো
গল্পের ছলে ছলে?
ক'জন নারী পারে
মনের কথা খুলে বলতে?
ক'জন নারী পায়
সেই শীর্ষ সুখ।
স্বপ্ন যখন লুট হয়ে যায়
অসম্মানে নুয়ে পড়ে মর্যাদা
অসহনীয় আবেগে ঝাঁঝরা করে বুক
কঠিন সময় পাড়ি দিতে দিতে
আমি হয়ে যাই অভয়া আবার
প্রস্তুতি নেই রুখে দাঁড়াবার
অক্ষরে ইতিহাসে কবিতার পাতায়।

Shamim Ara Begum / শামিম আরা বেগম, Dhaka, Bangladesh

I'm a full-time housewife, got married early; my eldest son is 34. I never really got the chance to continue my studies after 12th. I love taking care of my family at the same time writing fulfills me in a way. I believe, I always wanted to be more than just an ordinary housewife which inspires my writings.

আমার যাপিত জীবনের গল্প

আমার জন্ম, বাড়ি এক অজ পাড়াগাঁয়ে। আমরা দাদাবাড়ি বা আদিবাড়ি বলি। দাদা অবস্থাপন্ন কৃষক ছিলেন। সব ধরনের ফসল আবাদ করতেন। আমাদের বিশাল বাড়ির পেছনের যে পুকুর ছিল তাতে শুধু বাসন মাজা আর শাকসবজি ধোয়া হত। আর সামনের দিকের যে পুকুর ছিল তাতে অনেক বড় সুন্দর ঘাট বাঁধা ছিল। সারা পাড়ার বৌদিরা এসে গোসল করতো আর কাপড় কাচত। বৌদিরা গল্পে মেতে উঠতো, মনে হয় কিছুটা সময় তারা সংসারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সবার খবর সবাই রাখতো, আহা! কী মধুর সেই দিনগুলি ছিল। আজ সবার বাসায় পানির পাম্প এসেছে, কেউ আর পুকুরে গোসল করে না। পুকুরের পানিও আজ মরে গেছে। বর্তমানে জীবন যাপন হয়তো সহজ হয়েছে, কিন্তু আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। ছোট ছোট আনন্দ, বেদনা, দুঃখ, ভালোবাসা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে পারি না; সবার মাঝে থেকেও আমরা একা। দাদাবাড়ির বৈঠকখানার সামনে বিরাট বটগাছ ছিল। সেই গাছে হাজার হাজার শালিক পাখির বাসা, এক বিশাল মৌচাক। সকাল-সন্ধ্যায় পাখিদের ডাকাডাকি এখনও কানে বাজে। ইট-ভাটার জন্য সেই গাছ নিধন হয়েছে। বটগাছের ছায়ার বদলে সেই জায়গা শূন্য মরুভূমি। আমার বাড়ি আমি ভুলতে পারি না, দাদা-বাবা বেঁচে নেই, ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয় না। জীবিকা এবং সময়ের প্রয়োজন বাবা গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসেন। আমার বাবার বাড়ির জীবন শুধু বড় বড় তিন রুম, লম্বা টানা বারান্দা, বড় টিনশেডের ছাদওয়ালা পাকের ঘর। লাকড়ির চুলায় রান্না করা রান্নার স্বাদ আজ আর খুঁজে পাই না। এটা হয়তো আমার মনের ব্যাপার। বাড়ির সাথে অনেকটা খোলা জায়গা,

বাবা সেখানে বাগান করেন, তারপরেও অনেক ফাঁকা জায়গা থাকে। আমরা ভাই-বোনেরা আশেপাশের বাড়ির অন্য বাচ্চাদের সাথে সন্ধ্যা পর্যন্ত খেলি। সেই স্বাধীনতা এখনো মনে মনে উপভোগ করি। বর্তমানে বাচ্চাদের ঘরবন্দী দেখে অনেক কষ্ট হয়। আমাদের ছেলেবেলায় মোবাইল গেম ছিল না, কিন্তু সীমাহীন আনন্দ নিয়ে শিবুরি, এক্কাদোক্কা, হরেক রকম খেলা খেলতাম। কাপড়ের পুতুল দিয়ে অনেক মজা করে খেলতাম। আজকের বাচ্চারা তো তা থেকে বঞ্চিত। আজ সেই ছোট শহর দিনাজপুর বড় হয়ে যানজটের শহরে পরিণত হয়েছে। আগেকার পুরনো বাড়ির বুকের উপর দশ-তলা ফ্ল্যাট আকাশ ঢেকে দিচ্ছে। এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে সবকিছু, যে চেনা শহর কে আর চিনতে পারি না মাঝে মাঝে। এরপর জীবনের নিয়মে শ্বশুরবাড়ি। এটা এল-প্যাটার্নের বাড়ি। ঘরগুলি বড়, টানা লম্বা বারান্দা তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। উঠানে অনেক ফুল গাছ। বারান্দার সাথেই ডালিম গাছ যেখানে ঝুলতো বড় বড় ডালিম। শাশুড়ি-আম্মা গাছ লাগাতে ভালোবাসতেন। উনি চলে গেছেন আজ কুড়ি বছর। ওঁর লাগানো লেবু গাছে আজও লেবু ধরে। রান্না ঘরের পেছনে গোয়ালঘর, উঠানের একপাশে মুরগির খোপ, শ্বশুরবাড়ি আমার অনেক পছন্দের। টিনের চালে ঝাঁক বেঁধে কবুতরের চলাচল। এরকম বর্তমানে প্রায় দেখাই যায়না। হয়তো একদিন এটাও ভাঙা পড়বে। আমার বর্তমান বাড়ি ছেলের সাথে ঢাকা শহরে পায়রার খোপ ফ্ল্যাটে। আমি ছেলের যত্ন নিই নাকি ছেলে আমার দেখভাল করে, বুঝতে পারিনা। আকাশ দেখে তৃপ্তি পাই না, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারি না, মানুষের হাতের মুঠোর যান্ত্রিকতা কি আমাদের সত্যি আনন্দ দিতে পারে ? আমি বারবার পিছন ফিরে তাকাই, আমার ফেলে আসা বাড়ির কথা মনে পড়ে। সত্যিই অনেক আনন্দময় শৈশব, কৈশোর জীবন কাটিয়েছি যা ভোলার মতো নয়, ভুলতে চাইনাও না। জীবনে কী পেয়েছি আর কী পাইনি তা নিয়ে আফসোস নেই বরং অনেক পেয়েছি। জীবন সংসারে প্রকৃতির কাছ থেকে নিয়েছি, বাবা মায়ের স্নেহ আদর ভালোবাসা আর ছোটদের সম্মানে আমার অনেক পাওয়া। প্রকৃতি আমাকে বৃষ্টিতে ভিজতে দিয়েছে, জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আনন্দ পেয়েছি। রাতের বেলা গ্রামের জোনাকি পোকার পিছে ছুটতাম, এসব কি কম পাওয়া? আমি জগত সংসারকে কী দিলাম? শুধু কি নিয়েই গেলাম? মনের মধ্যে স্বপ্ন, বড় জায়গা নিয়ে ভালোবাসার বাড়ি করব। তার বাসিন্দা হবে অসহায় বৃদ্ধ মায়ের

পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন এতিম শিশুরা, প্রতিবন্ধী বা বিশেষ বাচ্চাদের দেখার কেউ নেই, যাদের আশ্রয় নেই তারা সবাই থাকবে। সবাই সবার দেখাশুনা করবে। শেষ সময়ে তার জন্য চোখের দু'ফোঁটা পানি পড়বে তার সাথীদের। ভালোবাসার সেই বাড়িতে প্রাচুর্য থাকবে না, কিন্তু স্নেহ-মমতা ভালোবাসায় পরিপূর্ণ থাকবে। খাওয়া ভাগ করে খেতে হবে হয়তো, কিন্তু শান্তির অভাব হবে না। এই আমার স্বপ্ন। আমি পারি কিংবা না পারি, কেউ না কেউ হয়তো পৃথিবীর কোন প্রান্তে পূর্ণ করেছে তার স্বপ্ন। সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি সব মানুষ যেন তার আপন জনের কাছে নিজের বাড়িতে থেকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারে, বেওয়ারিশ হয়ে রাস্তায় যেন পড়ে না থাকে। মানবতার জয় হোক, কেউ যেন গৃহহীন না থাকে।